A
লেভ ভ্লাসভ
দ্‌মিত্রিই ত্রিফোনভ
রসায়নের
শতগল্প
প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

	I	II	III	IV	V
১	(H)				
২	Li ৩ ৬·৯৩৯ লিথিয়াম	Be ৪ ৯·০১২২ বেরিলিয়াম	৫ ১০·৮১১ B বোরন	৬ ১২·০১১১৫ C কার্বন	৭ ১৪·০০৬৭ N নাইট্রোজেন
৩	Na ১১ ২২·৯৮৯৮ সোডিয়াম	Mg ১২ ২৪·৩০৫ ম্যাগ্নেসিয়াম	১৩ ২৬·৯৮১৫ Al অ্যালুমিনিয়াম	১৪ ২৮·০৮৬ Si সিলিকন	১৫ ৩০·৯৭৩৮ P ফসফরাস
৪	K ১৯ ৩৯·১০২ পটাসিয়াম	Ca ২০ ৪০·০৮ ক্যালসিয়াম	Sc ২১ ৪৪·৯৫৬ স্ক্যাণ্ডিয়াম	Ti ২২ ৪৭·৯০ টিটানিয়াম	V ২৩ ৫০·৯৪২ ভ্যানাডিয়াম
	২৯ ৬৩·৫৪৬ Cu তাম্র	৩০ ৬৫·৩৭ Zn দস্তা	৩১ ৬৯·৭২ Ga গ্যালিয়াম	৩২ ৭২·৫৯ Ge জার্মেনিয়াম	৩৩ ৭৪·৯২১৬ As আর্সেনিক
৫	Rb ৩৭ ৮৫·৪৭ রুবিডিয়াম	Sr ৩৮ ৮৭·৬২ স্ট্রন্সিয়াম	Y ৩৯ ৮৮·৯০৫ ইট্রিয়াম	Zr ৪০ ৯১·২২ জির্কোনিয়াম	Nb ৪১ ৯২·৯০৬ নায়োবিয়াম
	৪৭ ১০৭·৮৬৮ Ag রৌপ্য	৪৮ ১১২·৪০ Cd ক্যাডমিয়াম	৪৯ ১১৪·৮২ In ইণ্ডিয়াম	৫০ ১১৮·৬৯ Sn টিন	৫১ ১২১·৭৫ Sb অ্যান্টিমনি
৬	Cs ৫৫ ১৩২·৯০৫ সিজিয়াম	Ba ৫৬ ১৩৭·৩৪ ব্যারিয়াম	La * ৫৭ ১৩৮·৯১ ল্যান্থেনাম	Hf ৭২ ১৭৮·৪৯ হ্যাফ্নিয়াম	Ta ৭৩ ১৮০·৯৪৮ ট্যান্টেলাম
	৭৯ ১৯৬·৯৬৭ Au স্বর্ণ	৮০ ২০০·৫৯ Hg পারদ	৮১ ২০৪·৩৭ Tl থলিয়াম	৮২ ২০৭·১৯ Pb সীসক	৮৩ ২০৮·৯৮০ Bi বিসমাথ
৭	Fr ৮৭ [২২৩] ফ্রান্সিয়াম	Ra ৮৮ [২২৬] রেডিয়াম	Ac ** ৮৯ [২২৭] অ্যাক্টিনিয়াম	Ku ১০৪ [২৬০] কুর্চাতভিয়াম	১০৫

* ল্যান্থেনাইড

Ce ৫৮ ১৪০·১২ সিরিয়াম	Pr ৫৯ ১৪০·৯০৭ প্রাসিওডিমিয়াম	Nd ৬০ ১৪৪·২৪ নিয়োডিমিয়াম	Pm ৬১ [১৪৭] প্রোমেথিয়াম	Sm ৬২ ১৫০·৩৫ স্যামেরিয়াম	Eu ৬৩ ১৫১·৯৬ ইউরোপিয়াম	Gd ৬৪ ১৫৭·২৫ গ্যাডোলিনিয়াম

** অ্যাক্টিনাইড

Th ৯০ ২৩২·০৩৮ থোরিয়াম	Pa ৯১ [২৩১] প্রোট্যাক্টিনিয়াম	U ৯২ ২৩৮·০৩ ইউরেনিয়াম	Np ৯৩ [২৩৭] নেপচুনিয়াম	Pu ৯৪ [২৪৪] প্লুটোনিয়াম	Am ৯৫ [২৪৩] আমেরিসিয়াম	Cm ৯৬ [২৪৭] কুরিয়াম

VI	VII	VIII		
	H ১ ১·০০৭৯৭ হাইড্রোজেন	He ২ ৪·০০২৬ হিলিয়াম		
O ৮ ১৫·৯৯৯৪ অক্সিজেন	F ৯ ১৮·৯৯৮৪ ফ্লোরিন	Ne ১০ ২০·১৭৯ নিয়ন		
S ১৬ ৩২·০৬৪ গন্ধক	Cl ১৭ ৩৫·৪৫৩ ক্লোরিন	Ar ১৮ ৩৯·৯৪৮ আর্গন		
Cr ২৪ ৫১·৯৯৬ ক্রোমিয়াম	Mn ২৫ ৫৪·৯৩৮০ ম্যাঙ্গানিজ	Fe ২৬ ৫৫·৮৪৭ লৌহ	Co ২৭ ৫৮·৯৩৩২ কোবাল্ট	Ni ২৮ ৫৮·৭১ নিকেল
Se ৩৪ ৭৮·৯৬ সেলেনিয়াম	Br ৩৫ ৭৯·৯০৪ ব্রোমিন	Kr ৩৬ ৮৩·৮০ ক্রিপ্টন		
Mo ৪২ ৯৫·৯৪ মোলিবডেনাম	Tc ৪৩ [৯৯] টেক্‌নেসিয়াম	Ru ৪৪ ১০১·০৭ রুথেনিয়াম	Rh ৪৫ ১০২·৯০৫ রোডিয়াম	Pd ৪৬ ১০৬·৪ প্যালাডিয়াম
Te ৫২ ১২৭·৬০ টেলুরিয়াম	I ৫৩ ১২৬·৯০৪৪ আয়োডিন	Xe ৫৪ ১৩১·৩০ জেনন		
W ৭৪ ১৮৩·৮৫ টাংস্টেন	Re ৭৫ ১৮৬·২ রেনিয়াম	Os ৭৬ ১৯০·২ অসমিয়াম	Ir ৭৭ ১৯২·২ ইরিডিয়াম	Pt ৭৮ ১৯৫·০৯ প্ল্যাটিনাম
Po ৮৪ [২১০] পোলোনিয়াম	At ৮৫ [২১০] অ্যাস্টেটাইন	Rn ৮৬ [২২২] র‍্যাডন		

মৌলের সংকেত — Li

পারমাণবিক সংখ্যা — ৩

পারমাণবিক ভর — ৬·৯৩৯

লিথিয়াম

বন্ধনীতে সবচেয়ে স্থিতিশীল বা সুবিশ্লেষিত আইসোটোপের পারমাণবিক ভর দেয়া হল

— — —

মালা

Tb ৬৫ ১৫৮·৯২৪ টার্বিয়াম	Dy ৬৬ ১৬২·৫০ ডিস্প্রোসিয়াম	Ho ৬৭ ১৬৪·৯৩০ হোলমিয়াম	Er ৬৮ ১৬৭·২৬ আর্বিয়াম	Tm ৬৯ ১৬৮·৯৩৪ থুলিয়াম	Yb ৭০ ১৭৩·০৪ ইটার্বিয়াম	Lu ৭১ ১৭৪·৯৭ লুটিসিয়াম

মালা

Bk ৯৭ [২৪৭] বার্কেলিয়াম	Ct ৯৮ [২৫১] ক্যালিফোর্নিয়াম	Es ৯৯ [২৫৪] আইনস্টাইনিয়াম	Fm ১০০ [২৫৭] ফার্মিয়াম	Md ১০১ [২৫৮] মেন্দেলেভিয়াম	No ১০২ [২৫৫] নোবেলিয়াম	Lr ১০৩ [২৫৬] লরেন্সিয়াম

লেভ ভ্লাসভ
দ্‌মিত্রিই ত্রিফোনভ

রসায়নের শতগল্প

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

অঙ্গসজ্জা: লেওনিদ লাম

Л. Власов, Д. Трифонов

ЗАНИМАТЕЛЬНО О ХИМИИ

На языке бенгали

В $\frac{20501-954}{014(01)-78}$ —641—78

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

সূচিপত্র

যে সাপের মুখে লেজ

রসায়নের জাদুঘর

তার চোখের আলোয়

রসায়ন: নবদিগন্ত

মুখবন্ধের বিকল্প

একদা প্রাচ্যের এক প্রাজ্ঞ শাসক পৃথিবীবাসী সকল মানুষের সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে চান।

তিনি তাঁর উজিরদের তলব করে বলেন:

'আমার জন্য পৃথিবীর সকল জাতির একটি ইতিহাস রচনার ব্যবস্থা করুন। আমি জানতে চাই তারা আগে কেমন ছিল আর এখন কেমন আছে, তারা কী করে, তারা কোন কোন যুদ্ধ করেছে এবং এখন করছে, আর বিভিন্ন দেশে কী কী শিল্প-বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে।'

আর এজন্য তিনি সময় বরাদ্দ করেন পাঁচ বছর।

উজিররা নীরবে কুর্নিশ সেরে বিদায় নিলেন। অতঃপর তাঁরা রাজ্যের প্রাজ্ঞতম ব্যক্তিদের আহবান করলেন ও তাঁদের শাসকের ইচ্ছার কথা জানালেন।

শোনা যায়, এর পর পরই পার্চমেণ্ট শিল্পের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছিল...

পাঁচ বছর পর উজিররা আবার প্রাসাদে মিলিত হলেন।

'জাহাঁপনা, আপনার ইচ্ছা পূরণ করা হয়েছে। জানালা দিয়ে তাকান, দেখুন আপনার ঈপ্সিত...'

শাসক বিস্ময়ে চোখ ঘষলেন। প্রাসাদের সামনে উটের কাফেলা আর তার শেষ প্রান্ত দিগন্তপারে অদৃশ্য। প্রতিটি উটের পিঠে দু'টি বিশাল বোঝা আর প্রতি বোঝায় মরোক্ক বাঁধাই দশখণ্ড বিপুলাকার গ্রন্থ।

'এ সব কী?' সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন।

'বিশ্ব ইতিহাস,' জবাব দিলেন উজিরবৃন্দ, 'আপনার আদেশে প্রাজ্ঞতমরা পাঁচ বছর এজন্য দিনরাত শ্রম করেছেন!'

'আমার সঙ্গে তামাশা?' সম্রাট গর্জন করলেন, 'সারা জীবনে আমি এর এক দশমাংশও পড়তে পারব না! তারা আমার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুক। কিন্তু এতে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী থাকা চাই।'

তিনি তাঁদের আরও এক বছর সময় মঞ্জুর করলেন।

বছরটি শেষ হল। প্রাসাদের সামনে আবার একটি কাফেলা। এবার উটের সংখ্যা দশ এবং উটপ্রতি বোঝা ও বইয়ের পরিমাণ পূর্ববৎ।

সম্রাট রেগে আগুন।

'সর্বকালে সর্বজাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীই শুধু এরা লিখুক। কত সময় চাই তোমাদের?'

প্রাজ্ঞতমদের প্রধান এগিয়ে এসে বললেন:

'জাহাঁপনা, শুধু একদিন, আগামীকালই আপনার আজ্ঞা পালিত হবে!'

'আগামীকাল?' বিস্মত সম্রাটের মুখে তাই প্রতিধ্বনিত হল, 'বহুৎ আচ্ছা, আমাকে ঠকানোর চেষ্টায় কিন্তু গর্দান নিশ্চিত।'

সবেমাত্র নীলাকাশে সূর্য উঠেছে আর ফুলকুড়ির ঘুম টুটেছে, ঠিক তখনই সম্রাট প্রাজ্ঞতমকে তলব করলেন।

প্রাজ্ঞতম ঘরে এলেন। হাতে তাঁর ছোট একটি চন্দনপেটিকা।

'জাহাঁপনা, এরই মধ্যে সর্বকালে সর্বজাতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী পাবেন,' নত প্রাজ্ঞ বললেন।

সম্রাট বাক্সটি খুললেন। মখমলের গদিতে ছোট এক টুকরা কাগজ। এতে লিখিত শুধু একটিমাত্র বাক্যাংশ: 'তারা জন্মেছিল, বেঁচেছিল এবং প্রয়াত হয়েছিল।'

এভাবেই প্রাচীন কাহিনীটি প্রচারিত। আর আমাদের যখন সীমিত পরিমাণ কাগজে (অর্থাৎ বইয়ের আয়তন সীমিত করে) রসায়ন সম্পর্কে একটি আকর্ষী বই লিখতে বলা হল, তখন কাহিনীটি আর স্মরণ না করে উপায় ছিল না। এর অর্থ আমরা সেরা ঘটনাগুলিই শুধু লিখতে পারব। কিন্তু রসায়নের সেরা বিষয় কোনগুলি?

'রসায়ন — বস্তু ও তাদের রূপান্তরের বিজ্ঞান।'

চন্দনপেটিকার সেই কাগজটুকরোর উদ্ধৃতিটি স্মরণ করুন।

আমরা মাথা চুলকিয়েছি, মস্তিষ্ক নিঙড়িয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পেঁাছেছি যে, রসায়নের সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। এর কোনটি ব্যক্তিবিশেষের কাছে কম বা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অজৈব রাসায়নিকের কাছে অজৈব রসায়নই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সারাৎসার। কিন্তু জৈব রাসায়নিক বলবেন এর ঠিক উল্টো কথা। এ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন আশ্বাসক ঐক্যমত অসম্ভব।

'সভ্যতা' ধারণাটি বহুবিধ আনুষঙ্গিকের সমাহার এবং তন্মধ্যে রসায়নই সর্বপ্রধান।

মানুষ রসায়নের সাহায্যে আকরিক ও খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করে। রসায়ন ব্যতীত আধুনিক ধাতুশিল্প অসম্ভব হত।

রসায়নের সাহায্যেই উদ্ভিদ, প্রাণী ও খনিজ থেকে ক্রমান্বয়ে আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যতর সামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে।

রসায়ন শুধু প্রকৃতিকে অবিকল অনুকরণ বা নকল করে না, পরন্তু একে বছরের পর বছর ক্রমাগত নানাভাবে অতিক্রম করে যায়। হাজার হাজার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে যা প্রকৃতির রাজ্যে অনুপস্থিত অথচ মানুষের জীবন ও কর্মের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

রসায়নের সৎকার্যের তালিকা বস্তুত অন্তহীন।

জীবনের প্রতিটি অভিব্যক্তিই অজস্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ালগ্ন। রসায়ন ও তার নিয়মাবলী ব্যতিরেকে জীবনের কর্মকাণ্ড অনুধাবন অসম্ভব।

মানুষের বিবর্তনেও রসায়নের নিজস্ব বক্তব্য আছে।

রসায়ন আমাদের খাদ্য, বস্ত্র ও পাদুকার জোগানদার। আধুনিক সভ্য সমাজজীবনের অপরিহার্য সবকিছুই তো রসায়নদত্ত।

ভূ-মহাকর্ষ অতিক্রম করে রকেটগুলি চন্দ্র, মঙ্গল, শুক্র ও বুধে পৌঁছেছে। তাদের মোটরের জন্য জ্বালানি এবং কাঠামোর জন্য তাপসহিষ্ণু উপাদান এল রসায়ন থেকে।

যদি কেউ রসায়নের সবকিছু, এর বহুবিধ পর্যায় এবং সমৃদ্ধির কাহিনী লেখেন, তা হলে অত্যুন্নত যে-কোন দেশের কাগজসম্ভারে অবশ্যই টান পড়বে। সৌভাগ্যবশত, এমন চিন্তা আজও কারও মাথায় আসে নি। কিন্তু আমাদের কাজটি অনেকটা এ ধরনের।

সেই পুরানো উভয়সংকট থেকে উদ্ধারের একটি পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি। আমরা বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে অল্প করে লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশ্য, কী সম্পর্কে লিখব সে আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। অন্য লেখক সম্ভবত অন্য বিষয়াদি সম্পর্কে লিখতেন, তৃতীয়জন ভিন্নতর বিষয়ে বেছে নিতেন। কিন্তু বইটি আমাদের, আর এজন্যই তা আমাদের পছন্দমতো লেখা। তাই হুবহু আপনার ইচ্ছাপূরণ না হলে আমাদের উপর দয়া করে ক্ষুব্ধ হবেন না।

Pa
Cm
Ku
No
Md
Bk
U
Ac
ES
Am
Th
Lr
Fm

বড় বাড়ির
বাসিন্দারা
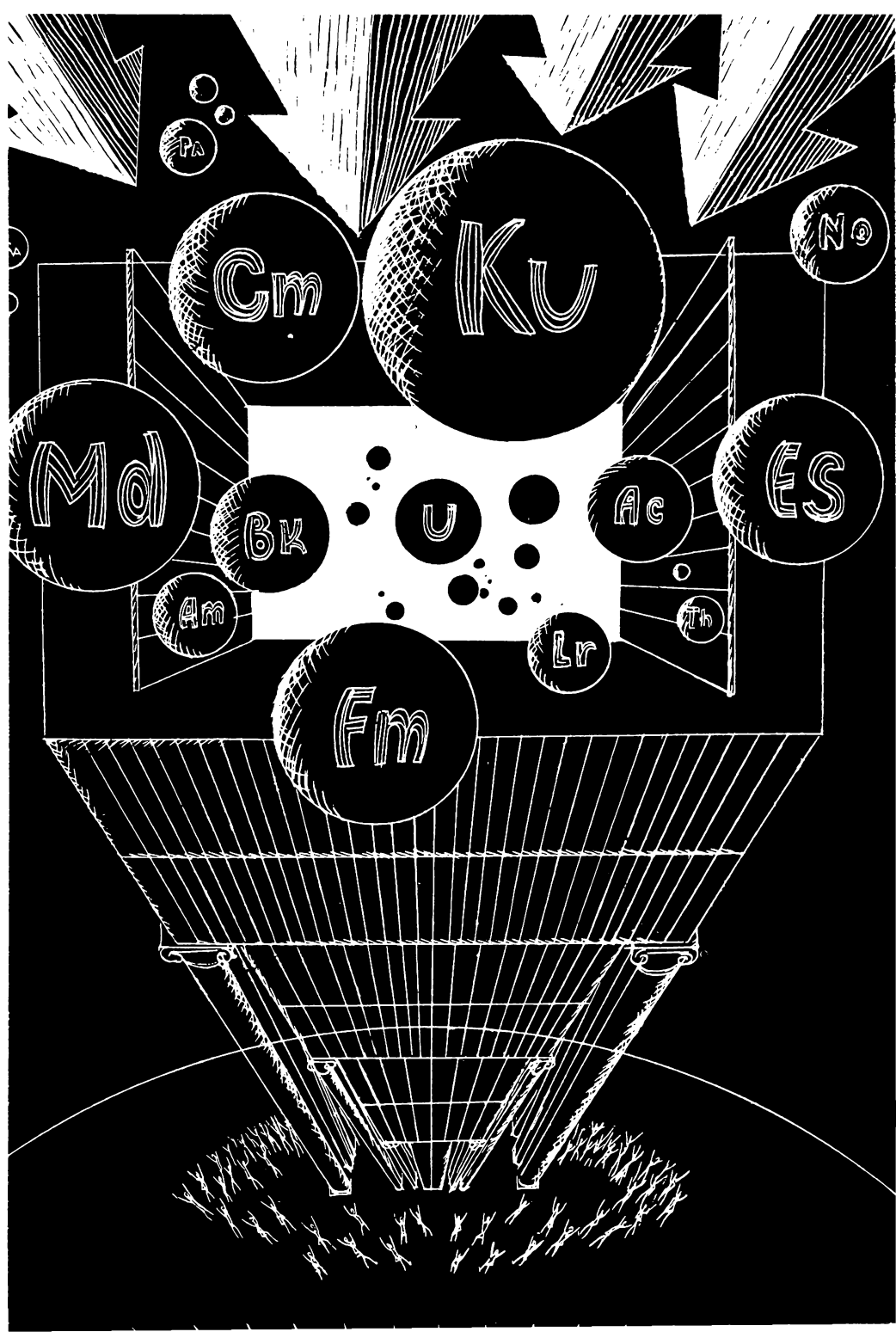
এক নজরে পর্যায়বৃত্ত

এক নজরে দেখা, অস্পষ্ট ধারণা সাধারণত মূল্যহীন। দর্শক এতে কখনও উদাসীন থাকেন, কখনো-বা বিস্মিত হন। দৈবাৎ জিরাফের সামনে অভিভূত বিখ্যাত সেই কাহিনীর নায়কের মতো তাঁর বিমুগ্ধ উক্তি শোনা যায়, — 'এ সত্য হতেই পারে না!'

কিন্তু প্রথম পরিচয়ে, এক নজর কোন বস্তু বা প্রক্রিয়া দেখলে, হয়ত কখনও এতে আপনার কিছু উপকারও হতে পারে।

মেন্দেলেয়েভ কৃত মৌলের পর্যায়বৃত্তকে কোন বস্তু বা প্রক্রিয়া বলা দুষ্কর। একে ববং আয়না বলাই ভাল। এতে প্রতিফলিত প্রকৃতির অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ম — পর্যায়বৃত্তের সারমর্ম। পৃথিবীজাত অথবা মানুষের তৈরি শতাধিক মৌলিক পদার্থ এরই অনুবর্তী, যেন রাসায়নিক মৌলের বড় বাড়ির অবশ্যপালনীয় একপ্রস্থ নিয়ম।

বাড়িটির দিকে বারেক তাকালেই অনেক কিছু বোঝা সম্ভব। এই প্রথম অনুভূতিটিই বিস্ময়ের। বাড়িটি যেন স্বাভাবিক আকারের বড় প্যানেলের দালানকোঠার মাঝখানে উদ্ভট অথচ আকর্ষী স্থাপত্যের একটি নির্দশন।

মেন্দেলেয়েভ সারণীতে বিস্ময়ের কী আছে? শুরুতেই বলা যায় এর পর্যায়সমূহ অর্থাৎ তলাগুলি বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত।

উপর তলা অথবা মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রথম পর্যায়ে ঘর বা কোঠার সংখ্যা মাত্র দু'টি। দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের প্রত্যেকটিতে আটটি এবং পরবর্তী দু'টি তলায় (চতুর্থ ও পঞ্চম) আঠারোটি করে। এটি যেন এক হোটেল। এর নিচের দু'টিতে (ষষ্ঠ ও সপ্তম) ঘরের সংখ্যা আরও বেশি, প্রতিটিতে বত্রিশ। এমন কোন দালান দেখেছেন কখনও?

তবু এটিই রাসায়নিক পদার্থদের বড় বাড়ি তথা পর্যায়বৃত্ত।

স্থপতির খেয়াল? মোটেই না। জানেন ত, যেকোন দালান তৈরির জন্য পদার্থবিদ্যার নিয়ম অবশ্যপালনীয়। অন্যথা আলতো হাওয়ার তোড়েই তার দফা শেষ।

পর্যায়বৃত্তের গঠনশৈলীর অন্তর্গত ভৌত নিয়মাবলির শাসনও অনুরূপ কঠোর এবং মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রতিটি পর্যায়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌলিক পদার্থের অবস্থিতি এই নিয়মেই নির্ধারিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে, প্রথম পর্যায়টি উল্লেখ্য। এখানে দু'টি মৌলের অবস্থান নির্দিষ্ট, এর কমও নয় বেশিও নয়।

পদার্থবিদ সমর্থিত এই প্রত্যয় সম্পর্কে রাসায়নিকরাও অভিন্নমত।

কিন্তু অন্যথাও ছিল। একসময় পদার্থবিদরা চুপই ছিলেন, কারণ পর্যায়বৃত্ত

তখনও তাঁদের বিব্রত করতে শুরু করে নি। কিন্তু রাসায়নিকরা প্রায় প্রতি বছরই নতুন মৌল খুঁজে পাচ্ছিলেন আর এই নবাগতদের জায়গা দেবার সমস্যা নিয়ে ভাবনায় পড়েছিলেন। মাঝে মাঝে আবার বেজায় বিদ্ঘুটে সমস্যাও দেখা দিত যখন সারণীর একই কোঠায় জায়গা নেবার জন্য দাবিদাররা লাইন দিয়ে দাঁড়াত।

সন্দেহবাদী বিজ্ঞানীদের সংখ্যাও তখন কম ছিল না। তাঁরা পর্যাপ্ত গাম্ভীর্যে ঘোষণা করলেন যে, মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রাসাদটি বালুর উপর তৈরি। তাঁদেরই একজন ছিলেন জার্মান রাসায়নিক বুনসেন, যিনি তাঁর বন্ধু কির্খ্‌হফের সঙ্গে বর্ণালীগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু বিষয়টি পর্যায়বৃত্তে প্রযুক্ত হলে, বুন্‌সেন বৈজ্ঞানিক অদূরদর্শিতার এক বিস্ময়কর নজির সৃষ্টি করলেন। একসময় চটে গিয়ে বললেন, 'এ তো মুদ্রা বাজারের কাগজ পত্রের অঙ্কে নিয়মানুবর্তিতা সন্ধান!'

মেন্দেলেয়েভের আগেও তৎকালে জ্ঞাত ষাটোর্ধ্ব সংখ্যক মৌলকে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। সম্ভবত নিউল্যান্ড্‌স নামক জনৈক ব্রিটিশ সত্যের সর্বাধিক সমীপবর্তী ছিলেন। তিনি 'অষ্টক সূত্রের' সুপারিশকারী। বর্ধমান পারমাণবিক ভর অনুসারে মৌল বিন্যাসের চেষ্টায় নিউল্যান্ড্‌স দেখলেন যে, সঙ্গীতে যেমন উচ্চপর্যায়ে প্রতিবারই অষ্টম সুরে প্রথম সুরের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তেমনি প্রতিটি অষ্টম মৌলেও প্রথম মৌলের সদৃশ ধর্মই প্রকটিত হয়। কিন্তু নিউল্যান্ড্‌সের আবিষ্কারটি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি হল: 'আপনি কেন বর্ণানুক্রমিকভাবে মৌলগুলি বিন্যস্ত করেন নি? এভাবেও তো একটি নিয়মানুবর্তিতা সন্ধান সম্ভব!'

এই ভেংচিমুখো প্রতিদ্বন্দ্বীদের কী জবাব দেবেন বেচারা নিউল্যান্ড্‌স?

মেন্দেলেয়েভের সারণীও শুরুতে সুঅভ্যর্থিত হয় নি। এর 'স্থাপত্য' তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হয়। এর অনেক কিছুই তখনও অস্পষ্ট এবং তাই ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। আধ ডজন নতুন মৌল আবিষ্কারের চেয়ে সারণীতে তাদের যথাস্থানে স্থাপন অনেক বেশি কঠিন।

কেবল এক তলার ব্যাপারটি বোধ হয় সন্তোষজনক ছিল। ওখানে অপ্রত্যাশিত আবাসিকদের ঢুকে পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এখন এক তলায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের বাস। এগুলির পরমাণুর নিউক্লীয় আধান যথাক্রমে ধনাত্মক ১ ও ২। এটা স্পষ্ট যে, এগুলির মাঝামাঝি অন্যতর কোন মৌলের অস্তিত্ব অসম্ভব। প্রকৃতির রাজ্যে এমন কোন নিউক্লিয়াস বা কণা নেই যাদের আধান ভগ্নাংশসংখ্যক।

(অথচ ইদানীং কালের তাত্ত্বিক পদার্থবিদরা কোয়ার্কের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনারত। নামটি প্রাথমিক মৌলিক কণার বেলায় প্রযুক্ত। এতদ্বারা পরমাণুর

নিউক্লিয়াসের উপকরণ প্রোটন ও নিউট্রন সহ বাকী সবকিছুই নির্মাণ সম্ভব। মনে করা হয় যে, কোয়ার্ক ধনাত্মক ১/৩ ও ঋণাত্মক ১/৩, ইত্যাকার ভগ্ন আধানযুক্ত। যদি সত্যিই কোয়ার্ক বলে কিছু থাকে, তা হলে মহাজগতের 'বস্তু-বিন্যাস' নতুনভাবে আমাদের সামনে প্রকটিত হবে।)

জ্যোতির্বিদদের প্ররোচনায় রাসায়নিকদের পণ্ডশ্রম

'পর্যায়বৃত্ত সারণী যে হাইড্রোজেন থেকেই শুরু হবে, বিষয়টি কিছুতেই আমার মনে আসে নি।'

কথাগুলি কার মনে হয়? যে গবেষকবাহিনী কিংবা সৌখীন সন্ধানীদল স্বীয় পর্যায়বৃত্ত আবিষ্কার অথবা তার যদৃচ্ছা পুনর্বিন্যাসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সম্ভবত তাঁদের কেউ? বিভিন্ন ধরনের 'পর্যায়বৃত্তের' তখন ছড়াছড়ি আর তাদের সংখ্যাও চিরচলন্ত যন্ত্র উদ্ভাবকের চেয়ে কম নয়।

তবে পূর্বোক্ত বাক্যটি আর কারও নয়, স্বয়ং মেন্দেলেয়েভের। তাঁর 'রসায়নের ভিত্তি' গ্রন্থ থেকে এটি উদ্ধৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বিখ্যাত পাঠ্যবইটি হাজার হাজার ছাত্র পড়ত।

পর্যায়বৃত্ত আবিষ্কারকের ভুল হয়েছিল কেন?

সেকালে এমন ভুলের সবক'টি কারণই প্রকটিত ছিল। মৌলসমূহ তৎকালে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতেই সারণীতে বিন্যস্ত থাকত। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পারমাণবিক ভর যথাক্রমে ১·০০৮ ও ৪·০০৩। সুতরাং ১·৫, ২, ৩, ইত্যাদি ভরের সম্ভাব্য মৌলের অস্তিত্ব কল্পনা করতে অসুবিধা কি? কিংবা হাইড্রোজেনের চেয়ে হালকা, একের সংখ্যার চেয়ে কম পারমাণবিক ভরের কোন কিছু?

মেন্দেলেয়েভ ও অন্য অনেক রাসায়নিক এর সম্ভাব্যতা স্বীকার করতেন। আর রসায়ন থেকে বহুদূরের বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদদেরও তাঁরা সমর্থন লাভ করেন। আমরা নিশ্চিত সমর্থনটি ছিল অনিচ্ছাকৃত। ল্যাবরেটরি, পার্থিব খনিজ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেও যে মৌল আবিষ্কার সম্ভব এই প্রত্যয়টি জ্যোতির্বিদদের দ্বারাই প্রথম প্রমাণিত হয়।

১৮৬৪ সালে ব্রিটিশ ও ফরাসী জ্যোতির্বিদদ্বয় লকিয়ার ও জাঁসেন পূর্ণ সূর্যগ্রহণের চোখ ধাঁধানো জ্যোতিশ্চক্র-রশ্মি বর্ণালীবিশ্লেষক পরকলা কাচের মধ্যে প্রতিফলিত করেন। বর্ণালীরেখার ঘনবদ্ধ বেড়ার মধ্যে এমন কিছু রেখা তাঁরা লক্ষ করলেন, যা পৃথিবীর জ্ঞাত কোন মৌলেরই নয়। তাই আবিষ্কৃত হল হিলিয়াম।

গ্রীক শব্দ 'হিলিয়াস' ('সৌর') থেকেই নামটি আহৃত। এর সাতাশ বছর পর ব্রিটিশ পদার্থবিদ রাম্‌জে ও উইলিয়াম ক্রুক্স পৃথিবীতে প্রথম হিলিয়াম খুঁজে পান।

তাঁর আবিষ্কার সংক্রামক প্রমাণিত হল। জ্যোতির্বিদদের দূরবিন ঘুরল সুদূর নক্ষত্র ও নীহারিকার দিকে। তাঁদের আবিষ্কারসমূহ সতর্কতার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার বর্ষপঞ্জিতে প্রকাশিত হল এবং এদের কোন কোনটি রসায়নের সাময়িকীতেও পথ খুঁজে পেল। এই তথ্যাবলীতে মহাবিশ্বের অসীম শূন্যে নতুন মৌল আবিষ্কারের দাবি উচ্চারিত ছিল। পদার্থগুলির নামকরণ করা হয়েছিল গালভরা শব্দপুঞ্জে: করোনিয়াম, নিবুলিয়াম, আর্কনিয়াম, প্রোটফ্লোরিন। নাম ছাড়া রাসায়নিকরা এগুলি সম্পর্কে আর বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। কিন্তু হিলিয়ামের সুখদ পরিণতির কথা ভেবে তাঁরা এই আকাশচারী আগন্তুকদের পর্যায়সূত্রে স্থান দেবার জন্য তাড়াহুড়া শুরু করেন। তাঁরা এগুলিকে হাইড্রোজেনের আগে অথবা হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মাঝামাঝি স্থানে রাখলেন। আশা ছিল, ভবিষ্যতে কখনও হয়ত নব্য রাম্‌জে ও ক্রুক্সরা করোনিয়াম ও তার অনুরূপ রহস্যময় সঙ্গীদের পার্থিব অস্তিত্ব প্রমাণ করবেন।

কিন্তু পদার্থবিদরা পর্যায়বৃত্তে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে সব আশার সলিলসমাধি ঘটল। দেখা গেল পারমাণবিক ভর পর্যায়সূত্রের জন্য কোন নির্ভরশীল পদক্ষেপ নয়। নিউক্লিয়াসের আধান অথবা মৌলের পারমাণবিক সংখ্যাদ্বারা অতঃপর পারমাণবিক ভর প্রতিস্থাপিত হল।

পর্যায়বৃত্তে মৌল থেকে মৌলে উত্তরণের সময় এই আধান প্রতিবারই একটি একক হারে বৃদ্ধি পায়।

কালক্রমে জ্যোতির্বিদ্যার নির্ভুলতর যন্ত্রপাতি নিবুলিয়ামের রহস্যযবনিকা ঈষৎ উন্মোচিত করল। জানা গেল, নতুন মৌলসমূহ আসলে বহুজ্ঞাত মৌলের পরমাণুসমূহের কিছুসংখ্যক ইলেকট্রনচ্যুতির ফলশ্রুতি এবং এজন্যই এই অস্বাভাবিক বর্ণালীর উদ্ভব। অতএব আকাশচারী আগন্তুকদের 'পরিচয়পত্র' ভুয়া প্রমাণিত হল।

দ্বিমুখী মৌল

স্কুলে রসায়নের ক্লাসে এই ধরনের কোন আলাপ হয়ত শুনেছেন।

শিক্ষক:

'পর্যায়বৃত্ত সারণীর কোন দলে হাইড্রোজেন আছে?'

ছাত্র:

'প্রথম দলে। কারণ, প্রথম দলভুক্ত ক্ষারধাতু লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম,

রুবিডিয়াম, সিজিয়াম ও ফ্রান্সিয়ামের মতো হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন খোলকে, ইলেকট্রন মাত্র একটি। ওদের মতোই হাইড্রোজেন রাসায়নিক যৌগের ক্ষেত্রে মাত্র একটি ধনাত্মক যোজ্যতার প্রদর্শক। আর হাইড্রোজেন কোন কোন লবণ থেকে তাদের ধাতু অপসারণেও সক্ষম।'

এ কি সত্য? তাই, তবে অর্ধসত্য।

রসায়ন নিখুঁত বিজ্ঞান এবং অর্ধসত্য রাসায়নিকদের অপছন্দ। হাইড্রোজেন এর বিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত।

হাইড্রোজেন ও ক্ষারীয় ধাতুসমূহের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য বর্তমান? কেবলমাত্র এগুলির ধনাত্মক একযোজ্যতা, প্রত্যন্ত খোলকের সদৃশ ইলেকট্রন বিন্যাস। আর কোন সাদৃশ্য নেই। হাইড্রোজেন গ্যাস ও সেই সঙ্গে অধাতু। হাইড্রোজেন দ্বিপারমাণবিক অণু গঠন করে। প্রথম দলের অবশিষ্ট মৌলসমূহ ক্ল্যাসিকাল ধাতু বিধায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সর্বাধিক সক্রিয়। নিজের একমাত্র ইলেকট্রনটি ঘুরিয়ে হাইড্রোজেন ক্ষারধাতু সাজতে চায়। কিন্তু ওটি আসলে মেষের চামড়াপরা ভেখধারী নেকড়ে।

বড় বাড়ির ব্যবস্থানুসারে এখানে স্বগোত্রীয় মৌলসমূহ একে অন্যের এক তলা উপরে বাস করে এবং এভাবেই পর্যায়বৃত্তের দল ও উপদলসমূহ গঠিত। বড় বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য এটিই আইন। হাইড্রোজেন প্রথম দলে পড়ে অনিবার্যত আইনটি লঙ্ঘন করেছে।

কিন্তু বেচারা হাইড্রোজেন যাবেই-বা কোথায়? এগুলি সকলেই বড় বাড়ির নয় তলা সিঁড়িঘরে নবম দলে রয়েছে। হিলিয়াম হাইড্রোজেনের এক তলার পড়শী। সে এখানে ঘর পেয়েছে অধুনাকথিত শূন্য দলের সদস্যরূপে। দলের অন্যান্য স্থান এখনও ফাঁকা। দেখা যাক, হাইড্রোজেনের জন্য একটা সত্যিকার 'আশ্রয়ের' কী কী সম্ভাবনা এক তলার পুনর্বিন্যাসে নিহিত!

দ্বিতীয় দলের পার্থিব ক্ষারধাতুরা যেখানে বেরিলিয়ামের অধীনে বসবাস করছে, সেখানে কি ওকে রাখা যায় না? না, হাইড্রোজেনের সঙ্গে এগুলির বিন্দুমাত্রও কুটুম্বিতা নেই। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দলও বিষয়টি সম্পর্কে গররাজী। কিন্তু সপ্তম দল? দাঁড়ান! ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রমুখ হ্যালোজেন ঐ দলে রয়েছে। হাইড্রোজেনকে সাদর অভ্যর্থনার জন্য এরা উদগ্রীব।

...দু'টি শিশুর সাক্ষাৎ কল্পনা করুন।

'তোমার বয়স কত?'

'এত।'

'আমারও।'

'আমার একটা সাইকেল আছে।'

'আমারও।'

'তোমার বাবা কী করেন?'

'ট্রাক চালান।'

'ট্রাক ড্রাইভার! আঁ!, আমার বাবও!'

'চল, আমরা বন্ধু হই!'

'চল!'

'তুমি কি অধাতু?' ফ্লোরিন হাইড্রোজেনকে জিজ্ঞেস করল।

'তাই!'

'তুমি কি গ্যাস?'

'ঠিক বলেছ।'

'আমরাও,' ক্লোরিনকে দেখিয়ে ফ্লোরিন বলল।

'আমার অণুতে পরমাণু দুটি!' হাইড্রোজেন যোগ করল।

'বল কী!' বিস্মিত ফ্লোরিন বলল, 'অবিকল আমাদেরই মতো।'

'আর তুমি কি ঋণাত্মক যোজ্যতা দেখাতে পার, নিতে পার বাড়তি ইলেকট্রন? এমনটি আমাদের ভারি পছন্দ!'

'পারি না? যেসকল ক্ষারধাতু আমাকে অপছন্দ করে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমি হাইড্রাইড নামের হাইড্রোজেন যৌগ তৈরি করি এবং তাদের মধ্যে আমি ঋণাত্মক একযোজী।'

'তা হলে সব ঠিক! সোজা আমাদের মধ্যে চলে এস, আমরা বন্ধু হই!'

আর এভাবেই হাইড্রোজেন সাত তলায় জায়গা পেল। কিন্তু বেশি দিন ওখানে তার থাকা হবে কি? নতুন আত্মীয়টি সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নেয়ার পর হ্যালোজেনদের একটির মুখে হতাশ মন্তব্য শোনা গেল:

'দেখ ভাই, তোমার প্রত্যন্ত খোলকে তেমন কিছু বেশি ইলেকট্রন নেই, তাই না? মাত্র একটি। দেখে মনে হচ্ছে... প্রথম দলের ওদের মতো। তুমি ক্ষারধাতুদের ওখানে গেলেই ত হয়।'

দেখুন কী মুশকিলেই না হাইড্রোজেন পড়েছে। ওখানে ঘরের অভাব নেই। কিন্তু কোনটিই সে স্থায়ীভাবে পুরো অধিকারে দখল করতে পারছে না। একটি উদ্ভট অবস্থা তাই না? হাইড্রোজেন ক্ষারের নাগালও পেল না হ্যালোজেনের কাতারেও গেল না।

কিন্তু কেন? হাইড্রোজেনের এই অদ্ভুত দ্বিমুখিতার কারণ কি? কেনই-বা তার আচার ব্যবহার এত অসাধারণ?

কোন রাসায়নিক পদার্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে মিলিত হলেই তার স্বকীয় ধর্ম প্রকটিত হয়। সে তখন ইলেকট্রন দান অথবা গ্রহণ করে, তার প্রত্যন্ত খোলক থেকে ইলেকট্রন চ্যুত হয় কিংবা তাতে যুক্ত হয়। যখন কোন মৌল প্রত্যন্ত খোলকের সবক'টি ইলেকট্রনই হারিয়ে ফেলে, তখন অন্য খোলকগুলি অপরিবর্তিত থাকে। হাইড্রোজেন ছাড়া আর সকল মৌলই এই নিয়মের অধীন। হাইড্রোজেনের একমাত্র ইলেকট্রনটি হারালে পারমাণবিক নিউক্লিয়াস ছাড়া তার আর কিছুই বাকী থাকে না। আর এটি শুধুমাত্র একটি প্রোটন, যা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের সর্বস্ব (অবশ্য সর্বদাই এটি একক প্রোটনসর্বস্ব নয়, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরে আলোচিত হবে)। সুতরাং, হাইড্রোজেনের রসায়ন এক অনন্য রসায়ন, ঠিক যেন প্রোটন তথা মৌলিক কণার রসায়ন। তাই হাইড্রোজেন সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া প্রোটনে প্রভাবিত।

এবং এজন্যই হাইড্রোজেনের স্বভাবে এই প্রকট অসংলগ্নতা।

আদি ও অশেষ বিস্ময়

হাইড্রোজেনের আবিষ্কারক প্রখ্যাত ইংরেজ পদার্থবিদ স্যর হেনরি ক্যাভেণ্ডিস। তিনি বিদ্বানদের মধ্যে ধনাঢ্যতম এবং ধনাঢ্যদের মধ্যে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ। কথাটি তাঁর জনৈক সমকালীন ব্যক্তির। আর সে সঙ্গে আমরা যোগ করছি যে, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিশিষ্টতম। বলা হয়, নিজের লাইব্রেরি থেকে কোন বই নিলেও বুককার্ডে নাম সই করতে তিনি ভুল করতেন না। এই সুস্থিরতম মানুষটি গবেষণায় পূর্ণ আত্মোৎসর্গিত ও বিজ্ঞানে আবিষ্ট ছিলেন। বলা হত, তিনি উন্নাসিক সন্ন্যাসী। কিন্তু এই গুণাবলির জন্যই তাঁর পক্ষে নতুন গ্যাস হাইড্রোজেন আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছিল। আর বিশ্বাস করুন, কাজটি মোটেই সোজা ছিল না!

এর আবিষ্কার কাল ১৭৬৬ সাল আর ফরাসী অধ্যাপক শার্ল হাইড্রোজেন ভরাট বেলুন উড়ান ১৭৮৩ সালে।

রাসায়নিকদের কাছেও হাইড্রোজেন এক অমূল্য আবিষ্কার বৈকি। এরই ফলে অম্ল ও ক্ষারের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক যৌগের গঠন সম্পর্কে অধিকতর জানা তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হল। লবণের দ্রব থেকে ধাতুর অধঃক্ষেপণ এবং ধাতব
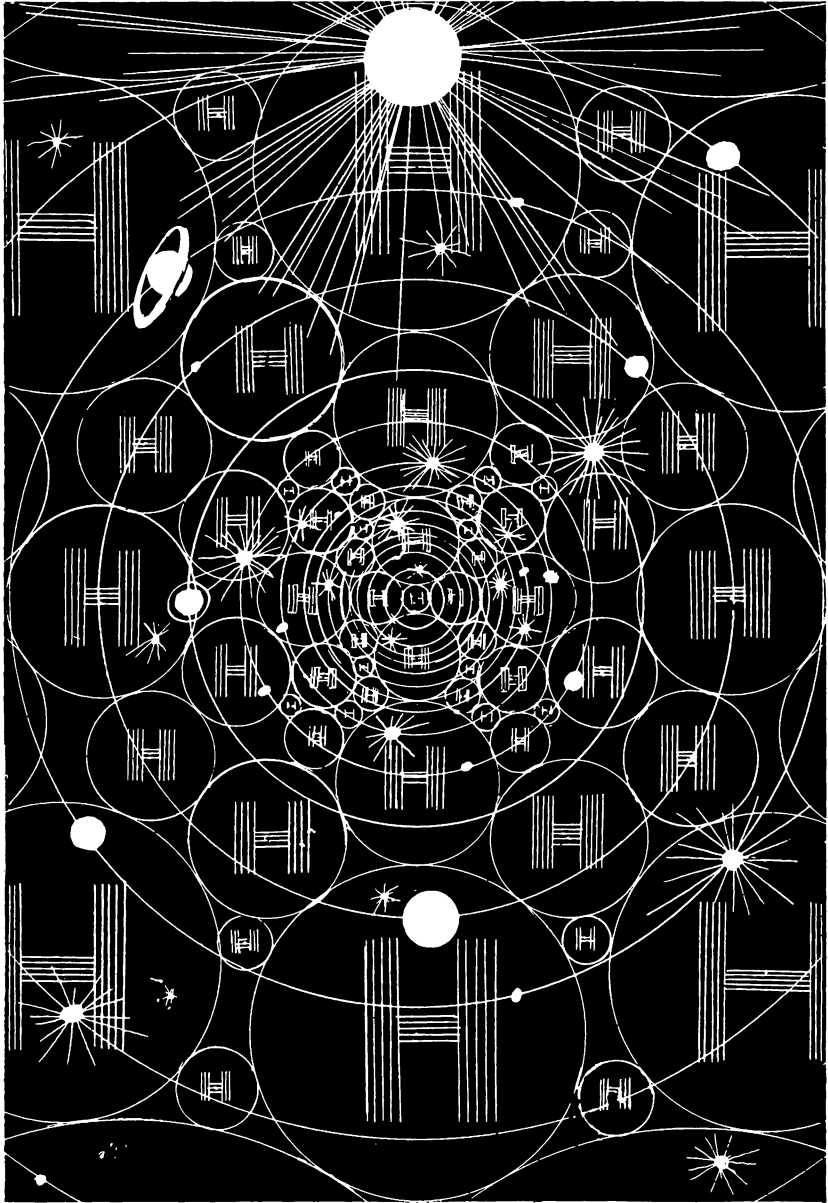
অক্সাইডের বিজারণে ল্যাবরেটরি বিকারক হিসেবে এটি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। আর উদ্ভট শোনালেও, হাইড্রোজেনের আবিষ্কার ১৭৬৬ সালে না হয়ে আরও অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে গেলে (এমনটি ঘটা অবশ্যই সম্ভব ছিল), তাত্ত্বিক ও ফলিত এই উভয় ক্ষেত্রেই রসায়নের উন্নতি অনিবার্যভাবে দীর্ঘকাল প্রহত হত।

হাইড্রোজেন সম্পর্কে রাসায়নিকরা যখন যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং ফলিত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উৎপাদনে যখন এর ব্যবহার শুরু হয়েছে, তখনই গ্যাসটির প্রতি নজর পড়ল পদার্থবিদদের। তাঁরাও এর বহু তথ্যাদি আবিষ্কার করলেন। বিজ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হল।

আর কোন্ সাক্ষ্যের প্রয়োজন? আরও কিছু বলার আছে। প্রথমত, যেকোন তরল পদার্থ বা গ্যাসের (হিলিয়াম ছাড়া) তুলনায় হাইড্রোজেন হিমাঙ্কের অনেক নিচের তাপমাত্রায় ঘনীভূত হয় এবং তা —২৫৯·১ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড*। দ্বিতীয়ত, ওলন্দাজ পদার্থবিদ নিল্‌স বোর হাইড্রোজেনের সাহায্যেই পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ইলেকট্রন বিন্যাসের নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন যা ছাড়া পর্যায়বৃত্তের ভৌত মর্মার্থ বোধগম্য হত না। এই তথ্যাবলীই ছিল অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ভিত্তিস্বরূপ।

অতঃপর পদার্থবিদরা তাঁদের ঘনিষ্ঠ পেশাদার, নক্ষত্রের সংযুতি ও গঠন নিরীক্ষক নভোবস্তুবিদদের কাছে বিষয়টি হস্তান্তরিত করেন। তাঁরা বললেন হাইড্রোজেন মহাবিশ্বের একনম্বর মৌল। সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকার এটাই মূল উপাদান ও ভান্তঃপ্রদেশের প্রধান 'ভরণ'। মহাশূন্যের সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের মোট পরিমাণের তুলনায় হাইড্রোজেনেরই পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু পৃথিবীতে অবস্থা একেবারেই আলাদা, এখানে এর পরিমাণ এক শতাংশেরও কম। বিজ্ঞানীদের মতে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের যে দীর্ঘ পরিবর্তনপ্রবাহের মাধ্যমে সকল রাসায়নিক মৌলের বিনা ব্যতিক্রমে, সকল অণুর উদ্ভব, হাইড্রোজেনই তার আরম্ভবিন্দু। সূর্য ও সকল নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা তাদের অভ্যন্তরীণ তাপপারমাণবিক বিক্রিয়ারই ফল, এতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় ও বিপুল শক্তির উৎসরণ ঘটে। পৃথিবীর বিশিষ্ট রাসায়নিক এই হাইড্রোজেনটি কিন্তু মহাশূন্যের এক প্রখ্যাত রাসায়নিক।

হাইড্রোজেন আরও একটি আশ্চর্য ধর্মের অধিকারী। এর অণুজাত বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২১ সেণ্টিমিটার। একে বিশ্বধ্রুবক বলা হয়, কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই

---

* এখানে ও পরে সমস্ত তাপমাত্রা দেয়া হল সেণ্টিগ্রেড অনুসারে। — সম্পাঃ

এর মান একই। বিজ্ঞানীরা অন্য বসতিলোকে হাইড্রোজেন তরঙ্গে বেতারযোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। ঐ সকল জগতে যদি কোন বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তা হলে ২১ সেণ্টিমিটারের অর্থ অবশ্যই তাদের জানা থাকবে...

পৃথিবীতে হাইড্রোজেন কত প্রকার?

বিজ্ঞানীর কাছে নোবেল পুরস্কারই শ্রেষ্ঠতম সম্মান। পৃথিবীতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা বহু, কিন্তু নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন শতাধিক জন এবং তা অতুল্লেখ্য আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠতমের জন্য।

১৯৩২ সালের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী: মার্ফি, উরি ও ব্রিক্‌ওয়েড।

পূর্বে মনে করা হত, পৃথিবীতে এক প্রকার হাইড্রোজেনই আছে যার পারমাণবিক ভর এক। মার্ফি ও তাঁর সহকর্মীরা দ্বিগুণ ভারি দ্বিতীয় একটি হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। এটি ছিল হাইড্রোজেন আইসোটোপ, যার পারমাণবিক ভর দুই।

আইসোটোপ পরমাণুর প্রকারভেদ মাত্র, এদের আধান সদৃশ, কিন্তু পারমাণবিক ভর ভিন্ন। অর্থাৎ আইসোটোপের পরমাণু নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বেশি। সকল রাসায়নিক পদার্থেরই আইসোটোপ আছে। এদের কোনটি প্রকৃতিজাত, অন্যগুলি নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন।

হাইড্রোজেনের আইসোটোপ যার নিউক্লিয়াস একটি প্রোটনমাত্র, তার নাম প্রোটিয়াম এবং প্রতীক H^1। সম্পূর্ণ নিউট্রনহীন নিউক্লিয়াসের এটিই একমাত্র নজির (হাইড্রোজেনের আরও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য!)।

এই একক প্রোটনে একটি নিউট্রন যোগ করুন, এখনই ভারি হাইড্রোজেন আইসোটোপের নিউক্লিয়াস তৈরি হবে। এর নাম ডিউটেরিয়াম (H^2 বা D)। ডিউটেরিয়ামের তুলনায় প্রকৃতিতে প্রোটিয়ামের প্রাচুর্য অধিক এবং মোট পরিমাণের তা ৯৯ শতাংশ।

কিন্তু তৃতীয় প্রকারের একটি হাইড্রোজেনও আছে। এর নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা দুই। এটি ট্রিটিয়াম (H^3 বা T)। মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে তা নিরন্তর বায়ুমণ্ডলে তৈরি হচ্ছে। কিন্তু জন্মমুহূর্তেই ট্রিটিয়ামের বিলয় ঘটে। এটি তেজস্ক্রিয় এবং হিলিয়াম আইসোটোপে (হিলিয়াম-৩) খর্বিত হওয়াই এর নিয়তি। ট্রিটিয়াম অন্যতম দুর্লভ মৌল। পৃথিবীর সারা আবহমণ্ডলে এর মোট পরিমাণ মাত্র ৬ গ্রাম। বাতাসের প্রতি ১০ ঘন সেণ্টিমিটারে ট্রিটিয়ামের পরমাণু থাকে একটি। অধুনা

কৃত্রিমভাবে আরও ভারি হাইড্রোজেন আইসোটোপ তৈরি হয়েছে। এরা H^4 ও H^5 এবং অত্যন্ত অস্থায়ী।

আইসোটোপের অস্তিত্বের জন্যই রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেন বিশিষ্ট নয়। কিন্তু অন্যদের তুলনায় হাইড্রোজেন আইসোটোপের ধর্ম, বিশেষভাবে ভৌত ধর্ম প্রকটভাবে আলাদা। অন্যান্য মৌলের আইসোটোপ প্রায় তারতম্যহীন। প্রত্যেক প্রকার হাইড্রোজেনই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাদের ধর্মও বিভিন্ন। যথা, প্রোটিয়াম ডিউটেরিয়াম অপেক্ষা সক্রিয়তর। হাইড্রোজেন আইসোটোপের বৈশিষ্ট্য পরীক্ষাক্রমে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন বিজ্ঞানশাখা গঠন করেছেন। এটি আইসোটোপ রসায়ন। আমরা যে রসায়নকে জানি প্রত্যেক প্রকার আইসোটোপ সহ সামগ্রিকভাবে সকল মৌলই তার আলোচ্য বিষয়। কিন্তু আইসোটোপ রসায়নের লক্ষ্য আলাদা আলাদা আইসোটোপের পরীক্ষা। এর সাহায্যে বিবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিলতম অন্তর্দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা সম্ভবপর।

রসায়ন = পদার্থবিদ্যা + গণিত

ঠিকাদার দালান তৈরি করতে গিয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠিয়ে যদি নকশাকারীকে সবকিছু ঠিক হয়েছে কি না তার হিসেব করতে বলে, তবে তার সম্পর্কে কী বলা যায়?

এ যেন 'আয়নার মধ্যে দিয়ে' সেই কাহিনীটির মতো শোনাচ্ছে। তাই না?

যা হোক মৌলের পর্যায়বৃত্তের কপালে তা-ই ঘটেছিল। বড় বাড়িটি প্রথমে তৈরি হল, মৌলগুলি নিজ নিজ ঘর পেল। মেন্দেলেয়েভ সারণী রাসায়নিকদের হাতিয়ার হয়ে উঠল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে মৌলসমূহের ধর্ম কেন পুনরাবৃত্ত হয় বহুকাল এর উত্তর তাঁদের অজানা রইল।

শেষে উত্তর এল পদার্থবিদদের কাছ থেকে। যে শক্তির ভিতে মেন্দেলেয়েভ পর্যায়বৃত্ত গড়া তাঁরা তার হিশেব করলেন আর ফল ফলল চমৎকার। তাঁরা দেখলেন এটি পুরোপুরি 'রাসায়নিক বলবিদ্যার' নিয়মেই তৈরি। সুতরাং মেন্দেলেয়েভের সত্যিকার অসাধারণ স্বজ্ঞা ও রসায়নে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য স্বীকার না করে আমরা নিরুপায়।

পদার্থবিদরা পরমাণুর গড়ন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান শুরু করলেন।

পরমাণুকেন্দ্রই নিউক্লিয়াস। এর চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন, যেগুলি সংখ্যায় নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধানের সমসংখ্যক। হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন একটি, পটাসিয়ামের উনিশটি আর ইউরেনিয়ামের বিরানব্বই... এরা ঘোরে কীভাবে? বিজলীবাতির চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান পতঙ্গের মতো বিশৃঙ্খলভাবে অথবা কোন নির্দিষ্ট নিয়মে?

প্রশ্নটির উত্তর দিতে বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন ভৌত তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, নতুন গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের লব্ধ ফলাফল: সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান গ্রহপুঞ্জের মতো ইলেকট্রনও নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে।

'প্রতি খোলকে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত? যেকোন সংখ্যা, নাকি সীমিত সংখ্যক?' রাসায়নিকদের জিজ্ঞাসা।

'সুনির্দিষ্ট সংখ্যা! সকল ইলেকট্রন খোলকের সামর্থ্যই সীমিত,' পদার্থবিদদের উত্তর।

ইলেকট্রন খোলকের জন্য পদার্থবিদদের ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ তাঁদের নিজস্ব। তাঁদের ব্যবহৃত বর্ণসমূহ — K, L, M, N, O, P, Q, R, S. . . এই বর্ণসমূহেই নিউক্লিয়াস থেকে পর্যায়ক্রমে খোলকগুলির দূরত্ব চিহ্নিত।

গাণিতিকদের সহযোগিতায় পদার্থবিদরা খোলক প্রতি ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ধারণের এক বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

K-খোলক মাত্র দু'টি ইলেকট্রন ধারণে সক্ষম এবং এর বেশি নয়। এদের প্রথমটি হাইড্রোজেন এবং দ্বিতীয়টি হিলিয়াম পরমাণুতে অবস্থিত। তাই মেন্দেলেয়েভ সারণীয় প্রথম পর্যায়ে শুধুমাত্র দুটি মৌলের অধিষ্ঠান।

L-খোলক অধিক সংখ্যক ইলেকট্রন ধারণে সক্ষম এবং তার সংখ্যা সর্বাধিক ৮টি। লিথিয়াম পরমাণুতে এই খোলকের প্রথম ইলেকট্রন এবং নিয়ন পরমাণুতে এর শেষটি বর্তমান। তাই মেন্দেলেয়েভ সারণীর দ্বিতীয় পর্যায়ে লিথিয়াম থেকে নিয়ন পর্যন্ত মৌলসমূহের অবস্থান।

পরবর্তী ইলেকট্রন খোলকগুলিতে তা হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত? M-খোলকে ১৮টি ইলেকট্রনের স্থানসঙ্কুলান সম্ভব এবং এভাবে N,O আর P-তে যথাক্রমে ৩২, ৫০, ৭২ টি, ইত্যাদি...

যে দু'টি মৌলের প্রত্যন্ত ইলেকট্রন খোলকের বিন্যাস সদৃশ এগুলি সমধর্মী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লিথিয়াম ও সোডিয়ামের কথা উল্লেখ্য। এদের প্রত্যেকের প্রত্যন্ত খোলকে ইলেকট্রন সংখ্যা এক। এবং সেজন্যই পর্যায়বৃত্তের একই দলে অর্থাৎ দলে

তাদের অবস্থান। লক্ষণীয়, কোন দলভুক্ত মৌলসমূহের দলের ক্রমিক সংখ্যা তাদের যোজনীয় ইলেকট্রন সংখ্যার সমান।

এবং সিদ্ধান্ত: সদৃশ গড়নের ইলেকট্রন খোলক পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হয়, আর তাই মৌলেরও ঘটে পর্যায়ক্রমিক আবৃত্তি।

আরও কিছু অংক

সবকিছুরই যুক্তি থাকে, এমন কি ব্যাখ্যাতীত ঘটনারও। প্রথমে তা মোটেই বোধগম্য না হলেও পরে এর অসঙ্গতি ধরা পড়ে। যেকোন তত্ত্ব বা প্রকল্পের পক্ষে অসঙ্গতিমাত্রই অস্বস্তিকর। এতে তত্ত্বের ভুল ধরা পড়ে কিংবা তা কঠোর মনন দাবী করে। ফলত, এই শ্রমিষ্ঠ মনন কখনও দুর্বোধ্যের অন্তর্ভেদেও সক্ষম হয়।

এরূপ অসঙ্গতির একটি দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত। পর্যায়বৃত্তের প্রথম দু'টি পর্যায়েই শুধু সমতার আধিপত্য। এর প্রতি পর্যায়ে মৌলের অবস্থানসমূহ তাদের প্রতিসঙ্গী প্রত্যন্ত ইলেকট্রন খোলকের সামর্থ্য দ্বারা কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। তাই প্রথম পর্যায়ের মৌল হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরমাণুতে K-খোলকটি সম্পূর্ণ ভরাট। দু'টির বেশি ইলেকট্রন ধারণে এটি অক্ষম এবং তাই প্রথম পর্যায়ে কেবলমাত্র দু'টি মৌলই অবস্থিত। দ্বিতীয় **পর্যায়ে** অবস্থিত লিথিয়াম থেকে নিয়ন অবধি মৌলসমূহের পরমাণুগুলি অষ্টইলেকট্রন খোলকে (অষ্টক) বোঝাই এবং এজন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে মৌল আটটি।

এর পরই সবকিছু জটিলতর, গোলমেলে।

পরবর্তী পর্যায়গুলিতে মৌলসমূহের সংখ্যা হিসেব করেই দেখুন। তৃতীয়তে — ৮, চতুর্থে —১৮, পঞ্চমে —১৮, ষষ্ঠে —৩২ এবং সপ্তমে ৩২ হওয়াই সঙ্গত (যা অদ্যাবধি অসম্পূর্ণ)। কিন্তু প্রতিসঙ্গী খোলকগুলির ব্যাপার কী? এখানে সংখ্যাগুলি একদম আলাদা: ১৮, ৩২, ৫০ এবং ৭২...

কিন্তু এখন যদি আমরা বলি যে, পদার্থবিদরা সারণীটি পরীক্ষাক্রমে এর গড়নে ত্রুটি আবিষ্কারে কেন ব্যর্থ হলেন, তবে কি তা গোঁয়ার্তুমি হবে না? মনে হয়, বড় বাড়ির প্রতি তলার বাসিন্দাদের ধারাক্রমিক নির্দিষ্ট ইলেকট্রন খোলককে তুষ্ট করে এবং প্রতি তলা ক্ষার দিয়ে শুরু করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসে শেষ করলেই ভাল হত। তখন প্রতি পর্যায়ের সামর্থ্যের সঙ্গে ইলেকট্রন খোলকের সামর্থ্যের কোন পার্থক্য ঘটত না...

কিন্তু হায়! আমরা এখানে যদি এটা, যদি ওটা, ইত্যাকার শব্দাবলি ব্যবহার না করে অনন্যোপায়। আসলে হিসেব-নিকেশ এখানে ঠিক মিলল না। তৃতীয়

খোলক বা M-খোলকে যে ক'টি ইলেকট্রন আছে সে তুলনায় মেন্দেলেয়েভ সারণীর তৃতীয় পর্যায়ের বাসিন্দাদের সংখ্যা কম। ইত্যাদি, ইত্যাদি...

বেদনাকর অসংলগ্নতা। কিন্তু এতেই বিধৃত ছিল পর্যায়বৃত্তের মূল বৈশিষ্ট্যের রহস্যের সমাধান।

এবার দেখুন: তৃতীয় পর্যায়টি আর্গনে শেষ হলেও এর পরমাণুর তৃতীয় বা M-খোলকটি অসম্পূর্ণ ছিল। এটি সম্পূর্ণ হবার জন্য প্রয়োজন ১৮টি ইলেকট্রনের, কিন্তু আসলে ওখানে ছিল মাত্র ৮টি। আর্গনের পরই পটাসিয়াম। সে চতুর্থ পর্যায়ের অন্তর্গত এবং চার তলার প্রথম বাসিন্দা। কিন্তু তার শেষতম ইলেকট্রনটি তৃতীয় খোলকে না রেখে ওটি চতুর্থ N-খোলকে রাখাই পটাসিয়াম অণুর পছন্দ। এ কোন দুর্ঘটনা নয়। পদার্থবিদরা এর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সনাক্ত করেছেন। আসলে সকল পরমাণুই প্রত্যন্ত খোলকে ৮টির বেশি ইলেকট্রন ধারণে অপারগ। বহিস্থ খোলকে ৮টি ইলেকট্রনের সন্নিবেশ সুস্থিত ব্যবস্থা।

ক্যালসিয়াম পটাসিয়ামের পাশের ঘরের বাসিন্দা। এর নবতম ইলেকট্রনটির পক্ষে প্রত্যন্ত খোলকই 'বেশি সুবিধাজনক,' কারণ অন্য যেকোন ইলেকট্রন বিন্যাসের তুলনায় এই ব্যবস্থায় ক্যালসিয়াম অণুর শক্তিঘাটতি কম হয়। কিন্তু ক্যালসিয়ামের পরবর্তী স্ক্যাণ্ডিয়ামের অবস্থা ভিন্নতর। সেখানে প্রত্যন্ত খোলকে ইলেকট্রন স্থাপনের প্রবণতা অনুপস্থিত। এর নতুন ইলেকট্রনটি অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় এবং শেষ M-খোলকে 'ঝাঁপ' দিয়েছে। আর যেহেতু খোলকটিতে দশটি শূন্য স্থান রয়েছে (আমরা জানি M-খোলক সর্বোচ্চ ১৮টি ইলেকট্রন ধারণক্ষম) তাই স্ক্যাণ্ডিয়াম থেকে দস্তা অবধি পরবর্তী দশটি মৌলের অণুও ক্রমান্বয়ে তাদের M-খোলকগুলিকেই ভর্তি করে রাখে। শেষাবধি দস্তার M-খোলকের সকল ইলেকট্রনই যথাস্থানে স্থিত হয়। এর পরই আবার দেখা দেয় N-খোলকে ইলেকট্রন রাখার পালা। যখনই এর ইলেকট্রন সংখ্যা ৮-এ পৌঁছে, তখনই আমরা পাই নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্রিপ্টন। রুবিডিয়ামে আবার সেই পুরানো কাহিনীর পুনরাবৃত্তি: চতুর্থ খোলক পূর্ণ হবার আগেই পঞ্চম খোলকের আবির্ভাব।

এভাবে ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রন খোলক ভরাট করা পর্যায়বৃত্তের চতুর্থ পর্যায় থেকে শুরু করে তদূর্ধ্ব সকল বাসিন্দাদেরই 'স্বাভাবিক আচরণ'। বড় বাড়ির রাসায়নিক মৌলগুলির ক্ষেত্রে নিয়মটি অলঙ্ঘনীয়।

মূল ও আনুষঙ্গিক উপদলে যে এরা এখানে বিন্যস্ত তার কারণও তাই। যে সকল মৌলের প্রত্যন্ত ইলেকট্রন খোলক পূর্তিকারক তারাই মূল উপদলভুক্ত। আর অন্তর্বর্তী খোলকের পূর্তিকারীরা আনুষঙ্গিক উপদলের অন্তর্গত।

কিন্তু চতুর্থ N-খোলকটি এক ধাপে পূর্ণ হয় না। এটি ভরাট হতে বড় বাড়ির পুরো তিনটি তলার প্রয়োজন। এ খোলকের প্রথম ইলেকট্রনটি দেখা দেয় ১৯নং ফ্ল্যাটের বাসিন্দা পটাসিয়ামে। কিন্তু এর ৩২তম ইলেকট্রনটি থাকে কেবল লুটেসিয়ামে আর সে ষষ্ঠ পর্যায়ের সদস্য। তার পারমাণবিক সংখ্যা ৭১।

সুতরাং দেখুন, বৈষম্যটি আসলে সম্ভাবনারই ইঙ্গিত। এর হিসেব-নিকেশে আমরা আর পদার্থবিদরা পর্যায়বৃত্তের সংযুতি সম্পর্কে আরও অনেক কিছু তো জানতে পারলাম।

কেমন করে রাসায়নিকরা অপ্রত্যাশিতের মুখোমুখি হলেন

আপনারা সম্ভবত হার্বার্ট ওয়েলসের চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী *The War of the World* পড়েছেন। মঙ্গলগ্রহের আগন্তুকদের দ্বারা পৃথিবী আক্রমণ নিয়েই ঘটনাটি।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মঙ্গলগ্রহের শেষ অধিবাসীটি নিহত হবার পর পৃথিবীতে যখন শান্তি এল, তখনই সদ্যশঙ্কামুক্ত বিজ্ঞানীরা প্রতিবেশী গ্রহবাসীদের আনা জিনিসপত্রের অবশেষটুকু দ্রুত পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। সবকিছুর মধ্যে পৃথিবীর জীবন ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের কালো গুড়া সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কৌতূহলী হন।

এ নিয়ে তাঁদের অনেক পরীক্ষাই মারাত্মক বিস্ফোরণে ব্যর্থ হয়। শেষে জানা গেল দুর্ভাগা জিনিসটি নিষ্ক্রিয় আর্গন গ্যাসের যৌগ এবং এতে পৃথিবীর অজ্ঞাত কয়েকটি মৌল মিশ্রিত।

যা হোক মহান লেখক বইটির শেষ পর্যায়ে পেঁাছার সময়ই কিন্তু রাসায়নিকরা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, আর্গনের পক্ষে কোন অবস্থায়ই সমাবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল বহু বাস্তব পরীক্ষার ফলশ্রুতি।

আর্গনকে ইনার্ট (নিষ্ক্রিয়) গ্যাস বলা হয়। নিষ্ক্রিয়তার গ্রীক অর্থ 'ইনার্ট' থেকেই শব্দটির উদ্ভব। রাসায়নিক পদার্থের পুরো একটি দঙ্গল এই কুঁড়েদের দলভুক্ত আর এতে আছে আর্গন সহ হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডন।

পর্যায়বৃত্তে এরা শূন্য দলের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এই মৌলগুলির যোজ্যতা শূন্য মানের সমান। উক্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাসদের পরমাণুরা ইলেকট্রন দিতে বা নিতে সম্পূর্ণ অপারগ।

তাদের সক্রিয় করার জন্য রাসায়নিকরা কি না করেছেন! বিজ্ঞানীরা তাদের এমন তাপমাত্রায়ও তাতিয়েছেন, যেখানে সবচেয়ে দুর্গল ধাতুও টগবগ করে, তাঁরা তাদের কঠিন না হওয়া অবধি ঠান্ডা করেছেন, তাদের মধ্যে প্রচন্ড শক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেছেন এবং তাদের আক্রমণ করার জন্য সাঙ্ঘাতিক সব রাসায়নিক এজেন্ট নিয়োগ করেছেন। কিন্তু হায়, সবই বৃথা!

যেখানে অন্য যেকোন পদার্থ অনেক আগেই পোষ মেনে রাসায়নিক সমাবন্ধনে আত্মসমর্পণ করত, সেখানে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির ঠাঁই অনড় রইল। মনে হল, তারা পরীক্ষকদের বলছে, 'বৃথাই সময় নষ্ট করছ হে, কোন বিক্রিয়ায় জড়াতে আমরা বিন্দুমাত্রও ইচ্ছুক নই। আমরা এ সবের ঊর্ধ্বে!' একগুঁয়েমির জন্যই তাদের ভাগ্যে জুটল আরও একটি খেতাব: 'অভিজাত গ্যাসবর্গ'। কিন্তু খেতাবটিতে পরিহাসের আঁচ মেশানো ছিল...

পৃথিবীতে হিলিয়ামের অস্তিত্বের আবিষ্কারক রাম্‌কে সঙ্গতভাবেই গর্ব করতে পারতেন। তিনি আমাদের একটি সত্যিকার নতুন রাসায়নিক পদার্থ উপহার দিয়েছিলেন। একটি রাসায়নিক পদার্থ! হিলিয়ামকে পর্যায়বৃত্ত সারণীর অন্যান্য পদার্থের মতো আচরণ শিক্ষা দেবার জন্য অর্থাৎ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন অথবা গন্ধকের সঙ্গে মেশার জন্য স্যার উইলিয়াম রাম্‌জে বেশকিছু মূল্য দিতেও রাজী ছিলেন। এমনটি ঘটলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকরা মঞ্চ থেকে হিলিয়ামের অক্সাইড আর লবণ সম্পর্কেও কিছু বলতে পারতেন।

কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসদলের পয়লা নম্বর সভ্য এই হিলিয়াম তাঁদের নিরাশ করল। বিগত শতাব্দীর শেষপাদে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদ্বয় — রাম্‌জে ও র‍্যালে নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও জেনন আবিষ্কার করেন। শেষে পাওয়া গেল এই রাসায়নিক কুঁড়েদলের ঘনিষ্ঠ র‍্যাডনকে। এরা সকলেই স্বকীয় পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট রাসায়নিক মৌল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এদের উপসর্গ হিসেবে কেউই 'রাসায়নিক' বিশেষণটি এদের নামের সঙ্গে যোগ করে বলবে না: 'মৌল আর্গন'।

সুতরাং, বিজ্ঞানীরা মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রান্তে নতুন একটি বিভাগ খুলে এই অভিজাত গোঁয়ার গ্যাস-পরিবারটিকে সরিয়ে আনলেন আর এর নামকরণ করলেন শূন্য দল। তাঁরা রসায়নের পাঠ্যগ্রন্থে লিখলেন, 'ওখানে এমন সব রাসায়নিক মৌলের অবস্থান, যেগুলি কোন অবস্থায়ই যৌগসৃষ্টিতে সমর্থ নয়'।

ঘটনাটি বিজ্ঞানীদের পক্ষে রীতিমতো এক আঘাত বৈকি। তাঁদের ইচ্ছাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ছ-ছ'টি মৌলই রসায়নের আওতার পুরো বাইরে পড়ে রইল।

সান্ত্বনাহীন সমাধান

এমন কি শুরুতে মেন্দেলেয়েভও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। 'শেষ রক্ষা'র জন্য তিনি এমন কথাও ভেবেছিলেন যে, আর্গন মোটেই কোন নতুন মৌল নয়। তিনি বলেছিলেন যে, এটি নাইট্রোজেনের যৌগবিশেষ, এর অণু তিনটি পরমাণুর সমাহার: N^3, যেমনটি ওজোন অণু O^3 থাকে অক্সিজেন অণু O^2-এর পাশে পাশে।

কিন্তু শেষে বাস্তব তথ্যাদি ঘেঁটে মেন্দেলেয়েভ তাঁর ভুল শোধরালেন, স্বীকার করলেন র‍্যাম্‌জের অভ্রান্ততা। এখন সারা দুনিয়ার সকল পাঠ্যগ্রন্থেই এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অভিজাত গ্যাসবর্গের আবিষ্কারকরূপে স্বীকৃত এবং সকলেই আজ এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

'নারদনায়া ভলিয়া' দলের সদস্য নিকোলাই মরোজভ শ্লিসেল্‌বুগ দুর্গের নরকে বিশ বছর দুর্ভোগ সহ্য করেছিলেন। কারাদুর্গের নিরেট পাথুরে দেয়াল তাঁর মন ভাঙ্গতে পারে নি, পারে নি তাঁকে বিজ্ঞান থেকে দূরে রাখতে। শেষে সোভিয়েত আমলে তিনি হন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী। তাঁর অটল নিরীক্ষায় সই কারাদুর্গে সংশ্লেষিত হয়েছিল বহু দুঃসাহসী প্রত্যয় ও প্রকল্প। জেলখানায় তিনি পর্যায়বৃত্ত সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন শেষ করেন। অতঃপর মরোজভ এই সারণীতে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাসায়নিক মৌলের অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন।

মরোজভ যখন জেল থেকে ছাড়া পেলেন, নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ ততদিনে আবিষ্কৃত এবং মৌলের সারণীতে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত।

শোনা যায় মেন্দেলেয়েভের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে মরোজভ তাঁর সঙ্গে দেখা করলে দুই স্বদেশীর মধ্যে পর্যায়বৃত্ত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। দুর্ভাগ্য, আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

মেন্দেলেয়েভের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই অভিজাত গ্যাসবর্গের সেই নিষ্ক্রিয়তার রহস্যটি উন্মোচিত হয়। তা নিম্নরূপ।

যে যে পদার্থবিদ অতীতে বহুবার এবং পরেও রাসায়নিকদের সাহায্য করেছেন, তাঁরাই প্রমাণ করেন যে, আট ইলেকট্রনধারী খোলক অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠ। এই স্থৈর্য ইলেকট্রন খোলকের পক্ষে আদর্শস্বরূপ। সেখানে ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া অবান্তর।

আসলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসবর্গের 'আভিজাত্যের' কারণ তাদের বহিস্থ খোলকে আটটি ইলেকট্রনের অবস্থিতি। (যা হিলিয়াম পরমাণুর ক্ষেত্রে দু'টি)। হিলিয়ামের ২-ইলেকট্রন খোলকটি কিন্তু অন্যান্য কুঁড়ে রাসায়নিক মৌলদের ৮-ইলেকট্রন খোলকের চেয়ে কিছুমাত্র কম সুস্থিত নয়।
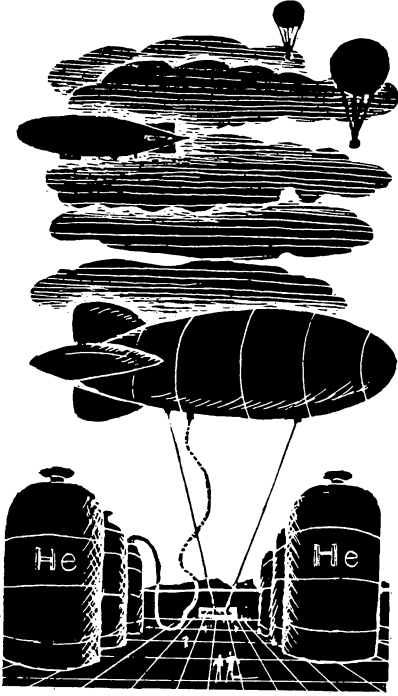
রাসায়নিকদের কাছে অতঃপর আরও একটি বিষয় স্পষ্টতর হল: পর্যায়বৃত্তের শূন্য দলের যোজনা মোটেই কোন জবরদস্তির ব্যাপার নয়; একে বাদ দিলে পর্যায়বৃত্তকে অসমাপ্ত প্রাসাদের মতোই বেঢপ দেখাত, কারণ এর প্রতি পর্যায়ই একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এর পরই পরবর্তী খোলকটিতে ইলেকট্রন ভর্তি শুরু হয়ছে আর এভাবেই গড়ে উঠেছে বড় বাড়ির প্রতিটি নতুন তলা।

তাই দেখতেই পাচ্ছেন, সবকিছুর কেমন সহজ সমাধান হল। অভিজাত পদবী সত্ত্বেও ঐ গ্যাসবর্গটি শেষে কিছুটা কাজে লাগল। হিলিয়াম বেলুন ও ডিরিজবল জেপেলিন ভরাট ও চালনায় ব্যবহৃত হল আর ডুবুরীদের কেইসন রোগের প্রকোপ থেকে রেহাই পেতে সাহায্য করল। আর্গন আর নিয়ন আলোর সজ্জায় উজ্জ্বল হল নিশীথ শহরের রাজপথ।

হতে পারে, 'তৎসত্ত্বেও পৃথিবী ঘুরছেই!'? হয়ত, এমন কিছু আছে যা আজও পদার্থবিদরা ভাবেন নি বা অংক কষে দেখেন নি কিংবা এগুলির পারস্পরিক বিক্রিয়ায় প্রলুব্ধ করার যে ক'টি উপায় রাসায়নিকের হাতে ছিল তা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি?

'মত্ত' প্রত্যয়ের সন্ধান
বা কীভাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাসবর্গের কুঁড়েমি ভাঙল

'দু'টি সমান্তরাল রেখা কখনই পরস্পরকে ছেদ করে না!' কথাটি প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠতম গাণিতিক ইউক্লিডের মুখনিসৃত এবং শুধু এজন্যই প্রত্যয়টি জ্যামিতির কাছে অভ্রান্ত।

'মোটেই তা নয়, তারা পরস্পরকে ছেদ করতে বাধ্য!' ঘোষণা করলেন রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই লবাচেভ্স্কি, গত শতকের মাঝামাঝি।

আর এভাবেই জন্ম নিল এক নতুন জ্যামিতি অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি।

'যত সব ফাঁকিবাজি আর বাজে বকবকানি!' শুরুতে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা এই বলে তাঁদের মত প্রকাশ করলেন।

অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ছাড়া আর কী-ই বা সম্ভব ছিল? তখনও আপেক্ষিকতাবাদ অথবা মহাজগতের গড়ন সম্পর্কে দুঃসাহসী প্রত্যয়াদি সকলের অজানা।

আপনারা অনেকেই আলেক্সেই তল্‌স্তয়ের 'ইঞ্জিনিয়র গারিনের পরাবৃত্ত' হয়ত পড়েছেন।

সারা দুনিয়ার সাহিত্য সমালোচকদের রায়: 'এক অনবদ্য বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী'।

'গল্পটি কিন্তু কোনদিনই সত্য হয়ে উঠবে না!' বিজ্ঞানীরা প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

কিন্তু আলেক্সেই তল্‌স্তয় মারা যাবার মাত্র পনেরো বছর পরই চুনি-কেলাসে অশ্রুতপূর্ব উজ্জ্বলতা ও শক্তিধর এক আলোকরশ্মি আবিষ্কৃত হল আর 'লেজার' শব্দটি বিশেষজ্ঞদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ্যেও ছড়িয়ে পড়ল।

...অত্যুৎসাহী রাসায়নিকরা তখনও নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির অতলান্তিক একগুঁয়েমি ভাঙার আশা ছাড়েন নি। আমরা যদি বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলির বিবর্ণ পাতা উল্টিয়ে যাই, তবে বহু কৌতুকপ্রদ নিবন্ধ ও টীকায় নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলোকে সক্রিয় কর্মকাণ্ডে লিপ্তকরণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রাসায়নিকদের দুর্মর প্রত্যাশার বিস্তর প্রমাণ খুঁজে পাব।

ঐ পাতাগুলো থেকে অদ্ভুত সূত্রাবলী আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওরা আমাদের বহু অজানা পদার্থের কথা বলে: পারদ, প্যালাডিয়াম, প্ল্যাটিনাম ও অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে সংশ্লেষিত হিলিয়ামের যৌগ। এখানে সামান্য ভুলের অবকাশ রয়েছে: কথিত রাসায়নিক যৌগগুলো প্রাপ্তিযোগ্য পদার্থ নয়। ওদের মধ্যে হিলিয়ামের দুই ইলেকট্রন খোলকটি পুরোপুরি অটুট আর যৌগগুলি আস্ত থাকে এবং তা অতি নিম্ন তাপমাত্রায়, শূন্য ডিগ্রির দেশে।

রাসায়নিক সাময়িকীগুলোর পাতায় আমরা আরও একটু সংবাদও পাব। সোভিয়েত রাসায়নিক নিকিতিন অপেক্ষাকৃত স্বল্প বিস্ময়কর দু'টি যৌগ তৈরি করেছিলেন। ওগুলো জেনন ও র‍্যাডনের সঙ্গে জল, কার্বলিক অ্যাসিড ও আরও কয়েকটি জৈব দ্রবণের যৌগ: $Xe \cdot 6\,H_2O$ এবং $Rn \cdot 6\,H_2O$। এরা সাধারণ অবস্থায়ও সুস্থিত থাকে, সহজে পাওয়াও যায়, কিন্তু...

কিন্তু আগের মতো এখানেও যৌগগুলির ক্ষেত্রে রাসায়নিক বন্ধের কোন ব্যাপারই ছিল না। জেনন ও র‍্যাডন পরমাণু প্রত্যন্ত খোলকের নিটোল সম্পূর্ণতার বদৌলতে দিব্যি টিকে রইল: যে ৮টি ইলেকট্রন শুরুতে ছিল সে আটটি শেষেও থাকল।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসবর্গ আবিষ্কারের পর অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেল, কিন্তু 'ঠেলাগাড়ি একটুও নড়ল না'।

...বিংশ শতাব্দী, মানব ইতিহাসের সর্বাধিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ও অবিস্মরণীয় এই শতাব্দীটির অন্তিম পর্যায় আজ আসন্ন। বিজ্ঞানীরা বিগত শতবর্ষের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের হিসেব-নিকেশ হয়ত শুরু করবেন। উল্লেখ্য আবিষ্কারসমূহের সেই দীর্ঘ তালিকার এক বিশিষ্ট স্থানে থাকবে 'নিষ্ক্রিয় গ্যাসের রাসায়নিক যৌগ উৎপাদন'। আর অত্যুৎসাহী ভাষ্যকাররা এতে যোগ করবেন: সর্বাধিক রোমাঞ্চকর আবিষ্কারের অন্যতম।

রোমাঞ্চকর? দৈবাৎ! বড়জোর কোন রোমান্টিক কাহিনী। অথবা বহু বছর যাবৎ যে দুরূহ সমস্যায় বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন তার আকস্মিক সহজ সমাধান...

আমাদের কালের রসায়ন যেন এক মহীরুহ, যার বিশাল শীর্ষে শাখাপ্রশাখার বাড়বাড়ন্ত অশেষ। এর কোন একটি শাখা একক প্রচেষ্টায় পুরোপুরি আয়ত্ত করা এখন দুঃসাধ্য। একটি প্রশাখান্ত, একটি কুঁড়ি কিংবা অদৃশ্যপ্রায় কোন মুকুলের সঙ্গে

যথাযথভাবে পরিচিত হতেই একজন গবেষকের আজ বহু বছর কেটে যাবে। এমন হাজার হাজার গবেষণার ফলেই এখন গড়ে ওঠে এর পুরো একটি শাখা।

কানাডার রাসায়নিক নিল বার্টলেট এমনি একটি 'কুঁড়ি' নিয়েই কাজ করেছিলেন। রাসায়নিক পরিভাষায় তাঁর উপকরণটির নাম প্ল্যাটিনাম হেক্সাফ্লোরিড এবং এর সংকেত: PtF_6। নেহাৎ আপতিক কোন ঘটনাচক্রে এজন্য তিনি তাঁর সময় ও শক্তি ব্যয় করেন নি। ভারি ধাতুলগ্ন ফ্লোরিন-যৌগ অত্যাকর্ষী উপকরণ, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিউক্লীয় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ইউরেনিয়াম আইসোটোপ — ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও ইউরেনিয়াম-২৩৮ পৃথকীকরণে এগুলি ব্যবহৃত। আইসোটোপের একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরিড UF_6-এর সাহায্যে তা সম্ভবপর। তা ছাড়া, ভারি ধাতুলগ্ন ফ্লোরিন রাসায়নিক পদার্থ হিসেবেও অত্যন্ত সক্রিয়।

বার্টলেট PtF_6 ও অক্সিজেনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক আশ্চর্য যৌগ পেলেন। সেখানে অক্সিজেন আটকা পড়ল ধনাত্মক আধানধর অণু O_2 হিসেবে। আসলে অণুটি একটি ইলেকট্রন হারিয়েছিল। কিন্তু এতে অবাক হবার কী আছে? ঘটনাটির মূল বৈশিষ্ট্য অক্সিজেন অণুর ইলেকট্রনচ্যুতি, কারণ কাজটি দুঃসাধ্যপ্রায় আর এতে প্রয়োজন অঢেল শক্তি খরচার। দেখা গেল, প্ল্যাটিনাম হেক্সাফ্লোরিড সেই অঘটনঘটন-পটিয়সী, যে অক্সিজেনের একটি ইলেকট্রন খসাতে সমর্থ।

বস্তুত, নিষ্ক্রিয় গ্যাসবর্গের পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলক থেকে একটি ইলেকট্রন অপসারণেও প্রচুর শক্তিব্যয় অপরিহার্য। এখানেও একটি শৃঙ্খলা আছে: নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি যত ভারি, ব্যয়িত শক্তির পরিমাণও তত কম। দেখা গেল, অক্সিজেন অণুর একটি ইলেকট্রন খসানোর চেয়ে জেনন অণুর একটি ইলেকট্রন সরানো সহজতর।

তা যদি হয়... এখানেই সবচেয়ে আকর্ষীর শুরু! হেক্সাফ্লোরিন প্ল্যাটিনামকে জেননের ইলেকট্রন অপহরণকারীর ভূমিকা নিতে বাধ্য করাতে বার্টলেট ঠিক করলেন এবং তিনি সফল হলেন। ১৯৬২ সালে পৃথিবীতে প্রথম জন্ম নিল নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যৌগ। যৌগটি অনেকটা এই রকম: $XePtF_6$। আর সে যথেষ্ট সুস্থিত। হিলিয়ামের প্ল্যাটিনাম বা পারদ লগ্ন কোন উদ্ভট যৌগের মতো মোটেই নয়।

অদৃশ্যপ্রায় এই শস্যকণাটি অচিরেই অঙ্কুরিত হল। অঙ্কুরটি বাঁশের মতো দ্রুত গজিয়ে উঠল, জন্ম নিল এক নতুন রসায়নশাখা: নিষ্ক্রিয় গ্যাসের রসায়ন। সেদিনও অনেক বিজ্ঞানী বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত সংশয়ী ছিলেন। আজ তাঁদের হাতে আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের প্রায় ৫০টি সত্যিকার রাসায়নিক যৌগ, প্রধানত জেনন, ক্রিপ্টন ও র‍্যাডনের ফ্লোরাইড ও অক্সাইড।

সুতরাং, অভিজাত গ্যাসবর্গের প্রত্যন্ত ইলেকট্রন খোলকের অভেদ্যতা অবশেষে বিধ্বস্ত হল!

কিন্তু নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির যৌগসমূহের আণবিক সংযুতি? বিজ্ঞানীরা সর্বোমাত্র সাফল্যের সঙ্গে তা বুঝতে করেছেন। জানা গেছে, পরমাণু যে যোজ্যতাশক্তি সরবরাহে সমর্থ, তার পরিমাণ সম্পর্কে আমাদের পূর্বজ্ঞান ভ্রান্ত ছিল; তাদের এ ক্ষমতা আরও অনেক বেশি।

আগে যোজ্যতা প্রত্যয়ের ভিত্তি ৮-ইলেকট্রন খোলকের বিশেষ সুস্থিতি ও অব্যর্থতার স্বীকৃতিতে নিহিত ছিল। এখন বিজ্ঞানীরা উক্ত তত্ত্বাবলীর যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সম্ভবত, তা আপনাদের ভাগ্যের অনুকূল হবে, সহায়ক হবে স্বকীয় নতুন নিয়মাবলীর উন্মোচনে...

অন্যতর অসঙ্গতি? একে নিয়ে কী করা উচিত?

...আরও শোনা যায় একদা জনৈক চিন্তামগ্ন ব্যক্তি বোঝাই ফোল্ডার নিয়ে এক গবেষণা ইনস্টিটিউটে এলেন। বিজ্ঞানীদের সামনে তাঁর কাগজপত্র ছড়িয়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কণ্ঠে ঘোষণা করলেন:

'মেন্দেলেয়েভ সারণীতে মাত্র সাত দল মৌলই থাকা উচিত, এর বেশিও নয় কমও নয়!'

'কীভাবে?' বিষয়াভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

'খুবই সোজা। "সাত" সংখ্যাটি নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক! রামধনু সপ্তবর্ণ, সঙ্গীত সপ্তসুরে বাঁধা...'

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, আগত ব্যক্তিটি যথেষ্ট সুস্থ মস্তিষ্ক নয়। মেন্দেলেয়েভ সারণীকে তামাশায় পর্যবসিত করার এই শেষতম প্রচেষ্টাকে তাঁরা নস্যাৎ করার চেষ্টা করলেন।

'ভুলবেন না, মানুষের মাথায়ও সাতটি গর্ত আছে!' তাঁদের একজন হেসে বললেন।

'আর প্রজ্ঞাস্তম্ভও সাতটি,' অন্যজন যোগ করলেন।

...ঘটনাটি কোন কল্পকাহিনী নয়। সত্যিই তা মস্কোর এক ইনস্টিটিউটে ঘটেছিল।

পর্যায়বৃত্ত সারণীর ইতিহাসে এমন ঘটনার সংখ্যা বহু। একে ঢেলে সাজানোর কত চেষ্টাই না করা হয়েছে। সীমিতসংখ্যক যুক্তিসঙ্গত চেষ্টা ব্যতিরেকে এদের অধিকাংশই ছিল আত্মপ্রচার মাত্র।

১৯৬৯ সালে মেন্দেলেয়েভের বিশিষ্ট আবিষ্কারের শতবর্ষ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে। আর এই মহান দিনটির প্রাক্‌কালেও বহু নিবিষ্ট রাসায়নিকও পর্যায়বৃত্ত সারণীর কিছু রদবদলের কথা না ভেবে পারেন নি।

এমন এক সময় ছিল যখন বিজ্ঞানীরা শূন্য দলের মৌলকে রাসায়নিক বলতে সাহস পেতেন না। ইদানিং অবস্থা ভিন্নতর। শূন্য দলের মৌলগুলিকে এখন নিষ্ক্রিয় বলা অসুবিধাজনক। প্রতি মাসেই রাসায়নিক সাময়িকীতে নিষ্ক্রি... মাপ করবেন, শূন্য দলের মৌলসমূহের রসায়ন সম্পর্কে বহু প্রবন্ধ হামেশাই প্রকাশিত হচ্ছে। ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডনের রাসায়নিক যৌগসংশ্লেষ সম্পর্কে ক্রমাগত খবর আসছে নানা দেশ থেকে। দ্বি-, চতুঃ- ও ষড়যোজী জেনন, চতুর্যোজী ক্রিপ্টন প্রভৃতি শব্দাবলী এক দশক আগেও কল্পিত শোনাত, অথচ আজ এগুলি বহুল উচ্চারিত।

এক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আর্তনাদ করে বললেন: 'মেন্দেলেয়েভ সারণীর উপর এখন জেনন ফ্লোরাইডের দুঃস্বপ্ন ঝুলছে!'

তিনি অবশ্য ঘটনাটিকে একটু অতিরঞ্জিত করেছেন। তবু অচিরেই 'দুঃস্বপ্ন'মুক্তি প্রয়োজন। কিন্তু কীভাবে?

সমস্যাটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সুপারিশ এরূপ: শূন্যদল প্রত্যয়টিকে বিজ্ঞানের ইতিহাসের মহাফেজখানার সিন্দুকে পুরে, প্রত্যন্ত খোলকের আটটি ইলেকট্রন বিধায় তথাকথিত নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলিকে অষ্টম দলেই রাখা হোক...

কিন্তু একটু দাঁড়ান না! মেন্দেলেয়েভ তাঁর সারণীর মধ্যে ইতিপূর্বেই একটি অষ্টম দলকে 'বসিয়ে রেখেছেন'। দলটিতে মৌলের সংখ্যা ন'টি: লৌহ, কোবাল্ট, নিকেল, রুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম, অস্‌মিয়াম, ইরিডিয়াম ও প্ল্যাটিনাম।

তাহলে এখন?

অর্থাৎ রাসায়নিকরা এবার আরও একটি অসঙ্গতির মুখোমুখি। পর্যায়বৃত্ত সারণীর পরিচিত চেহারাটি এখন বদলানো প্রয়োজন এবং তা অচিরেই।

'পথে বাধা থাকবেই' — এটি প্রবাদবাক্য। 'পুরানো' অষ্টম দলের অভ্যস্ত চেহারার পরিবর্তন সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধ কী? এখন বর-গ্যাস ও উপরোক্ত ন'টি ধাতুকে একই অষ্টম দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একে রাখা যায় কোথায়?

সেই 'সর্বভুক্'

ওকে এই বিশেষণে ভূষিত করেছেন বিশিষ্ট সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলেক্সান্দর ফের্সমান। এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রটি পৃথিবীর জ্ঞাত সকল মৌলের মধ্যে ভয়ঙ্করতম, প্রকৃতি এর চেয়ে সক্রিয়তর আর কোন রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করে নি। আপনি কখনই একে প্রকৃতির রাজ্যে সক্রিয় অবস্থায় খুঁজে পাবেন না। সে থাকে কেবলই যৌগবন্দী হয়ে।

এর ইংরেজি নাম ফ্লোরিন, উৎপত্তি লেটিন শব্দ 'fluo' থেকে। এর অর্থ 'বহমান'। কিন্তু এর রুশ নাম 'ফ্তোর' গ্রীক শব্দজাত, অর্থ, 'বিধ্বংসী'। মেন্দেলেয়েভ সারণীর সপ্তম দলের সদস্যটির এই দ্বিতীয় নামেও তার মূল চারিত্র্য সুপরিস্ফুট।

বলা হয়, 'ফ্লোরিনের পথ মানবিক ট্র্যাজেডিকীর্ণ'। কথাগুলো শব্দমাত্র নয়। এখন ১০৬ টি মৌলের নাম মানুষের জানা! নতুন, নতুন মৌলের সন্ধানে গবেষকরা বহুবিধ জটিলতা অতিক্রম করেছেন, অনেক ব্যর্থতার তিক্তস্বাদ পেয়েছেন এবং অদ্ভুত সব ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছেন। অজ্ঞাত মৌলের চিহ্নসন্ধানে বিজ্ঞানীরা প্রভূত শ্রমস্বীকার করেছেন।

ফ্লোরিন, মুক্ত মৌল ফ্লোরিন জীবনবলি গ্রহণ করেছে।

মুক্ত ফ্লোরিন সংগ্রহের চেষ্টায় যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তার শোকাকীর্ণ তালিকাটি যথেষ্ট দীর্ঘ। আইরিশ বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য নোক্স, ফরাসী রাসায়নিক নিক্লেস, বেলজিয়ামের গবেষক লায়েট — এই 'সর্বভুকের' কবলে প্রাণ হারান। আর কত জনই না মারাত্মকভাবে আহত হন। এঁদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক গাই-লুসাক ও তেনার এবং ব্রিটিশ রাসায়নিক হ্যামফ্রে ডেভি সহ বহু বিজ্ঞানী। তাকে নিজ যৌগ থেকে পৃথকীকরণের দুর্বিনীত চেষ্টার জন্য বহু অজ্ঞাত গবেষকের উপরও সে অবশ্যই প্রতিশোধ নিয়েছিল। ১৮৮৬ সালের ২৬শে জুন আঁরি ময়াসাঁ যখন প্যারিস বিজ্ঞান আকাদেমিতে মুক্ত ফ্লোরিন সংগ্রহে নিজ সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন তাঁর একটি চোখে তখন কালো ব্যাণ্ডেজ ছিল।

ফরাসী বিজ্ঞানী ময়াসাঁই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুক্ত ফ্লোরিন পদার্থটি কেমন তা প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। বহু বিজ্ঞানীই যে একে নিয়ে কাজ করতে শঙ্কিত ছিলেন তা অনস্বীকার্য।

বিশশতকী বিজ্ঞানীরা ফ্লোরিনের রোষ প্রশমন ও মানুষের সেবায় তা ব্যবহারের পথসন্ধানে সচেষ্ট না। উক্ত সকল মৌলের রসায়ন এখন অজৈব রসায়নের এক বৃহদায়তন, স্বাধীন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত।
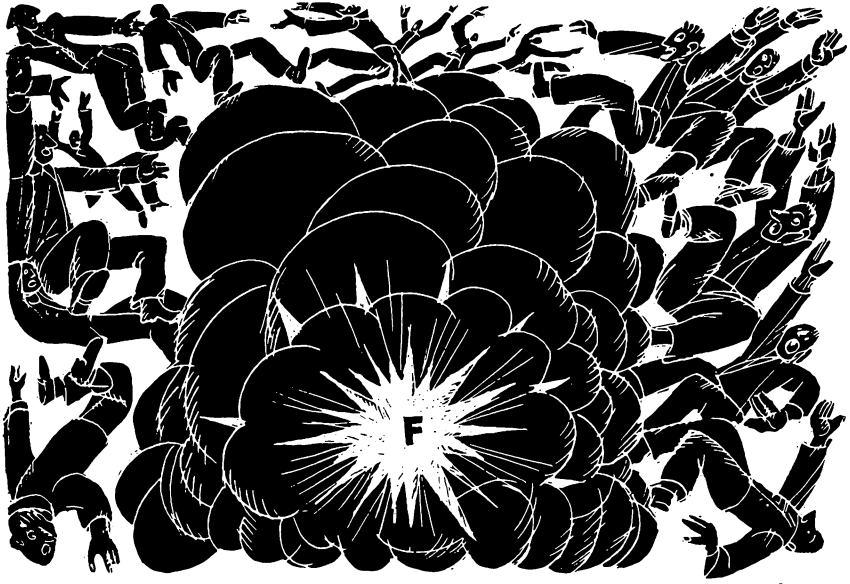
বোতলবন্দী সেই ভয়ংকর 'দানবটি' এখন বশীভূত। মুক্ত ফ্লোরিনের জন্য অসংখ্য বিজ্ঞানীর নিরন্তর চেষ্টা আজ শতগুণ ফলবতী।

বহু ধরনের আধুনিক রিফ্রিজারেটরেই হিমায়ক উপকরণ হিসেবে ফ্রিওন ব্যবহৃত। রাসায়নিকরা একে অন্যতর জটিল নামে ডাকেন: ডাইফ্লোরোডাইক্লোরোমিথেইন। ফ্লোরিন যৌগটির অপরিহার্য উপাদান।

নিজে 'বিধ্বংসী' হলেও ফ্লোরিন যৌগ বস্তুত অবিধ্বংসী। এগুলি পোড়ে না, পচে না, ক্ষার কিংবা অম্লেও গলে না; মুক্ত ফ্লোরিনে এরা অনাক্রম্য এবং আকস্মিক তাপমাত্রার পরিবর্তন তথা মেরুদেশীয় শৈত্যনিরপেক্ষ। অনেক ক্ষার তরল, অন্যগুলি কঠিন। ফ্লোরোকার্বন নামেই এরা পরিচিত। প্রকৃতি এদের আবিষ্কার করতে পারে নি। এরা মানুষের তৈরি। কার্বন আর ফ্লোরিনের সমাবন্ধনে অনেক সুফল ফলেছে। মোটরের হিমায়ক দ্রবণ, বিশেষ উদ্দেশ্যে নানা ধরনের কাপড় ভেজানোর দ্রবণ, অতি দীর্ঘস্থায়ী লুব্রিকেণ্ট, অন্তরক এবং রসায়ন শিল্পের বিবিধ সাজসরঞ্জামের কাঠামোতে ফ্লোরোকার্বন ব্যবহৃত।

পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের উপায় সন্ধানে ইউরেনিয়াম-২৩৫ ও ইউরেনিয়াম-২৩৮ এই আইসোটোপদ্বয় পৃথকীকরণ অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা অত্যাকর্ষী যৌগ — ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লোরাইডের সাহায্যে এই জটিলতম কাজটি সম্পূর্ণ করেন।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসবর্গের রাসায়নিক কুঁড়েমি সম্পর্কিত বহুদশকী প্রত্যয়টি রাসায়নিকরা ফ্লোরিনের সাহায্যেই শেষে ভাঙলেন। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির অন্যতম জেননের সঙ্গে ফ্লোরিনের সমাবন্ধনেই তৈরি হল এই শ্রেণীর প্রথম যৌগ।

এই গেল ফ্লোরিনের কার্যবিবরণী।

হেনিং ব্রাণ্ডটের 'পরশ পাথর'

মধ্যযুগের কোন এক পর্বে জার্মানির হামবুর্গ শহরে হেনিং ব্রাণ্ডট নামে একজন বণিক বাস করত। ব্যবসাক্ষেত্রে তার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আমরা অবশ্য কিছুই জ্ঞাত নই, রসায়নে তার দখল সম্পর্কেও আমাদের কমই জানা আছে।

তাই বলে সে রাতারাতি বড়লোক হবার লোভ সম্বরণ করতে পারে নি। কাজটি ছিল খুবই সোজা — শুধু সর্ববিদিত সেই 'পরশ পাথরটি' জোগাড় করা, কিমিয়াবিদদের মতে তা দিয়ে খোয়া পাথরকেও সোনা করা যায়।

...বছরের পর বছর গেল। ক্ষীণ হয়ে এল ব্রাণ্ডটের স্মৃতি। বণিকদের কোন আলোচনায় দৈবাৎ তার নাম উচ্চারিত হলে দুঃখের সঙ্গে তারা মাথা নাড়াত। ইতিমধ্যে হাজারো রকমের খনিজ ও মিশ্রদ্রব্য গলিয়ে, মিশিয়ে, ছেঁকে, তাতিয়ে তার হাত দু'টি অ্যাসিড আর ক্ষারের দুরারোগ্য দাগে দাগে ভরে উঠেছে।

এক শুভ সন্ধ্যায় বণিকের ভাগ্য হঠাৎ প্রসন্ন হল। তার বকযন্ত্রের তলায় তুষারসাদা একটি বস্তু জমে উঠল। ওটি দ্রুতদাহ্য এবং এর ঘন ধোঁয়া শ্বাসরোধী। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল অন্ধকারে এর উজ্জ্বলতা। এই শীতল আলোয় ব্রাণ্ডট অক্লেশে তার কিমিয়াবিদ্যার নিবন্ধাবলী পড়তে পারত (ততদিনে এগুলি তার ব্যবসা সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও রসিদের স্থলবর্তী হয়েছে)।

...এভাবে নেহাৎ ঘটনাক্রমে আবিষ্কৃত হল ফসফরাস। নামটি গ্রীক শব্দজাত, অর্থ 'আলোর ধারী' বা 'আলোবাহী'।

বহু ভাস্বর যৌগেরই প্রধান উপাদান ফসফরাস। আপনাদের কি সেই বিখ্যাত বাস্কারভিল কুকুরটির কথা মনে আছে শার্লক হোম্‌স যার সামনে অনেক দিন পড়েছিলেন। ওর মুখে ফসফরাস মাখা ছিল।

পর্যায়বৃত্ত সারণীর অন্য কোন প্রতিনিধিই আর এমন অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়।

ফসফরাসের মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ ধর্মের সংখ্যা বহু।

বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক মলেশট একদা বলেছিলেন: 'ফসফরাস ছাড়া মনন অসম্ভব।' কথাটি সত্যি। আমাদের গুরুমস্তিষ্কের কোষকলা বহু জটিল ফসফরাস যৌগে বোঝাই।

আর ফসফরাস ছাড়া প্রাণের অস্তিত্বই তো অসম্ভব। একে বাদ দিলে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া অচল হয়ে পড়বে, পেশীতে কোন শক্তিই জমা থাকবে না। আর শেষে বলা উচিত, ফসফরাস যেকোন জীবেরই দেহসংস্থার অন্যতম জরুরী 'ইষ্টক'স্বরূপ। বস্তুত, অস্থিকলার মূল উপকরণ ক্যালসিয়াম ফসফেট।

তাহলে দেখুন, এ কি 'পরশ পাথরের' চেয়ে কিছু কম হল? এতে জড় পদার্থে জীবন সঞ্চারিত হয়।

কিন্তু ফসফরাস ভাস্বর কেন?

সাদা ফসফরাসের উপর সব সময়ই ফসফরাস বাষ্পের মেঘ জমে থাকে। বাষ্পটি জারিত হয় ও প্রভূত শক্তি উৎকীর্ণ করে। এই শক্তিই ফসফরাস পরমাণুকে উত্তেজিত করে আর তাই আলোর ঝলকানি।

সজীবতার স্বাদুগন্ধ বা পরিমাণের গুণে রূপান্তরণের কথা

ঝড়ঝঞ্ঝা ও বজ্রপাতের পরপর শ্বাস নওয়া সহজতর হয়। বাতাস তখন পরিচ্ছন্ন, তরতাজা।

এ কোন কবিতা নয়। বজ্রপাতে বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস তৈরি হয় আর সেজন্যই বাতাসে আসে স্বস্থ সজীবতা।

ওজোন আসলে অক্সিজেন। পার্থক্য, অক্সিজেন অণুতে পরমাণু সংখ্যা দুই আর ওজোনে তিন। O_2 আর O_3 — অক্সিজেনের একটি পরমাণু কমবেশিতে খুব কিছু আসে যায় কি?

অবশ্যই, অনেক কিছুই আসে-যায় বৈকি। ওজোন আর অক্সিজেন সম্পূর্ণ আলাদা পদার্থ।

অক্সিজেন ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব অসম্ভব। আর পক্ষান্তরে ওজোনের অতিরিক্ত ঘনত্ব জীবান্তক, এতে সকল প্রাণের বিনাশ অবধারিত। ফ্লোরিনের পর ওজোনই জারক হিসেবে সেরা শক্তিশালী। জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশ্রণমাত্রই ওজোন তার বিনষ্টি ঘটায়। এর আক্রমণে একমাত্র সোনা ও প্ল্যাটিনাম ছাড়া আর সকল ধাতুরই দ্রুত নিজ অক্সাইডে রূপান্তরণ অবশ্যম্ভাবী।

সে দুমুখো! সকল জীবিতের ঘাতক হয়েও ওজোন পৃথিবীর জীবমণ্ডলকে নানাভাবে সাহায্য করে।

এই বৈপরিত্যের ব্যাখ্যা সহজ। সৌরবিকিরণ বহুবিধ রশ্মির সমাহার এবং অতিবেগুনী রশ্মি এগুলির অন্তর্গত। এই রশ্মির সবটুকু পৃথিবীতে পেঁছলে প্রাণের অস্তিত্ব অবশ্যই বিপর্যস্ত হত। কারণ, প্রবল শক্তিধর এই রশ্মি সকল জীবিতের পক্ষেই মারাত্মক।

সৌভাগ্যবশত, সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই শুধু পৃথিবীতে পেঁছয়। আবহমণ্ডলের ২০-৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় তার অধিকাংশই নিজ শক্তি খুইয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। যে বায়ুস্তরের কম্বলে আমাদের পৃথিবীটি ঢাকা, উপরোক্ত উচ্চতায় সেখানে ওজোনেরই আধিক্য। আর এগুলিই অতিবেগুনী রশ্মির শোষক। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত অন্যতম আধুনিক তত্ত্বানুসারে আবহমণ্ডলে ওজোন স্তর গঠন আর পৃথিবীতে প্রথম জীবের জন্ম সন্নিপাতী ঘটনা।)

কিন্তু মাটির কাছাকাছি ওজোনও মানুষের প্রয়োজন এবং প্রচুর পরিমাণে।

তাদের, এবং মুখ্যত রাসায়নিকদের, ওজোনের প্রয়োজন হাজার হাজার টন এবং তা খুবই জরুরী। ওজোনের বিস্ময়কর জারণক্ষমতা রসায়ন শিল্পে সানন্দে ব্যবহার্য।

তৈলশিল্প কর্মীরাও খুশি মনেই ওজোনকে সাধুবাদ দেবে। অনেক খনির তেলেই গন্ধক থাকে। এর নাম গন্ধকী তেল এবং তা বেজায় গোলমেলে। এই তেলে যন্ত্রপাতি দ্রুত ক্ষয় হয়, যেমন বিদ্যুৎকেন্দ্রের বয়লার। ওজোনের সাহায্যে সহজেই এই তেলের গন্ধকমুক্তি ঘটে এবং এতে পাওয়া গন্ধক থেকে সালফিউরিক অ্যাসিডের উৎপাদন দ্বিগুণ এমন কি তিনগুণ বাড়ানোও যায়।

আমরা ক্লোরিনপৃক্ত জল পান করি। নির্দোষ হলেও এর স্বাদ ঝর্ণাজলের মতো নয়। ওজোনযুক্ত পানীয় জল সম্পূর্ণ বীজাণুমুক্ত ও সুস্বাদ।

ওজোনের সাহায্যে গাড়ির পুরানো টায়ার নবায়ন ও কাপড়, সেলুলোজ ও সুতো বিরঞ্জন সহজ। আর তাই বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা উচ্চ উৎপাদশীল ওজোন তৈরির কারখানা নির্মাণে সচেষ্ট।

এই তো গেল ওজোনের পরিচিতি। O_3 কোন অংশেই O_2 চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পরিমাণ থেকে গুণগত পরিবর্তনের দ্বান্দ্বিক রীতি বহুকাল আগেই দর্শনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অক্সিজেন ও ওজোনের দৃষ্টান্ত রসায়নে প্রযুক্ত দ্বান্দ্বিক রীতির অন্যতম উজ্জ্বল অভিব্যক্তি।

বিজ্ঞানীরা অক্সিজেনের আরও একটি অণু সম্পর্কে অবহিত। এর পরমাণু সংখ্যা ৪ — O_4। অবশ্য, এই 'চতুষ্টয়' নিতান্তই অস্থায়ী এবং তার ধর্মাদিও অজ্ঞাতপ্রায়।

সরল থেকে সরলতর, বিস্ময়ের চেয়ে বিস্ময়কর

জলের অন্য নাম জীবন। H_2O: হাইড্রোজেনের দুই পরমাণু ও অক্সিজেনের একটি। সম্ভবত, আমাদের শেখা প্রথমতম রাসায়নিক সংকেতগুলোর অন্যতম। হঠাৎ পৃথিবী থেকে জল উধাও হলে কী ঘটবে তাই কল্পনা করা যাক।

...জলত্যক্ত লবণে বোঝাই, হাঁ-মুখ, বিদঘুটে সব সাগরমহাসাগরের বিশাল বিশাল 'গর্ত'। শুকনো নদীখাত, চির নিঝুম ঝর্ণারাজি। পাথরও সব চুরমার, বালুতে বিলীন: জলই ছিল তাদের অস্তিত্বের আধার। নেই ঝোপঝাড়, নেই ফুলফল। মৃত, প্রাণহীন পৃথিবী, অসাড়, কোথাও একটি জীবিতের সন্ধান নেই। উপরে নির্মেঘ আকাশে অদ্ভুত রঙ, অচেনা, ভয়ঙ্কর।

কী সরল যৌগ! অথচ এর অভাবেই বুদ্ধিমান, নির্বুদ্ধি সকল জীবনই অচল।

এমনটি কেন হয়, তাই দেখা যাক!

প্রথমত, পৃথিবীর যাবতীয় যৌগরাশির মধ্যে জল এক অতুল্য উপকরণ।

সেল্‌সিয়াস তাপমান যন্ত্র আবিষ্কার করে পদ্ধতিটির ভিত্তিস্বরূপ দু'টি মান বা ধ্রুবক গ্রহণ করেন: জলের স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক। পূর্বতনকে ১০০ ডিগ্রি ও পরবর্তীকে ০ ডিগ্রির সমান হিসেবে গণ্য করে তিনি মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ১০০ ভাগে ভাগ করলেন। জন্ম নিল তাপমাত্রা পরিমাপের প্রথম যন্ত্র।

কিন্তু সেল্‌সিয়াস যদি জানতেন যে, আসলে জল ০ ডিগ্রিতে জমেও না আর ১০০ ডিগ্রিতে ফোটেও না, তা হলে?

এখন বিজ্ঞানীরা জানেন, জল এব্যাপারে পয়লা নম্বর প্রবঞ্চক। জল পৃথিবীর সর্বাধিক ব্যতিক্রমী যৌগ।

বিজ্ঞানীদের দাবী: আসলে জলের ফোটা উচিত ১৮০ ডিগ্রি কম তাপমাত্রায় অর্থাৎ শূন্যের নিচে ৮০ ডিগ্রিতে। যা হোক, পর্যায়বৃত্তের নিয়ম অনুসারে এই মেরুদেশী তাপমাত্রাতেই তার ফোটার কথা।

পর্যায়বৃত্ত সারণীর যেকোন দলভুক্ত মৌলসমূহ ভরানুসারে প্রায় নিয়মিতভাবেই হালকা থেকে ভারি পর্যায়ে ক্রমবিন্যস্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ্য। যৌগসমূহের ধর্ম যদৃচ্ছা বিক্ষিপ্ত নয়, মেন্দেলেয়েভ সারণীতে এদের অণুর

অন্তর্গত মৌলসমূহের অবস্থানের উপর তা নির্ভরশীল। হাইড্রোজেন যৌগ সম্পর্কে, একই দলের হাইড্রাইডভুক্ত মৌল সম্পর্কে নিয়মটি সবিশেষ প্রযোজ্য।

জলকে অক্সিজেন হাইড্রাইড বলা যায়। অক্সিজেন ষষ্ঠ দলের অন্তগর্ত এবং গন্ধক, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম আর পোলোনিয়ামও এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সকল মৌলের হাইড্রাইডগুলির আণবিক কাঠামো জলাণুরই অনুরূপ: H_2S, H_2Se, H_2Te এবং H_2PO। এদের স্ফুটনাঙ্ক গন্ধক থেকে তার ভারি ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে নির্দিষ্টভাবে ক্রমবিন্যস্ত। কিন্তু জলের স্ফুটনাঙ্ক এ ধারার এক অভাবিত ব্যতিক্রম — প্রত্যাশিত মাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি। পর্যায়বৃত্ত সারণীর নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণে জল গররাজী এবং, বলতে কি, হিমাঙ্কের ৮০ ডিগ্রি নিচে বাষ্পীভূত না হয়ে গোঁ ধরে রইল। এটি জলের বিস্ময়াবহ ব্যতিক্রমী সব ধর্মের প্রথমটিই মাত্র।

এর দ্বিতীয় লক্ষণীয় ব্যতিক্রম জলের হিমাঙ্ক। পর্যায়বৃত্তের নিয়ম অনুযায়ী শূন্যের নীচে ১০০ ডিগ্রিতে তার জমাট বাঁধার কথা। কিন্তু সে অবশ্যপালনীয় শর্তটি অস্বীকার করে শূন্য ডিগ্রিতেই বরফ হয়ে যায়।

জলের এই একগুঁয়েমি পৃথিবীতে তার তরল ও কঠিন অবস্থার অস্বাভাবিক-তাকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করে। নিয়মানুসারে এখানে জলের অস্তিত্ব একমাত্র বাষ্পীয় অবয়বেই সম্ভবপর ছিল। এখন এমন এক পৃথিবী কল্পনা করুন যেখানে জলের ধর্ম পর্যায়বৃত্তের কঠোর নিয়মের অনুসারী। কল্পকাহিনীর লেখকদের জন্য এমন একটি অনন্য চিত্র রোমাঞ্চকর উপন্যাস আর গল্পের চমৎকার উপকরণ বৈকি। কিন্তু আমাদের জন্য, বিজ্ঞানীদের জন্য অবস্থাটি অন্যরূপ। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পর্যায়বৃত্ত সারণীকে প্রথম দৃষ্টিতে যা-ই মনে হোক, আসলে তা অনেক বেশি জটিল এবং এর বাসিন্দারাও বহুলাংশে জীবিত মানুষের মতোই কাঠামোবন্দী হবার পাত্র নয়। জল এক খেয়ালি চারিত্র্য...

কিন্তু কেন?

কারণ, জলের অণুর একটি বিশিষ্ট বিন্যাস আছে এবং সেজন্যই পরস্পরকে প্রকটভাবে আকর্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতারই তা অধিকারী। তাই জলের একক অণুকে গেলাসে খোঁজা বৃথা। তার অণুগুলি দলবদ্ধ থাকে, যাকে বিজ্ঞানীরা পরিমেল বলেন। তাই জলের সংকেত লিখনের শুদ্ধতর পদ্ধতি $(H_2O)n$, এখানে n পরিমেলে জলের অণুসংখ্যার প্রতীক।

জলীয় অণুগুলির পরিমেলবন্দী হবার এই আর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলা কঠিন। তাই প্রত্যাশিত তাপমাত্রা অপেক্ষা অনেক বেশি তাপে জল জমে এবং বাষ্পীভূত হয়।

‘শান্ত, নদীটি এখনও জমে নি, দেখো...’

১৯১৩ সালে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার সংবাদ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশালাকার যাত্রীবাহী জাহাজ ‘টাইটেনিক’ হিমশৈলের আঘাতে জলমগ্ন হয়। বিশেষজ্ঞরা দুর্ঘটনার সম্ভাব্য বহু কারণ দেখান। বলা হয়, কুয়াসার জন্য ক্যাপ্টেন বিশাল হিমশৈলটি যথাসময়ে দেখতে পান নি, তাই সংঘর্ষ ও জাহাজডুবি।

কিন্তু এই করুণ ঘটনাটিকে রাসায়নিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা এক অভাবিত সিদ্ধান্তে পেঁছব: জলের আর এক খেয়ালীপনার জন্যই ‘টাইটেনিক’ জাহাজের বিপর্যয়।

বরফের তৈরি বিশাল, ভয়ঙ্কর, পর্বতসদৃশ এই হিমশৈল। ওজন হাজার হাজার টন নিয়েও এরা সোলার মতোই জলে ভাসে।

আর বরফ জলের চেয়ে হালকা বলেই তা সম্ভব।

কোন ধাতু গলিয়ে এতে সেই ধাতুর কঠিন একটি টুকরো ফেলে দেখুন: মুহূর্তে তা তলিয়ে যাবে। কঠিন অবস্থায় যেকোন পদার্থের ঘনাঙ্ক তার তরল অবস্থার চেয়ে অধিক। অথচ বরফ ও জল নিয়মটির বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রমটির ব্যত্যয় ঘটলে কী হত? মধ্য অক্ষাংশের জলরাশির সবটুকুই তলা অবধি শীতে জমে যেত আর মারা পড়ত ওখানকার সবক'টি জীবজন্তু ও শৈবালের দল।

মনে করুন, রুশ কবি নেক্রাসভের ছত্র:

হিমেল নদীর নরম তুষার,
ছড়ানো যেন গলন্ত চিনি

প্রবল হিম এলেই বরফ শক্ত হয়। নদীর বুক চিরে হাঁটাপথ চলে যায়। অথচ বরফের ঘন আস্তরের নীচে তখনও জল থাকে, নদী বয়ে চলে নিরবধি। নদীতল অবধি কখনই বরফ পেঁছয় না।

বরফ, জলের এই কঠিন অবস্থাটি এক অদ্ভুত পদার্থ বটে। এটি কয়েক রকম। প্রকৃতিজাত বরফ গলে শূন্য ডিগ্রিতে। উচ্চচাপ ব্যবহারক্রমে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে আরও ছ'ধরনের বরফ তৈরি করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়করটি (৭ নম্বরটি) জমে স্বাভাবিক চাপমাত্রার ২১,৭০০ গুণ বেশি চাপে। একে বলা যায় পরিতপ্ত বরফ। তা গলে স্বাভাবিক চাপমাত্রার ৩২,০০০ গুণ বেশি চাপে, শূন্যের উপর ১৯২ ডিগ্রিতে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বরফ গলার দৃশ্যটি কত পরিচিত। অথচ এতে বিস্ময়ের কত চমকই না আছে!

যেকোন কঠিন পদার্থই গলার পর প্রসারিত হয়। কিন্তু গলানো জলের আচরণ একেবারে আলাদা: তার সঙ্কোচন ঘটে এবং পরে তাপমাত্রা চড়লেই কেবল তার সম্প্রসারণ শুরু হয়। জল অণুদের পারস্পরিক আকর্ষণের প্রবণতাই এর কারণ। শূন্যের ওপর চার ডিগ্রি তাপে এই প্রবণতাটি প্রকটতম হয়ে ওঠে আর সেই তাপমাত্রায়ই জলের ঘনাঙ্ক সর্বাধিক থাকে। ফলত, এ দেশের নদী, পুকুর আর হ্রদগুলি শীতলতম আবহাওয়ায়ও তলা অবধি জমে যায় না।

আসন্ন বসন্তের আভাস সর্বত্র খুশির আমেজ ছড়ায়। সোনালী শরৎও আনন্দেই কেটেছিল। উচ্ছল বাসন্তী ঢল আর বনানীর রক্তিমাভা...

আবারও জলের সেই ব্যতিক্রমী ধর্ম!

সমপরিমাণ অন্য যেকোন পদার্থ অপেক্ষা বরফ গলাতে তাপের প্রয়োজন অনেক বেশি।

বরফ জমাট বাঁধার সময় তাপোদ্গিরণ ঘটে, প্রতিদানে বরফ আর তুষার মাটি ও বাতাসকে উত্তাপ দেয়। এরাই দুরন্ত শীতের হঠাৎ আসা আটকে রাখে শরতের ক'সপ্তাহ আয়ুর পরিসরে। আর বসন্তে ঘটে ঠিক এর উল্টোটি। গলা বরফ গুমোট আবহাওয়াকে ধরে রাখে কিছুদিন।

পৃথিবীতে জলের রকমফের কত?

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিজাত তিন রকমের হাইড্রোজেন আইসোটোপ খুঁজে পেয়েছেন আর প্রতিটিই অক্সিজেনের সঙ্গে সমাবন্ধনক্ষম। সুতরাং, আমরা তিন ধরনের জলের কথা ভাবতে পারি: প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম জল: যথাক্রমে, H_2O, D_2O, T_2O।

আবার 'মিশ্র' জলের অস্তিত্বও সম্ভব, যেমন প্রোটিয়াম ও ডিটেরিয়ামের অথবা ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের এক-একটি পরমাণু সহযোগে তৈরি অণুবিশেষ। এতে জলের সংখ্যা আরও বাড়বে: HDO, HTO এবং DTO।

কিন্তু জলের অক্সিজেনেও তিন-তিনটি রকমের আইসোটোপের মিশ্রণ রয়েছে: অক্সিজেন-১৬, অক্সিজেন-১৭, অক্সিজেন-১৮। প্রথমটিরই সর্বাধিক সংখ্যাধিক্য।

রকমারি এই অক্সিজেনের ভিত্তিতে জলের তালিকায় আরও ১২টি সম্ভাব্য

প্রকার যুক্ত হতে পারে। নদী কিংবা হ্রদ থেকে এক বাটি জল নেবার সময় আপনি নিশ্চয়ই এতে আঠারো রকম জলের অস্তিত্ব সন্দেহ করেন না।

তাই জল যেখান থেকেই আসুক তাও নানা অণুর মিশ্রণ এবং সবচেয়ে হালকা আর ভারিটি যথাক্রমে: H_2O^{16} এবং T_2O^{18}। রাসায়নিকরা আঠারো রকম জলকেই এখন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় আলাদা করতে পারেন।

হাইড্রোজেন আইসোটোপগুলি স্বধর্মে পরস্পর থেকে স্পষ্টতই আলাদা। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার জল? তারাও কমবেশি আলাদা বৈকি! তাদের ঘনাঙ্ক, হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন।

আর সেই সঙ্গে প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন প্রকার জলের আপেক্ষিক পরিমাণ সর্বদা ও সর্বত্রই আলাদা।

যেমন, কলের জলই ধরা যাক। এতে টন প্রতি ভারি ডিউটেরিয়াম জলের (D_2O) পরিমাণ ১৫০ গ্রাম। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের জলে এর মাত্রা কিছু বেশি, প্রায় ১৬৫ গ্রাম। এক ঘন মিটার নদীজল অপেক্ষা ককেশাস হিমবাহের এক টন বরফে ভারি জল থাকে ৭ গ্রাম বেশি। এক কথায় জলে আইসোটোপ উপাদানগুলি সবখানেই আলাদা। প্রকৃতিতে নিরন্তর আইসোটোপ বিনিময়ের এক বিশাল প্রক্রিয়ার অস্তিত্বই এর কারণ। বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আইসোটোপগুলি নানা অবস্থায় পরস্পরকে প্রতিস্থাপিত করে।

একটিমাত্র প্রাকৃতিক যৌগের এত প্রকারভেদের আর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? না, নেই।

প্রোটিয়াম জলই অবশ্য আমাদের প্রধান আলোচ্য, কিন্তু তাই বলে অন্যান্য জলও ফেলনা নয়। এদের অনেকগুলিই বহুলব্যবহৃত, বিশেষত ভারি জল D_2O। নিউক্লীয় রিয়েক্টরে ইউরেনিয়াম বিভাজক নিউট্রন নিয়ন্ত্রণে তা ব্যবহৃত। তা ছাড়া আইসোটোপ রসায়নেও বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের জল ব্যবহার করেন।

আঠারো প্রকার, এর বেশি নয়? আসলে জলের প্রকারভেদের বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব। প্রাকৃতিক আইসোটোপ ছাড়াও মানুষের তৈরি অক্সিজেনের আইসোটোপও রয়েছে: অক্সিজেন-১৪, অক্সিজেন-১৫, অক্সিজেন-১৯, অক্সিজেন-২০। আর অধুনা হাইড্রোজেন আইসোটোপেরও সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে; আগেই এগুলির কথা বলেছি — H^4, H^5।

আমরা যদি মানুষের তৈরী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আইসোটোপের কথা ধরি, তবে সম্ভাব্য জলের সংখ্যা শতোধর্ব হবে। সঠিক সংখ্যাটি আপনি নিজেই তো কষতে পারেন।

'অমৃত', জীবনদাত্রী, সর্বব্যাপী বারি

দেশে দেশে 'অমৃতবারির' লোককাহিনীর সীমাসংখ্যা নেই। এই জলে ক্ষত আরোগ্য হয়, মৃত জীবন পায়। এতে ভীরুর ভয় দূর হয়, নির্ভিকের সাহস বাড়ে শতগুণ।

নেহাৎ কোন দুর্ঘটনায় জলের উপর এমন মোহিনী গুণাবলী আরোপিত হয় নি। পৃথিবীতে বাঁচা, চারদিকের সবুজ বনানী আর পুষ্পিত মাঠ, নৌকাবিহার কিংবা গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে কাদা ছড়িয়ে ছুটোছুটি, শীতের স্কেটিং কিংবা স্কীদৌড় সবই জলেরই বদৌলতে। কিংবা একটু শুদ্ধ করে বললে — এসবই জলের অণুর পারষ্পরিক আকর্ষণ ও পরিমেল সৃষ্টির ক্ষমতায়। আমাদের গ্রহে প্রাণ উদ্ভবের এটিও অন্যতম শর্ত বৈকি।

পৃথিবীর ইতিহাস তো জলেরই ইতিহাস। জল অতীতে আমাদের গ্রহটির রূপান্তর ঘটিয়েছে আর এখনও ঘটাচ্ছে।

জল পৃথিবীর মহত্তম রাসায়নিক। তাকে এড়িয়ে কোন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই সংঘটিত হয় না — হোক তা নতুন শিলাগঠন, কোন নতুন খনিজ অথবা উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীদেহের অতীব জটিল কোন জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া।

পরীক্ষাগারে রাসায়নিকরা জল ছাড়া একেবারেই নাচার। পদার্থের ধর্ম পরীক্ষা, তাদের রূপান্তরণ ও নতুন যৌগ তৈরি জল ছাড়া দৈবাৎ সম্ভব। জল অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্রাবক। বিক্রিয়ায় লিপ্ত করার আগে অনেক পদার্থকেই গলিয়ে ফেলা প্রয়োজন হয়।

পদার্থ দ্রবীভূত হলে কী ঘটে? পদার্থের প্রত্যন্ত অণু ও পরমাণুর মধ্যবর্তী সক্রিয় শক্তিসমূহের তীব্রতা জলে বহু শতগুণ হ্রাস পায় এবং ফলত, এগুলি প্রত্যন্ত ভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলে মিশে যায়। চায়ের গ্লাসে চিনির টুকরো অণুরাশিতে বিভক্ত হয়। খাবার লবণ জলে পড়লে আহিত কণা, সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নে পৃথকীভূত হয়। নিজের উদ্ভট গড়নের জন্য জলের অণু গলিত বস্তুর পরমাণু ও অণু আকর্ষণের বিশেষ ক্ষমতাধারী। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য দ্রাবক জলের চেয়ে বহুল নিকৃষ্টতর।

পৃথিবীতে এমন কোন পাথর নেই যা জলের বিধ্বংসিতা সইতে পারে। ধীরে হলেও গ্র্যানাইটও নিশ্চিতভাবেই জলের সামনে আত্মসমর্পণ করে। জল তার গলানো পদার্থগুলি সাগর-মহাসাগরে বয়ে নিয়ে চলে। আর তাই এই বিশাল জলরাশি লবণাক্ত; অথচ কোটি কোটি বছর আগে জলটি ছিল মিষ্টি, আলোনা।

তুষারঝুড়ির রহস্য

তুষারঝুড়ি নিয়ে খেলা বাচ্চাদের বেজায় পছন্দ। চমৎকার চকচকে জিনিস ওগুলি।

কিন্তু ভাল করে দেখার আগেই তারা ঐ তুষারঝুড়ি মুখে পুরে ফেলে। সুস্বাদু নাকি? হাত থেকে তুষারঝুড়ি কেড়ে নিলেই তাদের কত না দুঃখ হয়।

শিশুর আবদার? না, বিষয়টি ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মোরগছানাদের উপর পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এদের এক দলকে পান করতে দেওয়া হল সাধারণ জল আর অন্যটিকে গলানো বরফের জল।

পরীক্ষাটি একেবারে সোজা ছিল। কিন্তু ফল হল রীতিমতো বিস্ময়কর। সাধারণ জল তারা শান্তভাবে, কোন গণ্ডগোল না করেই খেল। কিন্তু গলানো জলের

পাত্রের সামনে আর লড়াই শেষ হয় না। তারা এমনভাবে আকণ্ঠ সেই জল গিলল যেন তা দারুণ সুস্বাদু।

দেড় মাস পরে পরীক্ষাধীন মোরগছানাদের ওজন নেওয়া হল। দেখা গেল, যারা বরফজল খেয়েছিল তারা অনেকটা ভারি, যে দলের ভাগ্যে সাধারণ জল পড়েছিল তাদের তুলনায় ওজনও এদের কিছুটা বেশি।

অর্থাৎ বরফ গলা জল চমকপ্রদ কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জীবের পক্ষে তা পরম উপকারী। কিন্তু কেন?

এই জলে অধিক পরিমাণ ডিটেরিয়ামের উপস্থিতিকেই প্রথমত এর কারণ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। স্বল্প পরিমাণে ভারি জল জীবের বৃদ্ধি ত্বরিত করে। কিন্তু তা আংশিক সত্য...

এখন জানা গেছে যে, আসল কারণ অন্যত্র, তা বরফ গলার খোদ প্রক্রিয়াতেই।

বরফ — কেলাসিত সংস্থা। কিন্তু জলকেও কেলাস বলা যায় — সাধারণভাবে তরল কেলাস। এর অণুগুলি একেবারে আলুলায়িত নয়, মুক্ত-গড়ন এক কাঠামোয় এরা সুবিন্যস্ত। অবশ্য জলের এই গড়নটি বরফ থেকে আলাদা।

গলার সময়ও অনেকক্ষণ বরফের গড়নটি অটুট থাকে। বাহ্যত, গলানো জল তরল, কিন্তু এর অণুতে তখনও 'বরফের কাঠামো'। তাই সাধারণ জলের চেয়ে সে জলের রাসায়নিক সক্রিয়তাও বেশি। বহুবিধ জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার তা আগ্রহী অংশীদার। জীবের শরীরে প্রবেশমাত্র সাধারণ জল অপেক্ষা বহুবিধ পদার্থের সঙ্গে তার যৌগ গঠন সহজতর হয়।

বিজ্ঞানীদের ধারণা জীবদেহের অভ্যন্তরীণ জলের গড়ন বহুলাংশে বরফসদৃশ। সাধারণ জল আত্মীকরণে তার গড়ন পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য। গলানো জলে সেই ঝামেলা নেই। তার কাঠামো ঠিক চাহিদামাফিক। ওর অণুর পুনর্বিন্যাসে কোন বাড়তি শক্তিক্ষয় প্রয়োজন হয় না।

সম্ভবত, জীবনে গলানো জলের ভূমিকা আত্যন্তিক গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষাতত্ত্বের যৎসামান্য অ-আ বা 'আকাশ পাতাল ফারাক' জিনিস

বর্ণ ছাড়া শব্দ নেই, বাক্যও নেই শব্দ বিনা। ভাষা শেখার শুরু বর্ণ পরিচয়ে। আবার বর্ণমালার অক্ষর দুই জাতের: স্বর ও ব্যঞ্জন। যেকোন একটিকে বাদ দিলে

আমাদের কথ্য ভাষার রফা শেষ। একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক অজ্ঞাত কোন এক গ্রহবাসীদের মুখের কথা কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেই ব্যক্ত করেছেন। কল্পকাহিনীর লেখকরা কি-ই না উদ্ভাবন করে!

প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে কথা বলে রাসায়নিক যৌগের ভাষায়। এই ভাষার প্রতিটি শব্দ রাসায়নিক 'বর্ণ' বা পার্থিব মৌলের এক ধরনের সমাবন্ধন। এর শব্দসংখ্যা ত্রিশ লক্ষাধিক। কিন্তু রাসায়নিক 'বর্ণমালা'র অক্ষর সংখ্যা শ'খানেক।

এই 'বর্ণমালা'য়ও 'স্বর' আছে, 'ব্যঞ্জন' আছে। বহুযুগ থেকেই রাসায়নিক মৌলরা দ্বিধাবিভক্ত: অধাতু ও ধাতু।

অধাতু ধাতুর চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। তাদের অনুপাত অনেকটা বাস্কেটবল খেলায় গোল সংখ্যার মতো: ২১ :৮৫। মানুষের কথার সঙ্গে মিলটি খুবই স্পষ্ট। আমাদের স্বরবর্ণের সংখ্যা ব্যঞ্জনবর্ণের চেয়ে অনেক কম।

কেবল স্বরবর্ণসমন্বয়ে অর্থবহ কোন কথাই বলা যায় না। এতে যা হয় তা অর্থহীন হল্লামাত্র।

কিন্তু রাসায়নিক ভাষায় 'স্বর'সমাবন্ধন (অধাতু) সহজলভ্য। অধাতু যৌগ না থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের পাত্তা মিলত না।

কার্বন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন — এই চারটি প্রধান অধাতুকে বিজ্ঞানীরা বৃথাই জীবনদাত্রী বলেন না। এতে ফসফরাস আর গন্ধক যোগ করলে, প্রকৃতির প্রোটিন, শর্করা, স্নেহ ও ভিটামিন — এক কথায় সকল প্রাণদ যৌগ তৈরির প্রায় পুরো তালিকাটি এই ছয় 'ইষ্টকে' পাওয়া যাবে।

অক্সিজেন ও সিলিকন এই দু'টি অধাতু (রাসায়নিক 'বর্ণমালার' দু'টি 'স্বরবর্ণ') মিলে যে পদার্থটি তৈরি হয়, রাসায়নিক ভাষায় তার লেখ্য ও কথ্য নাম: SiO_2 — সিলিকন ডাইঅক্সাইড। উক্ত পদার্থটি ভূত্বকের কাঠিন্যের উৎস। এরই সিমেন্টে আটকে থাকে খনিজ ও শিলারাশি।

রাসায়নিক 'বর্ণমালার স্বরবর্ণ'গুলির তালিকা আর তেমন দীর্ঘ নয়। বাকী কেবল হ্যালোজেন, শূন্য দলের দুষ্প্রাপ্য গ্যাস (হিলিয়াম ও তার ভ্রাতৃবর্গ) ও অপেক্ষাকৃত কম চেনা তিনটি মৌল — বোরন, সেলেনিয়াম ও টেলুরিয়াম।

যা হোক, পৃথিবীর জীবজগৎ যে কেবলমাত্র অধাতুতেই তৈরি তা পুরোপুরি সত্য নয়।

বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহে ৭০টিরও বেশি বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক মৌলের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন: সকল অধাতু ও বহু ধাতু — লৌহ থেকে আরম্ভ করে ইউরেনিয়াম সহ তেজস্ক্রিয় মৌল পর্যন্ত।

মনুষ্য ভাষায় স্বরবর্ণের তুলনায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাধিক্যের কারণ নিয়ে ভাষাবিদদের বিতর্ক বহুদিনের।

রাসায়নিকরাও পর্যায়বৃত্তে অধাতু ও ধাতু — এই দু'টি শ্রেণীর অস্তিত্বের কারণ জানতে আগ্রহী। দুই দলের অন্তর্গত মৌলসমূহ পরস্পর থেকে বহুলাংশে পৃথক, কিন্তু এগুলির কিছু কিছু সাদৃশ্যও তো উপেক্ষণীয় নয়।

কেন এই 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'?

মানুষ যে পশু থেকে আলাদা তার কারণ নির্ণয়ে একদা এক ভাঁড় মানুষের দু'টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন: রসবোধ ও ঐতিহাসিক চেতনা। মানুষ তার ব্যর্থতাকে উপহাস করতে পারে এবং একই কাজে দুবার ব্যর্থ হয় না। আমরা এর সঙ্গে আরও একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করতে চাই: নিজেকে 'কেন' জিজ্ঞাসা করা এবং তার উত্তরসন্ধান।

আমরা এখন 'কেন' এই ছোট্ট শব্দটি ব্যবহার করি।

যেমন, অধাতু বড় বাড়ির বিভিন্ন তলা ও আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে না থেকে কেন একটি কোণে এমন আলাদা হয়ে আছে? ধাতু যেমন ধাতু, অধাতুও তেমনি অধাতু। কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য কি? শুরু করার পক্ষে শেষ প্রশ্নটিই উপযোগী।

দু'টি মৌল (যেকোনই হোক) রাসায়নিক বিক্রিয়ালিপ্ত হলে এগুলির পরমাণুর প্রত্যন্ত ইলেকট্রন খোলক পুনর্বিন্যস্ত হয়। মৌল দু'টির একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং অন্যটি তা গ্রহণ করে।

উক্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক নিয়মেই ধাতু এবং অধাতু পৃথক।

অধাতু দু'টি পরস্পর বিপরীত কাজে সমর্থ: নিয়মানুসারে অধাতু ইলেকট্রনগ্রাহী, কিন্তু ইলেকট্রন ত্যাগেও অপারগ নয়। এগুলি নমনীয় স্বভাবের এবং অবস্থানুযায়ী চেহারা পাল্টাতেও পারে। ইলেকট্রন গ্রহণই সুবিধাজনক — এরা ঋণাত্মক আয়নেরই ভেক ধরে। আর উল্টো ক্ষেত্রে ধনাত্মক আয়নের উদ্ভব হয়। ফ্লোরিন আর অক্সিজেনই শুধু ভোল বদলাতে জানে না — এরা ইলেকট্রনগ্রাহী, ইলেকট্রনত্যাগী নয়।

ধাতু তেমন কিছু 'কূটনীতিক' নয়। ধাতু বেশি লক্ষ্যনিষ্ঠ। ধাতুর অনমনীয় নীতি: কেবলই ইলেকট্রন দাও আর কিছু না। ধাতু ধনাত্মক আয়ন গঠন করে।

বাড়তি ইলেকট্রন জোগাড় করা ধাতুর কাজ নয়। ধাতু মৌলগুলির ব্যবহারিক নিয়মতন্ত্র খুব কড়া।

এই তো গেল ধাতু ও অধাতুর মধ্যে পার্থক্য।

কিন্তু অতি সতর্ক রাসায়নিকরা এই কঠোর নিয়মেরও ব্যতিক্রম খুঁজে পেয়েছেন। ধাতুগুলির মধ্যেও চারিত্রিক বৈকল্য পুরোপুরি অনুপস্থিত নয়। এদের দু'টি (এ যাবত!) 'অধাতু' স্বভাবের। অ্যাস্টেটাইন ও রেনিয়াম (মেন্দেলেয়েভ সারণীর ৮৫ নং এবং ৭৫ নং ঘরের বাসিন্দা) ঋণাত্মক একযোজী আয়ন গঠন করে। ঘটনাটি লক্ষ্যনিষ্ঠ ধাতু পরিবারের কলঙ্ক বৈকি...

এখন দেখা যাক, কোন পরমাণুর পক্ষে ইলেকট্রন দান সহজতর আর কোনটিই-বা প্রলুব্ধ ইলেকট্রনগ্রাহী? যে পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলকে ইলেকট্রন সংখ্যা খুব কম, তার পক্ষে ওটি ত্যাগ করাই সুবিধাজনক। কিন্তু যেখানে ইলেকট্রন বেশি, সেই পরমাণু আরও ইলেকট্রন সংগ্রহ করে অষ্টকটি পূরণ করতে চায়। ক্ষার ধাতুর বাড়তি ইলেকট্রন মাত্র একটি। এর পক্ষে ওটি ছেড়ে দেয়া কিছুই নয়, আর তাতে পড়শী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের মতোই স্থায়ী ইলেকট্রন খোলকই অবারিত হয়ে ওঠে। এজন্য জানা ধাতুগুলির মধ্যে ক্ষারধাতুই সেরা কর্মিষ্ঠ। আবার তাদের নিজেদের মধ্যে ফ্রান্সিয়ামই 'কাজের কাজী' (৮৭ নম্বর ঘর)। মৌল স্বদলে যত বেশি ভারি তার পরমাণুও তত বড় আর একমাত্র ইলেকট্রনটির উপর তার দখলও সে পরিমাণেই কম।

ফ্লোরিন অধাতুরাজ্যের অগ্নিশর্মা। তার 'প্রত্যন্তদেশীয়' ইলেকট্রন সাতটি। তার কাছে অষ্টম ইলেকট্রনটি তাই আশীর্বাদস্বরূপ। পর্যায়বৃত্তের যেকোন মৌল থেকে ইলেকট্রন ছিনিয়ে নিতে তার অশেষ লোভ। ফ্লোরিনের উন্মত্ত আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য।

অন্যান্য অধাতুও ইলেকট্রনলোভী, কেউ কম, কেউ বেশি। এগুলি কেন উপর তলায় ডানদিকে দলবদ্ধ হয়ে আছে তার কারণ এখন আমরা বুঝতে পারি। এদের প্রত্যন্ত ইলেকট্রন সংখ্যা অঢেল এবং পর্যায় শেষের পরমাণুতেই শুধু তা সম্ভবপর।

আরও দু'টি 'কেন'

পৃথিবীতে এত বেশি ধাতু আর এত কম অধাতুর কারণ কি? অধাতু অপেক্ষা ধাতুই-বা পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ কেন? অবশ্য চেহারা দেখে গন্ধক আর ফসফরাস অথবা আয়োডিন আর কার্বনকে ভুল করার কথা নয়। কিন্তু নায়োবিয়াম ও ট্যাণ্টেলাম,

পটাসিয়াম ও সোডিয়াম অথবা মোলিব্‌ডেনাম ও টাংস্টেনকে পৃথকীকরণে অনেক সময় বিশেষজ্ঞরাও মুশকিলে পড়ে যান।

...সংখ্যার স্থানবদলে যোগফলের কোন রদবদল ঘটে না। এটি সম্ভবত গণিতের অন্যতম 'অলঙ্ঘ্য' নিয়ম। কিন্তু রসায়নে পারমাণবিক ইলেকট্রন খোলকের পর্যায়ে নীতিটি সর্বদা যথাযথ প্রযোজ্য নয়...

মেন্দেলেয়েভ সারণীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মৌলের ব্যাপারে অবশ্য কিছুই গোলমেলে নেই।

এ পর্যায়ের প্রতিটি মৌলেরই নতুন ইলেকট্রনটি পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলকে রক্ষিত। আরও একটি মাত্র ইলেকট্রন যোগ করলেই পূর্ববর্তী থেকে একেবারে আলাদা এক নতুন পদার্থে এর রূপান্তর ঘটে। সিলিকনের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের কোন সাদৃশ্য নেই। গন্ধক থেকে ফসফরাস পুরোপুরি আলাদা। অচিরেই ধাতব চারিত্র্যের বদলে দেখা দেয় অধাতব দ্রব্যগুণ। এর কারণ সহজবোধ্য। পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলকে ইলেকট্রনের বাহুল্য এগুলিকে 'কৃপণ' করে তোলে। এরা ইলেকট্রন হারাতে চায় না।

এখন চতুর্থ পর্যায়ে আসা যাক। পটাসিয়াম আর ক্যালসিয়াম প্রথম শ্রেণীর ধাতু। আশা করি, এগুলির পরপরই আবার অধাতুগুলির দেখা মিলবে।

কিন্তু হায়, আমাদের জন্য হতাশাই অপেক্ষিত। কারণ, স্ক্যাণ্ডিয়াম থেকে শুরু করে এদের প্রত্যেকেরই বাড়তি ইলেকট্রনটির প্রত্যন্ত খোলকের চেয়ে এর পূর্ববর্তী খোলকটিই বেশি পছন্দ। 'শব্দের' স্থানবদল। কিন্তু এই বদলিতে 'যোগফলের,' মৌলের ধর্ম সমষ্টির পরিবর্তন ঘটে।

প্রত্যন্ত থেকে দ্বিতীয় খোলকটি প্রত্যন্তটির তুলনায় ঢের বেশি রক্ষণশীল আর মৌলের রাসায়নিক ধর্মকে তা অল্পই প্রভাবিত করে। এই মৌলগুলির পার্থক্য তাই তেমন কিছু প্রকট নয়।

স্ক্যাণ্ডিয়াম যেন 'স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে' যে তার তৃতীয় খোলকটি অসম্পূর্ণ। এতে ১৮টি ইলেকট্রনের স্থলে আছে মাত্র ১০টি। সম্ভবত, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম তাকে বেমালুম 'ভুলে' নতুন পাওয়া নিজস্ব ইলেকট্রনগুলি চতুর্থ খোলকে সাজিয়ে রেখেছে। স্ক্যাণ্ডিয়ামে ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল।

ক্রমান্বয়ে দশটি মৌলের সারিতে প্রত্যন্তের পূর্ববর্তী খোলকটিই পূর্ণ হচ্ছে। প্রত্যন্ত খোলক মাত্র দু'টি ইলেকট্রন সহ অপরিবর্তিত রইল। কোন পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলকে এমন 'স্বল্পসংখ্যক' দু'টি ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ধাতুর ক্ষেত্রে উদ্ভট

ঘটনা। সেজন্যই স্ক্যাণ্ডিয়াম — দস্তা ‘পরিসরে’ কেবলই ধাতু রয়েছে। প্রত্যন্ত খোলকে মাত্র দু’টি ইলেকট্রন বিধায় কেন-বা এরা যৌগ তৈরির সময় ওখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে? বিক্রিয়ালিপ্সু মৌলকে ইলেকট্রনদু’টি দিয়ে দেওয়াই তো তাদের পক্ষে সহজতর। তা ছাড়া নির্মীয়মাণ প্রত্যন্তের পূর্ববর্তী খোলক থেকে বাড়তি ইলেকট্রন ধারেও তাদের আপত্তি নেই। ফলত, তাদের পক্ষে বহুরূপী হরেকরকম ধনাত্মক যোজ্যতা প্রদর্শন সম্ভব। যেমন, ম্যাঙ্গানিজের কথাই ধরা যাক। তার পক্ষে ধনাত্মক দ্বি-, ত্রি-, চতুঃ-, ষড়-, এমন কি সপ্তযোজী হওয়াও কঠিন নয়।

পর্যায়বৃত্ত সারণীর পরবর্তী পর্যায়গুলিতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়।

ধাতুর বহুল সংখ্যা এবং অধাতুর তুলনায় এগুলির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্যের কারণ এ-ই।

কিছু অসঙ্গতি

ষড়যোজী অক্সিজেনের কথা কেউ শুনেছে? অথবা সপ্তযোজী ফ্লোরিন? না, কখনই না।

আমরা নিরাশাবাদী নই, তবু নিশ্চিত বিশ্বাসেই বলছি, রসায়নে কখনই এমন কোন অক্সিজেন ও ফ্লোরিন আয়ন আবিষ্কৃত হবে না।

এতোগুলো ইলেকট্রন খসানোর কী মাথাব্যথা এদের পড়েছে বলুন, যখন মোটে দু’টো বা একটা ইলেকট্রন পেলেই এদের আট ইলেকট্রনের খোলকটি পুরোপুরি ভরে উঠবে। আর সেজন্য ধনাত্মক যোজ্যতা দেখাতে উৎসুক অক্সিজেনের এমন যৌগ কমই আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে F_2O কথাই ধরা যাক। এই অক্সাইডে অক্সিজেনের যোজ্যতা দ্বিযোজী ধনাত্মক। কিন্তু রসায়নের জগতে এটি উদ্ভট, ব্যতিক্রমী। ফ্লোরিনের ধনাত্মক যোজ্যতালগ্ন যৌগও দুর্লভ বস্তু।

‘বড় বাড়ির নিয়মকানুন’এর একটি ধারা অনুযায়ী কোন মৌলের উচ্চতম ধনাত্মক যোজ্যতা তার নিজস্ব নম্বরের সমান।

অক্সিজেন ও ফ্লোরিনে নিয়মটির লঙ্ঘন ঘটলেও এরা স্থায়ীভাবেই ৬ষ্ঠ ও ৭ম নম্বর দলের নথিভুক্ত। এদের ওখান থেকে সরানোর কথাও কেউ কোনদিন ভাবে নি, কারণ বড় বাড়ির অন্যান্য তলার প্রতিবেশী অধিক ভারি ধাতুর জীবনধারা থেকে অক্সিজেন আর ফ্লোরিনের রাসায়নিক স্বভাব অন্য কোন ব্যাপারে মোটেই আলাদা নয়।

তবু এটিও এক অসঙ্গতি বৈকি, আর রাসায়নিকরা তা ভালই জানেন। তাঁরা অবশ্য বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামান না, কারণ এতে মেন্দেলেয়েভ সারণীর স্থাপত্যের কোনই ক্ষতি হয় না।

কিন্তু হায়, ঐ তো আরও একটি অসঙ্গতি। বিরাটও।

মধ্যযুগে খনিশ্রমিকরা মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব আকর খুঁজে পেতেন। ওগুলি ছিল অনেকটা আকরিক লোহের মতো। কিন্তু তা থেকে কখনই লোহ মিলত না। শেষে ব্যর্থতার জন্য তারা দোষ চাপাত ভূতপ্রেতের উপর। এদের একটি অপদেবতা জার্মান ভাষায় যার নাম কোবল্ড আর অন্যটি ধোঁকাবাজ বুড়ো শয়তান নিক।

শেষে জানা গেল যে, এতে ভূতপ্রেতের কোন কারসাজি নেই। আকরটি লোহশূন্য এবং তা লোহের মতো অন্য দু'টি ধাতুযুক্ত। সেই পুরানো ভ্রান্তির জের টেনেই এদের কোবাল্ট আর নিকেল নামকরণ।

মধ্যযুগে স্পেনীয় হানাদাররা দক্ষিণ আমেরিকার প্লাতিনো-দেল-পিনো নদীর তীরে এক অদ্ভুত খনিজ পদার্থ দেখতে পান। সকল অ্যাসিডে দুর্গল, ভারি, অতুৎজ্জ্বল ধাতুটির নাম দেওয়া হয় প্ল্যাটিনাম। এর তিন শতাব্দী পর জানা গেল যে, প্ল্যাটিনাম প্রায় সব সময়ই পঞ্চসখা — রুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম, অস্‌মিয়াম আর ইরিডিয়ামের সঙ্গে জোট বেঁধে থাকে। এই ছ'টি দুর্লভ ধাতুকে আলাদা করে চেনা কঠিন। এরা প্রায় অবিচ্ছেদ্য আর সেজন্য প্ল্যাটিনাম গোষ্ঠী নামে খ্যাত।

তারপরই এল বড় বাড়িতে এদের জায়গা দেবার সময়।

একে একে আনুষঙ্গিক সমস্যার সমাধান এবং একটি প্রাসঙ্গিক উপভোগ্য কাহিনী শোনার আশা বৃথা।

দুঃখিত, আপনাদের নিরাশ করছি। এ সবই অতি সাধারণ...

স্থাপত্যের স্বকীয়তা

আপনারা কি এমন কোন বাড়ি দেখেছেন যার সবক'টি অংশই একজন স্থপতির নকশা অনুযায়ী তৈরি এবং তাই হুবহু এক, আর একটি অংশ শুধু একেবারেই আলাদা — যেন অন্য কোন স্থপতির তৈরি? সম্ভবত দেখেন নি।

কিন্তু বড় বাড়িটি এমনি উদ্ভট ধরনের। মেন্দেলেয়েভ নিজেই এর অংশবিশেষ একেবারে স্বকীয় ঢঙে তৈরি করেছিলেন।

উল্লেখ্য অংশটি পর্যায়বৃত্তের অষ্টম দলভুক্ত। ওখানকার মৌলগুলি তিন-তিনটি করে দলবন্দী। তা ছাড়া প্রত্যেক তলায়ও তারা নেই, তারা ছড়িয়ে আছে সারণীর দীর্ঘতর পর্যায়গুলিতে। লৌহ, কোবাল্ট ও নিকেল রয়েছে এদেরই একটিতে আর প্ল্যাটিনাম ধাতুগুলি অন্য দু'টিতে।

এদের জন্য বেশি উপযোগী জায়গা খুঁজতে মেন্দেলেয়েভ চেষ্টার কোন কসুর করেন নি। সব চেষ্টাই কিন্তু বৃথা। উপায়ান্তর না দেখে শেষে বাধ্য হয়ে অষ্টম দলটি যোগ করেছেন পর্যায়বৃত্ত সারণীতে।

অষ্টমটি কেন? কারণ, এর আগের সপ্তম দলটি তো হ্যালোজেনগুলির।

কিন্তু এতে তো দলসংখ্যা নিরর্থক হয়ে দাঁড়াল।

অষ্টম দলে ধনাত্মক অষ্টযোজ্যতা নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। কেবল রুথেনিয়াম ও অস্‌মিয়ামই তা মেনে চলার চেষ্টা করতে পারে, যদিও বহুকষ্টে। এদের অক্সাইডদ্বয় RuO_4 এবং OsO_4 ক্ষণস্থায়ী।

বিজ্ঞানীদের সকল সহায়তা সত্ত্বেও আর কোন ধাতুই এরূপ 'উচ্চতায়' আরোহণ করতে পারে নি।

হেঁয়ালিটির একই সঙ্গে সমাধান করা যাক।

লক্ষণীয়, প্ল্যাটিনাম ধাতুগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লিপ্ত হতে তেমন উৎসাহী নয়। আর সেজন্যই রাসায়নিকরা আজকাল প্রায়ই পরীক্ষায় প্ল্যাটিনাম তৈজস ব্যবহার করেন। প্ল্যাটিনাম ও তার সঙ্গীরা যেন ধাতুসমাজের 'বর-গ্যাস'। তাই যুগ যুগ ধরে বৃথাই তারা 'অভিজাত' হিসেবে আখ্যায়িত হচ্ছে না। আরও লক্ষণীয় যে, তারা প্রকৃতির মধ্যে সাদাসিধে, আত্মীয়বিহীন অসম্বন্ধ বসবাসেই অভ্যস্ত।

লৌহের কথাই এখন ধরা যাক। সাধারণত, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লৌহ মধ্যম ধরনের সক্রিয় মৌল। বিশুদ্ধ লৌহ অতি সুস্থির।

(প্রসঙ্গত এখানে একটি চিন্তনীয় বিষয় উল্লেখ্য। কেবল ধাতুই নয়, অনেক মৌলই বিশুদ্ধতম অবস্থায় অত্যধিক রাসায়নিক প্রভাবসহিষ্ণু)।

পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলক নয়, এর পূর্ববর্তী খোলকটি প্ল্যাটিনাম ধাতুর 'আভিজাত্যের' কারণ।

এর মোট আঠারোটি ইলেকট্রন পুরো হতে আর প্রয়োজন মাত্র কয়েকটি ইলেকট্রনের। আঠারো ইলেকট্রনের খোলকটি সংস্থা হিসেবে যথেষ্ট মজবুত। তাই প্ল্যাটিনাম ধাতু সেই খোলক থেকে ইলেকট্রন খসাতে নারাজ। কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণেও এরা অপারগ। এরা ধাতু যে।

এই 'অস্থিরতা'র জন্যই প্ল্যাটিনাম ধাতুর আচরণ এত অদ্ভুত।

তবু মেন্দেলেয়েভ সারণীর যুক্তির সঙ্গে অষ্টম দলের অসঙ্গতি আছেই। উক্ত অসঙ্গতি মোচনে রাসায়নিকরা অতঃপর অষ্টম ও শূন্য দল একত্র করার প্রস্তাব করেছেন।

ভবিষ্যৎই শুধু প্রস্তাবটির যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারে।

চৌদ্দটি যমজ

নাম এদের ল্যান্থেনাইড মালা। ল্যান্থেনামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের জন্যই এই নামকরণ। এরা সংখ্যায় চৌদ্দ, এক পুঞ্জ জলবিন্দুর মতোই অবিকল পরস্পরসদৃশ। বিস্ময়কর রাসায়নিক সমতার জন্য এরা সকলেই সারণীর একটি মাত্র ঘরের বাসিন্দা। এর নাম ল্যান্থেনাম কক্ষ, সংখ্যাক্রম ৫৭।

কাজটি কি মারাত্মক কোন বিভ্রান্তি নয়? মেন্দেলেয়েভ নিজে এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞানীর মতে পর্যায়বৃত্ত সারণীর প্রতিটি মৌলের এক-একটি স্থান সুনির্দিষ্ট।

অথচ দেখছি চৌদ্দ জন বাসিন্দাকে এখানে একই ঘরে বোঝাই করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই তৃতীয় দলের ষষ্ঠ পর্যায়ের মৌল।

এদের আলাদা করে অন্য দলের সঙ্গে রাখা হচ্ছে না কেন?

অনেক বিজ্ঞানীই এমন চেষ্টা করেছেন। মেন্দেলেয়েভও। তাঁরা সিরিয়াম, প্রাসিওডিমিয়াম ও নিওডিমিয়ামকে যথাক্রমে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দলে রেখেছিলেন। কিন্তু বিন্যাসটি সকল যুক্তিতর্কের ব্যত্যয় ঘটাল। মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রধান ও মাধ্যমিক দলগুলিতে একই ধরনের মৌল রয়েছে। কিন্তু সিরিয়াম আর জির্কোনিয়ামের মধ্যে কোনই মিল ছিল না, প্রাসিওডিমিয়াম ও নিয়োডিমিয়াম কিছুতেই চিনতে পারল না নায়োবিয়াম আর মোলিব্‌ডেনামকে। অন্যান্য বিরলমৃত্তিক মৌলও (ল্যান্থেনাম ও ল্যান্থেনাইড মালা এই সাধারণ নামেই পরিচিত) প্রতিসঙ্গী দলে আত্মীয় সন্ধানে বৃথাই ঘুরে মরল। পক্ষান্তরে, এরা নিজে ছিল যমজ ভাইদের মতোই অবিকল, অভিন্নসত্তা।

সারণীর কোন কোন কোঠা ল্যান্থোনাইড মৌলের জন্য বরাদ্দ করা হবে? প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি রাসায়নিকরা অসহায় কাঁধ ঝাঁকালেন। অবশ্য কীই-বা তাঁরা আর করতে পারতেন? তাঁরা নিজেরাই তো ল্যান্থেনাইডের আশ্চর্য সাদৃশ্যে হতবুদ্ধি!

কিন্তু শেষে দেখা গেল এর ব্যাখা খুবই সহজ।

পর্যায়বৃত্তে কিছু কিছু দুর্লভ মৌলের দল আছে যাদের পারমাণবিক সংযুতি কিছুটা অদ্ভুত ধরনের। এদের পরমাণুর শেষতম ইলেকট্রনটি প্রত্যন্ত এমন কি এর পূর্ববর্তী খোলকেও অবস্থান করে না, ভৌত নিয়মের আক্ষরিক অনুসরণে তা প্রত্যন্ত খোলক থেকে তৃতীয় খোলকটি ভেদ করে। জায়গাটি তার পক্ষে খুবই আরামের এবং স্থানত্যাগ তার ভারি অপছন্দ। তারা বিক্রিয়ালিপ্ত হয় দৈবাৎ।

যেহেতু সকল ল্যান্থেনাইডেরই প্রত্যন্ত খোলকের ইলেকট্রন সংখ্যা তিন, সেজন্য নিয়মানুসারে এরা ত্রিযোজী।

ল্যান্থেনাইডের সংখ্যা যে ঠিক ঠিক চৌদ্দ তা কিন্তু কোন আপতিক ব্যাপার নয়। এদের পরমাণুর প্রত্যন্ত থেকে তৃতীয় খোলকের চৌদ্দটি শূন্য স্থানই এর কারণ আর তাই খোলকটিও ইলেকট্রনলিপ্সু।

তাই ল্যান্থেনামের সঙ্গে সকল ল্যান্থেনাইডেরই একই ঘরে রাখা রাসায়নিকদের কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।

ধাতুরাজ্য ও এর কূটাভাস

পর্যায়বৃত্তে ধাতুর সংখ্যা আশিটিরও বেশি। অধাতুর তুলনায় এদের সাদৃশ্য অবশ্য ঘনিষ্ঠতর। তবু ধাতুরাজ্যে বিস্ময়ের শেষ নেই।

যেমন, ধাতুর রঙের কথাই ধরা যাক।

ধাতুবিদদের মতে, ধাতুমাত্রই লৌহঘটিত ও লৌহবিহীন এই দুই ভাগে বিভক্ত। লৌহ ও লৌহধারীরা লৌহঘটিতের অন্তর্ভুক্ত। বাকী প্রায় সকলেই লৌহবিহীনের দলে, ব্যতিক্রম শুধু বরধাতুবর্গ — 'মহামান্য' রৌপ্য, স্বর্ণ আর প্ল্যাটিনাম সদলবলে।

বিভাগটি আত্যন্তিক স্থূল আর ধাতু এই বৈষম্যহীনতায় নিজেই ক্ষুব্ধ।

প্রতিটি ধাতুই স্বকীয় বর্ণে বিশিষ্ট। এর গাঢ়, পাংশু অথবা রূপালী ভিতে নির্দিষ্ট আভাযুক্ত। অতি শুদ্ধ ধাতু পরীক্ষাক্রমে বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। অনেক ধাতু বাতাসের সংস্পর্শে অচিরে অথবা বিলম্বে অক্সাইডের পাতলা আস্তরে ঢাকা পড়ে আর এদের আসল রঙটিই তখন আড়াল হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ ধাতুর বর্ণক্রম যথেষ্ট প্রসারিত। রক্তিম অথবা হলুদ রঙের খেলা, নীলাভ, হরিৎ-নীল সবুজাভ ধাতু, শরতের মেঘলা দিনের সমুদ্রজলের মতো গাঢ় ধূসর রঙ, কিংবা আয়নার মতো আলো-ঠিকরানো মসৃণ রূপালী ধাতু অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

ধাতুর রঙ বহু হেতুনির্ভর এবং তন্মধ্যে এর উৎপাদনপদ্ধতিও অন্তর্ভুক্ত। গলানো অথবা না গলিয়ে জমাট বাঁধানো একই ধাতুর বর্ণভেদ সুস্পষ্ট।

ভর মাধ্যমেও ধাতু ভারি, মাঝারি ও হালকা হিসেবে সনাক্ত করা যায়।

এই 'ভর শ্রেণীর' মধ্যে কিন্তু রেকর্ডহোল্ডাররাও রয়েছে।

লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম জলে ভাসে। এরা জলের চেয়ে হালকা। যেমন, লিথিয়ামের ঘনত্ব জলের প্রায় অর্ধেক। জলের ঘনত্ব একের সমান। তেমন সক্রিয় না হলে লিথিয়াম নানা কাজের চমৎকার উপকরণ হয়ে উঠত। লিথিয়ামে তৈরী একটি পুরো জাহাজ কিংবা গাড়ির কথা কল্পনা করুন। দুর্ভাগ্য, এমন আকর্ষী একটি ধারণা রসায়নসিদ্ধ নয়।

ধাতুরাজ্যে অস্মিয়াম 'হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন'। এই বরধাতুটির এক সি.সি-র. ওজন ২২·৬ গ্রাম। দাঁড়িপাল্লায় এক সি-সি অস্মিয়ামকে সমান করতে তিন সি-সি তাম্র, ২ সি-সি সীসক অথবা চার সি-সি ইট্রিয়াম প্রয়োজন হয়। অস্মিয়ামের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী — প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়াম 'কৃতিত্বে' প্রায় তারই কাছাকাছি। বরধাতুগুলি সেরা ভরেরও বটে।

ধাতুর কাঠিন্য প্রবাদতুল্য। আমাদের ধারণায় সদাশান্ত ও স্থিরমস্তিষ্ক লোক 'লৌহস্নায়ুর' অধিকারী। কিন্তু ধাতুরাজ্যে অবস্থাটি ভিন্নতর।

এখানে লৌহ কাঠিন্যের মাপকাঠি নয়। কাঠিন্যের চ্যাম্পিয়ন হল ক্রোমিয়াম, যেন হীরকের ছোট ভাই। কিন্তু অদ্ভুত শোনালেও সত্যি যে, কঠিনতম রাসায়নিক মৌল মোটেই ধাতু নয়। কাঠিন্যের প্রচলিত ধারণানুযায়ী হীরক রূপধর কার্বন আর কেলাসিত বোরনই কঠিনতম মৌল। এখানে লৌহ তো নরম ধাতুরই দলে। সে ক্রোমিয়ামের অর্ধেকমাত্র কঠিন। আর হালকাগুলির মধ্যে ক্ষারধাতুই সেরা পলকা। তারা মোমের মতো নরম।

তরল ধাতু আর একটি গ্যাস (!) ধাতু

শক্ত হোক, নরম হোক ধাতুমাত্রেই কঠিন। এ-ই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে।

কোন কোন ধাতু বহুলাংশে দ্রবণতুল্য। গ্যালিয়াম অথবা সিজিয়ামের ফালি হাতের উপরই গলে যায়। এদের গলনাঙ্ক ৩০ ডিগ্রির কম। ফ্রান্সিয়াম — যাকে আজও বিশুদ্ধ অবস্থায় তৈরি করা সম্ভব হয় নি, তা কক্ষতাপেই তরলিত হয়। পারদ

তরল ধাতুর ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত। পারদ ৩৯ ডিগ্রি হিমাঙ্কে জমে বলেই তা হরেকরকম তাপমানযন্ত্রে ব্যবহার্য।

এ ব্যাপারে পারদের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী গ্যালিয়াম। পারদের স্ফুটনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম, ৩০০ ডিগ্রি মাত্র। আর তাই পারদ-তাপমানযন্ত্র উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপের অনুপযোগী। কিন্তু গ্যালিয়ামের বাষ্পীকরণে ২,০০০ ডিগ্রি তাপমাত্রা অপরিহার্য। কোন ধাতুর পক্ষেই এত দীর্ঘকাল তরল থাকা অসম্ভব অর্থাৎ গ্যালিয়ামের মতো এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের ফারাক এত বেশি নয়। তাই গ্যালিয়াম উচ্চতাপ পরিমাপক তাপমানযন্ত্রের জন্য চমৎকার উপকরণ।

আর একটিমাত্র কথা অবশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য। তত্ত্বীয়ভাবে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পারদের সদৃশ কোন ভারি উদাহরণ (বড় বাড়ির কাল্পনিক সাত তলার অষ্টম পর্যায়ের বৃহৎ পারমাণবিক সংখ্যাধর বাসিন্দা, পৃথিবীতে অজ্ঞাত) থাকলে তা স্বাভাবিক অবস্থায় গ্যাস হত। ধাতুধর্মী গ্যাস পদার্থ! এমন এক অনন্য মৌল পরীক্ষার সৌভাগ্য কি বিজ্ঞানীদের হবে?

সীসকের তারকে দেশলাই কাঠিতেও গলানো যায়। টিনের পাত আগুনে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে দ্রব হয়। কিন্তু টাংস্টেন, ট্যাণ্টেলাম অথবা রেনিয়াম গলাতে ৩,০০০ ডিগ্রির তাপমাত্রা প্রয়োজন। অন্য যেকোন ধাতুর তুলনায় এদের গলানো কঠিন বৈকি। তাই ভাস্বর বিজলীবাতির ভাল্‌ভের তার ট্যাংস্টেন ও রেনিয়ামে তৈরি।

কোন কোন ধাতুর স্ফুটনাঙ্ক সত্যি বিপুল। হ্যাফ্‌নিয়মের কথাই ধরা যাক। এর গলন শুরু হয় ৫,৪০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় — কী আশ্চর্য, তাপমাত্রাটি সৌরতলের সমান।

অস্বাভাবিক যৌগ

মানুষের স্বেচ্ছাকৃত প্রথম রাসায়নিক যৌগ কী?

বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রশ্নটির কোন সঠিক উত্তর মেলা কঠিন।

বিষয়টি আমরাই না হয় ইচ্ছামতো ভেবে দেখি।

মানুষ জেনেশুনে প্রথম যে পদার্থটি তৈরি করেছে তা অবশ্যই তাম্র ও টিন — এই দুই ধাতুর যৌগ। আমরা ইচ্ছা করেই 'রাসায়নিক' কথাটি বাদ দিয়েছি, কারণ তাম্র ও টিনের যৌগ (ব্রোঞ্জ নামেই সাধারণত পরিচিত) কিছুটা অস্বাভাবিক। এর নাম সঙ্কর ধাতু।

প্রাচীনরা প্রথমে শেখেন আকরিক গলিয়ে ধাতু পৃথক করার কৌশল আর শেষে এদের মিশ্রণপদ্ধতি।

তাই সভ্যতার ঊষালগ্নেই প্রথম অংকুরিত হয় রসায়নের অন্যতম ভাবী শাখা — অধুনাখ্যাত ধাতুরসায়নের বীজ।

ধাতু ও অধাতুর যৌগসমূহের সংযুতি এদের অন্তর্গত মৌলগুলির যোজ্যতার উপরই সাধারণত নির্ভরশীল। দৃষ্টান্ত হিসেবে সাধারণ লবণের কথাই ধরা যাক। এর অণু ধনাত্মক একযোজী সোডিয়াম ও ঋণাত্মক একযোজী ক্লোরিনে তৈরি। অ্যামোনিয়াম অণু NH_3 ঋণাত্মক ত্রিযোজী নাইট্রোজেন আর ধনাত্মক একযোজী তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মিলনফল।

ধাতুগুলির পারস্পরিক রাসায়নিক যৌগ (আন্তঃধাতব যৌগ) সাধারণত যোজ্যতা রীতির অনুসারী নয় এবং এদের সংস্থিতিও বিক্রিয়ালিপ্ত মৌলগুলির যোজ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে না। তাই আন্তঃধাতব যৌগদের সংকেত দৃশ্যত উদ্ভট: $MgZn_5$, KCd_7, $NaZn_{12}$, ইত্যাদি। একই ধাতুযুগ্মের পক্ষে হরেকরকম আন্তঃধাতব যৌগ জনন সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোডিয়াম ও টিনের কথা উল্লেখ্য। এতে উৎপন্ন বিভিন্ন সমাবন্ধনের সংখ্যা ৯।

গলিত অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হওয়াই ধাতুরাজ্যের নিয়ম। কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হলেও অনেক সময়ই তারা কোন রাসায়নিক যৌগ উৎপাদন করে না। হামেশাই এদের একটি অন্যটির সঙ্গে শুধু মিশে থাকে। ফলত, অনির্দিষ্ট সংস্থিতির সমসত্ত্ব বহু মিশ্রণের উদ্ভব ঘটে, যার কোন সুচিহ্নিত রাসায়নিক কংকেত নেই। এমন মিশ্রণই কঠিন দ্রব নামে পরিচিত।

সংকর ধাতু অসংখ্য। এদের বর্তমান সংখ্যা কত এবং আর কতটিই তৈরি করা সম্ভব, তা নিয়ে আজও কেউ মাথা ঘামায় নি। জৈব যৌগের ক্ষেত্রের মতো হয়ত সংখ্যাটি কয়েক ডজন লক্ষে পৌঁছে যাবে।

এমন সংকরও আছে যেখানে ধাতুসংখ্যা ডজনপ্রায় এবং যেকোন নতুন ধাতু যুক্ত হলেই এর গুণাগুণে নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে। বহু সংকরেরই ধাতু সংখ্যা মাত্র দু'টি, এরা দ্বৈতধাতু। কিন্তু এদের ধর্ম নিজ উপাদানের অনুপাতনির্ভর।

ধাতুগুলির কোন কোনটি খুব সহজে এবং যেকোন অনুপাতেই মিশ্রিত হয়। ব্রোঞ্জ আর পিতল (তাম্র আর দস্তার সংকর) এর দৃষ্টান্ত। অন্যত্র, যেমন তাম্র আর টাংস্টেন যেকোন অবস্থায়ই মিশ্রণে অনিচ্ছুক। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এদের সংকর তৈরি করেছেন, যদিও অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে। তাঁরা তাম্র আর টাংস্টেন-চূর্ণকে বিশেষ চাপমাত্রায় ও তাপে না গলিয়ে মিশ্রিত করেছেন। এর নাম চূর্ণ-ধাতুবিদ্যা।

কোন কোন সঙ্কর ধাতু কক্ষতাপেও তরল। অন্যগুলি অত্যধিক তাপসহিষ্ণু এবং এরা অঢেল মাত্রায় মহাজাগতিক ইঞ্জিনিয়রিংয়ে ব্যবহৃত। তা ছাড়াও এমন সঙ্কর ধাতুও আছে যারা সর্বশক্তিমান রাসায়নিক উপাদানের আক্রমণেও বিন্দুমাত্র নত হয় না। আর আছে প্রায় হীরককঠিন সঙ্কর ধাতুও...

রসায়নের প্রথম কম্পিউটার

কম্পিউটার অনেক কিছুই করতে পারে। দাবা খেলতে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে, দূর নক্ষত্রের গভীরে কী ঘটছে সে সম্পর্কে মতামত দিতে, অসম্ভব জটিল সব অংক কষতে তাদের শেখানো হয়। এখানে করণীয় শুধু কম্পিউটারের কাজের ধারা বা প্রোগ্রামটি ঠিক মতো ধরিয়ে দেওয়া। রসায়নেও কম্পিউটারের ব্যবহার ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে। বিশাল সব স্বয়ংক্রিয় কারখানা এখন এরাই চালাতে পারে। অজস্র রকমের রাসায়নিক প্রক্রিয়া হাতেকলমে কাজে লাগানোর আগে কম্পিউটারের সাহায্যে রাসায়নিকরা তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন...

কিন্তু রাসায়নিকদের নিজস্ব একটি 'কম্পিউটার'ও আছে। অবশ্য, এটি একটু অস্বাভাবিক ধরনের। বিশ্বের শব্দসম্ভারে কম্পিউটার শব্দটি চালু হবার বছর শ'য়েক আগেই তা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

বিখ্যাত এই যন্ত্রটি আর কিছু নয়, আমাদের একান্ত পরিচিত মৌলের পর্যায়বৃত্ত।

দুঃসাহসীতম গবেষকরাও একদা যে কাজের ঝুঁকি নিতে নারাজ হতেন, বিজ্ঞানীরা এর সাহায্যে এখন তা সহজেই করতে পারছেন। পর্যায়বৃত্ত থেকে অজ্ঞাত, এমন কি পরীক্ষাগারেও অনাবিষ্কৃত কোন মৌলের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বাভাস লাভ সম্ভব। আর শুধু ভবিষ্যদ্বাণী কেন, এদের গুণাগুণ অবধিও তা থেকে জানা যায়। পর্যায়বৃত্তই আমাদের বলে দেয় যে, ঐ মৌলগুলি ধাতু না অধাতু, সীসকের মতো ভারি না সোডিয়ামের মতো হালকা, কী ধরনের পার্থিব খনিজ আর আকরিকে এদের খুঁজতে হবে, ইত্যাদি। মেন্দেলেয়েভের 'কম্পিউটারে' উপরোক্ত সকল প্রশ্নাবলীরই উত্তর মিলবে।

১৮৭৫ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী পল এমিল লেকক দ্য বুআবদ্রাঁ তাঁর সহকর্মীদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন: প্রায় আধ গ্রাম ওজনের ছোট্ট দানাপ্রমাণ এক নতুন মৌলের অপমিশ্র তিনি দস্তা আকরিকে খুঁজে পেয়েছেন। এই অভিজ্ঞ

গবেষক গ্যালিয়ামের ('নবজাত' মৌলটির নাম) গুণাগুণ পুরোপুরি বর্ণনা করে একটি নিবন্ধ লিখলেন।

কিছুদিন পরে তাঁর কাছে একটি চিঠি এল। খামের উপর সীলমোহর ছিল সেণ্ট পিতার্সবুর্গের। সংক্ষিপ্ত চিঠিটির লেখক এই ফরাসী রাসায়নিকের সঙ্গে পূর্ণ মতৈক্য প্রকাশ করেছেন। অবশ্য একটি ব্যতিক্রম: তার মতে গ্যালিয়ামের আপেক্ষিক ভর ৪·৭ নয়, ৫·৯।

চিঠির শেষে সই ছিল: দ. মেন্দেলেয়েভ।

বুআবদ্রাঁ চিন্তিত হলেন। তবে কি রুশ রসায়নের এই মহাপুরুষ নতুন মৌলটি তাঁর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন?

না। মেন্দেলেয়েভ গ্যালিয়াম হাতে পানই নি। তিনি শুধুমাত্র তার সারণীটির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। গ্যালিয়ামের বর্তমান অবস্থানটি যে একদিন না একদিন কোন এক মৌলে পূর্ণ হবে অনেক আগে থেকেই মেন্দেলেয়েভ তা জানতেন। তিনি তার পূর্বাহ্নিক নামকরণ করেছিলেন একাঅ্যালুমিনিয়াম। পর্যায়বৃত্ত সারণীতে এর প্রতিবেশীদের গুণাগুণ দেখে মৌলটির ধর্ম সম্পর্কেও তিনি নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

সুতরাং, মেন্দেলেয়েভ হলেন রসায়নের প্রথম 'প্রোগ্রামকারী'। তৎকালে অজ্ঞাত প্রায় ডজনখানেক মৌলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি পূর্বাভাস দেন তথা প্রায় সম্পূর্ণভাবে তাদের ধর্ম বর্ণনা করেন। মৌলগুলির নাম: স্ক্যাণ্ডিয়াম, জার্মেনিয়াম, পোলোনিয়াম, অ্যাস্টেটাইন, হ্যাফ্নিয়াম রেনিয়াম, টেক্নেসিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, রেডিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম এবং প্রোট্যাক্টিনিয়াম এদের অধিকাংশই ১৯২৫ সালে আবিষ্কৃত।

'ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে' সাময়িক ব্যাহতি

আমাদের শতাব্দীর বিশের দশকটি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ব্যাপক অগ্রগতিতে সুচিহ্নিত। এই দুই দশকে উক্ত বিজ্ঞানদ্বয়ের অর্জিত সাফল্য মানব ইতিহাসের অতীত সামগ্রিক সাফল্যের প্রায় সমান।

কিন্তু নতুন মৌলের আবিষ্কার হঠাৎ থেমে গেল। অথচ পর্যায়বৃত্ত সারণীতে তখনও ক'টি 'শূন্য' ঘর অপূর্ণ রয়েছে। কক্ষগুলি ৪৩, ৬১, ৮৫ ও ৮৭ নম্বর।

পর্যায়বৃত্ত সারণীতে বসবাসে এমন অসঙ্কোচ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কী ধরনের মৌলের পক্ষে সম্ভব?

প্রথম অচেনা: সপ্তম দলের মৌল, পারমাণবিক সংখ্যা ৪৩, সারণীতে ম্যাঙ্গানিজ ও রেনিয়ামের মধ্যবর্তী। সম্ভবত এদেরই সমধর্মী ম্যাঙ্গানিজ আকরিকেই অন্বেষ্য।

দ্বিতীয় অচেনা: বিরলমৃত্তিক মৌলবর্গের স্যাঙাত, সর্বৈব এদেরই সমধর্মী। পারমাণবিক সংখ্যা ৬১ ।

তৃতীয় অচেনা: হ্যালোজেনদের মধ্যে সবচেয়ে ভারি, আয়োডিনের অগ্রজ। চারিত্র্যে দুর্বল ধাতব প্রবণতার অস্তিত্ব বিধায় তা রাসায়নিকদের কাছে বিস্ময়কর হবার সম্ভাবনা। হ্যালোজেন আর ধাতু! দুমুখো মৌলের কী আশ্চর্য দৃষ্টান্ত! বড় বাড়ির ৮৫ নং ঘরটি এর জন্য অপেক্ষিত।

চতুর্থ অচেনা: মৌলটি কৌতূহলোদ্দীপক! এটি অসম্ভব রাগী, ধাতুরাজ্যে সক্রিয়তম এবং হাতের তাপে গলনক্ষম। ক্ষার ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে ভারি। পারমাণবিক সংখ্যা ৮৭।

এই অচেনাদের বিবরণ বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। শার্লক হোম্‌স সিগারেটের ছাই অথবা জুতোর একটু কাদা থেকে অপরাধীকে সনাক্ত করতে পারতেন। কিন্তু সামান্যতম অচেনা পদার্থ সনাক্তকরণে রাসায়নিকদের সূক্ষ্ম পদ্ধতির তুলনায় তা কিছুই নয়।

চতুর ঐ গোয়েন্দাটির ভাগ্য কখনই তাঁকে বঞ্চনা করে নি। কিন্তু রাসায়নিকদের কপালে তা ঘটে নি। রহস্যময় এই অচেনাদের খুঁজে বের করে তাদের যথাস্থানে রাখার চেষ্টায় রাসায়নিকরা বার বার ব্যর্থ হয়েছেন।

তাদের খোঁজা হয়েছে সিগারেটের ছাইয়ে, গাছপালার ভস্মে, দুষ্প্রাপ্যতম অস্বাভাবিক সব খনিজে, মণিক জাদুঘরের সেরা প্রদর্শনীসম্ভারে, সাগর ও মহাসাগরের জলরাশিতে। কিন্তু বৃথা!

অমীমাংসিত সমস্যাবলীর স্তূপে জমা হল আরও একটি: '৪৩, ৬১, ৮৫ ও ৮৭ নম্বর রাসায়নিক মৌলের রহস্যময় অন্তর্ধান'। পুলিশী পরিভাষায় 'নৈরাশ্যজনক ঘটনা'।

আমাদের গ্রহের সরল পদার্থের তালিকা থেকে ঐ মৌলগুলি অপসারণে প্রকৃতিরও কোন ভূমিকা থাকা সম্ভব। হয়ত এটিও তার অন্যতম উদ্ভট খেয়াল... বস্তুত, তা জাদু বলেই প্রতীয়মান হয়। অথচ বলা হয়, অলৌকিক ঘটনা বলে কিছু নেই। তা হলে বড় বাড়ির চার-চারটি ঘর খালি কেন? তার কোন কারণ তো তখনও জানা ছিল না।

শেষে এগুলিও অবশ্য ভরতি হয়েছিল। তবে কৃত্রিম মৌল সংশ্লেষণে বিজ্ঞানীদের সাফল্যের পর।

মৌল রূপান্তরণ সম্পর্কে

আমাদের চারদিকে সংঘটিত অগণিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার সবক'টিই ইলেকট্রন খোলকের রসায়নের নিয়মাধীন। পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ অথবা গ্রহণ করে, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধানযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। হাজার হাজার পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরমাণু মহাণু তৈরি করতে পারে। কিন্তু এতেও মৌলবিশেষের ধর্মচ্যুতি ঘটে না। কার্বনের যৌগ সংখ্যা বিশ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু হোক তা CO_2 বা যেকোন জটিলতম অ্যাণ্টিবায়োটিক, কার্বন কার্বনই থাকে।

একটি মৌলকে অন্যটিতে রূপান্তরণে এদের নিউক্লিয়াসের পুনর্বিন্যাস ও আধানের পরিবর্তন প্রয়োজন।

রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনে বিজ্ঞানীরা উচ্চ তাপ ও চাপ এবং অনুঘটক ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনুঘটক এমন উপাদান যার অত্যল্প পরিমাণ রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরিত করে।

হাজার হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রা এবং সাধারণ চাপমাত্রার বহু লক্ষগুণ অধিক চাপও পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের পুনর্বিন্যাসে অক্ষম। এভাবে কোন মৌলকে অন্য মৌলে রূপান্তরিত করা যায় না।

কিন্তু নবতর বিজ্ঞান — নিউক্লীয় রসায়নের সাহায্যে তা সম্ভবপর।

নিউক্লীয় রসায়নের 'তাপ ও চাপের' বিকল্প প্রোটন, নিউট্রন, ভারি হাইড্রোজেন আইসোটোপের নিউক্লিয়াস (ডিটেরন), হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস (আল্‌ফা কণা) এবং শেষে মেন্দেলেয়েভ সারণীর লঘুতর মৌল, বোরন, অক্সিজেন, নিয়ন ও আর্গনের আয়নরাশি। বোমা-কণিকার উৎপাদক নিউক্লীয় রিয়েক্টর এবং ত্বরকযন্ত্র (কণিকাসমূহে অভাবনীয় বেগ সঞ্চারক জটিল যন্ত্রপাতি) এর রাসায়নিক সাজসরঞ্জামের অন্তর্ভুক্ত। পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেদের জন্য উচ্চ শক্তিধর কণা-গোলা নিক্ষেপ অপরিহার্য (বিশেষত, তা ধনাত্মক আধানযুক্ত হলে)। বিকর্ষী নিউক্লিয়াসের আধানকে পরাভূত করার এ-ই সহজতর পন্থা। নিউক্লীয় রসায়নের নিজস্ব প্রতীকতন্ত্র সত্ত্বেও এর বিক্রিয়ার সমীকরণগুলি 'প্রচলিত' রাসায়নিক সমীকরণেরই অনুরূপ।

নিউক্লীয় রসায়নেরই বদৌলতে শেষাবধি মেন্দেলেয়েভ সারণীর শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ হয়েছিল।

মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম মৌলের নাম দেওয়া হয় গ্রীক 'টেক্নেটোস' ('কৃত্রিম') শব্দটি থেকে। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি সাইক্লোট্রনে ত্বরিত নিউট্রনপুঞ্জ সবেগে মোলিব্‌ডেনাম পাতে পিষ্ট হল। ছুরি যেমন মাখন কাটে তেমনি ত্বরিত নিউট্রন

ইলেকট্রন খোলক ছিন্ন করে সহজেই নিউক্লিয়াসে পেঁছিল। একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনধারী প্রতিটি ডিটেরন নিউক্লিয়াসকে আঘাত করেই ভেঙ্গে পড়ল। নিউট্রনটি ছিটকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু প্রোটনটি আটকে গেল নিউক্লিয়াসে। ফলত, নিউক্লিয়াসের আধানে একটি একক বৃদ্ধি পেল আর ৪২ নং ঘরের বাসিন্দা মোলিব্‌ডেনাম বদলে গেল তার ডান দিকের ৪৩ নং ঘরের মৌলে।

সাধারণ রসায়নে একটি যৌগই বিবিধভাবে তৈরি করা সম্ভব। নিউক্লীয় রসায়নেও প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য। এখানেও বিবিধ নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় একই কৃত্রিম মৌল উৎপাদন করা যায়।

আমরা বিশ্বের বহু কিলোগ্রাম পরিমাণে টেক্‌নেসিয়াম তৈরির কৌশল আয়ত্ত করলাম বিশ্বের সবচেয়ে আশ্চর্য কারখানাটিতে — নিউক্লীয় রিয়েক্টরে। শ্লথগতি নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে এখানে শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

ইউরেনিয়ামের প্রত্যেক নিউক্লিয়াস দুই ভাগ হয়ে নানা ধরনের টুকরো উৎপাদন করে। টুকরোগুলি হল মেন্দেলেয়েভ সারণীর কেন্দ্রস্থ মৌলগুলির পারমাণবিক নিউক্লিয়াস। ভেঙ্গে পড়া ইউরেনিয়াম থেকে জন্মে পর্যায়বৃত্ত সারণীর ৩০ থেকে ৬৪ নং পর্যন্ত ত্রিশাধিক কক্ষের বাসিন্দা মৌল। টেক্‌নেসিয়াম এবং পৃথিবীতে ইতিপূর্বে বহু চেষ্টায়ও পাওয়া যায় নি এমন আরও একটি মৌলও এগুলির অন্তর্ভুক্ত। ৬১ নং ঘরের বাসিন্দা এই মৌলটির নাম প্রোমেথিয়াম।

নিউক্লীয় রসায়নের বদৌলতে বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়ামের চেয়েও ভারি মৌল হাতে পেলেন। ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভাজনের ফলে উৎপন্ন টুকরোগুলির সঙ্গে বহুসংখ্যক নিউট্রনও থাকে এবং সেগুলি অখণ্ড নিউক্লিয়াসের অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলত, ৯৩, ৯৪, ইত্যাদি পারমাণবিক সংখ্যার মৌলের সংশ্লেষ সম্ভব হল। এগুলি ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল নামে খ্যাত।

পূর্বোক্ত মৌল উৎপাদনের বিবিধ পদ্ধতি এখন নিউক্লীয় রসায়নের করায়ত্ত। অদ্যাবধি ১৪টি ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল সংশ্লেষিত হয়েছে। এগুলি: নেপ্‌চুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, অ্যামিরিসিয়াম, কুরিয়াম, বার্কেলিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়াম, আইন্‌স্টাইনিয়াম, ফার্মিয়াম, মেন্দেলেভিয়াম, লরেন্সিয়াম, কুর্চাতভিয়াম, নিল্‌সবোরিয়াম এবং ১০৬ নং মৌল। শেষোক্ত মৌলটি এবং ১০২ পারমাণবিক সংখ্যার একটি ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলের অবশ্য আজও নামকরণ হয় নি।

বাড়ির নতুন একটি তলার ভিত তৈরি শেষ হবার পরদিনই সব ইট বেমালুম উধাও হয়ে গেলে মিস্ত্রিটির অবস্থা কেমন হবে তা একবার কল্পনা করুন। ভারি ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলের রাসায়নিক গুণাগুণ সন্ধানীরা ঠিক এমনি দুর্ভাগ্যের

শিকার। মৌলগুলি একেবারেই অস্থায়ী। এদের আয়ুকাল মিনিট বা সেকেন্ডে পরিমাপ্য। সাধারণ কোন মৌল নিয়ে কাজ করার সময় রাসায়নিকের সময়ের কোন তাড়া থাকে না। কিন্তু যখনই তিনি পর্যায়বৃত্ত সারণীর ক্ষণজন্মাদের, বিশেষভাবে ভারি ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলে হাতে দেন, তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত তখন 'সোনার চেয়েও দামী'। এখানে পরীক্ষাধীন পদার্থটির ক্ষণস্থায়ীত্বই শুধু নয়, এর অত্যল্প পরিমাণও এক জটিল সমস্যা যা কখনও সত্যিই কয়েকটি পরমাণু মাত্র।

তাই বিশেষ ধরনের গবেষণাপদ্ধতির সাহায্য ছাড়া বিজ্ঞানীরা এখানে নিরুপায়। তাঁরা এখানে রসায়নের নবজাত শাখা তেজরসায়নের নিয়মাধীন। তেজরসায়ন তেজস্ক্রিয় মৌলের রসায়ন।

মৌলরাজ্যের নশ্বর, অবিনশ্বর

এক সময় রাসায়নিকরা অংশত প্রত্নতাত্ত্বিকেরও ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকরা যেমন ব্রোঞ্জ অলঙ্কার বা মাটির পাত্র কত শতাব্দীর পুরানো তা নির্ণয় করেন, তেমনি রাসায়নিকরাও পৃথিবীর বিবিধ খনিজের বয়স জানতে চান।

দেখা গেল, কোন কোন খনিজ ৪৫০ কোটি বছরেরও বেশি পুরানো। কিন্তু খনিজ তো রাসায়নিক যৌগ। এরা মৌল দ্বারা গঠিত। তাই মৌলরা বস্তুত অবিনশ্বর...

মৌলের মৃত্যু জিজ্ঞাসা কি অবান্তর প্রসঙ্গ নয়? মৃত্যু তো জীবেরই করুণ নিয়তি! না, প্রশ্নটি মোটেই অবান্তর নয়, যদিও একনজরে তাই মনে হয়।

তেজস্ক্রিয়তা নামক ভৌত প্রক্রিয়াটির মানে মৌল (ঠিক বলতে গেলে এর নিউক্লিয়াস) স্বতঃক্ষীয়মাণ হতে পারে। কোন কোন নিউক্লিয়াসের গভীর থেকে ইলেকট্রন ক্ষরিত হয়। অন্যরা উদ্গিরণ করে অল্‌ফা কণা (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস)। তৃতীয়গুলি আবার ভেঙ্গে পড়ে প্রায় সমান দুই ভাগে। শেষোক্ত প্রক্রিয়াটিই স্বতঃবিভাজন।

মৌলমাত্রেই কি তেজস্ক্রিয়? না, সবাই নয়। কেবল যেগুলি আছে পর্যায়বৃত্তের শেষের দিকে, শুরু যাদের পোলোনিয়াম থেকে, প্রধানত এরা।

ক্ষয়িত হলেও তেজস্ক্রিয় মৌল একেবারে উবে যায় না। এরা অন্যটিতে রূপান্তরিত হয়। তেজস্ক্রিয় রূপান্তরণের শৃঙ্খলটি কখনও অতি দীর্ঘ।

দৃষ্টান্ত হিসেবে থোরিয়াম ও ইউরেনিয়ামের কথাই ধরা যাক। বদলে বদলে এরা সুস্থির সীস হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ পথে অন্তত ডজনখানেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্ম ও লয় ঘটে।

তেজস্ক্রিয় মৌলের জীবনকালের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। এদের কোন কোনটি পুরো নিশ্চিহ্ন হতে কোটি কোটি বছর প্রয়োজন আবার অন্যগুলির আয়ুকাল মিনিট বা সেকেণ্ডের বেশি নয়। বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় পদার্থের জীবনকাল পরিমাপে বিশেষ ধরনের মান ব্যবহার করেন। তাঁরা একে অর্ধবিভাজনের আয়ুকাল বা কেবল অর্ধায়ু বলেন। এরা এই সময়ে তেজস্ক্রিয় মৌলের পরিমাণই ভরের ঠিক অর্ধেকে খর্বিত হয়।

থোরিয়াম ও ইউরেনিয়ামের অর্ধায়ু কয়েক শ' কোটি বছর।

কিন্তু পর্যায়বৃত্ত সারণীতে এগুলির পূর্ববর্তীদের ব্যাপারটি একেবারে আলাদা। ওখানে আছে প্রোট্যাক্টিনিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম, রেডিয়াম, ফ্রান্সিয়াম, র‍্যাডন, অ্যাস্টেটাইন আর পোলোনিয়াম। এরা অল্পায়ু এবং তা কোন অবস্থায়ই এক লক্ষ বছরের বেশি নয়। ফলত, সৃষ্টি হয়েছে অভাবিত রহস্যের ধূম্রজাল।

আমাদের পৃথিবীর বয়স যেখানে আন্দাজ পাঁচ শ' কোটি বছর, সেখানে কীভাবে অল্পায়ু মৌলেরা আজও টিকে আছে? রেডিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম এবং এদের দলের অন্যান্য মৌলগুলির এক শ' বার জন্মানো আর লয় হবার পক্ষে সময়টি তো যথেষ্ট দীর্ঘ।

অথচ এরা দিব্যি টিকে আছে এবং তা যুগযুগান্তর অবধি ভূগর্ভের খনিজে লুকিয়ে। দেখে মনে হয়, প্রকৃতি যেন 'অমৃত বারি'র প্রভাবে এদের নিশ্চিত অবক্ষয় থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ব্যাপারটি কিন্তু অন্য রকম। আসলে এদের বার বার পুনর্জন্ম হয়। এদের চিরন্তন উৎসমূল পার্থিব ইউরেনিয়াম আর থোরিয়াম সম্ভারেই নিহিত। এই তেজস্ক্রিয় 'পিতৃপুরুষরা' রূপান্তরণের দীর্ঘ ও জটিল পথপরিক্রমায় স্থবির সীসকে পৌঁছার আগে ঐ মধ্যবর্তীদের জন্ম দান করে। তাই, রাসায়নিক পদার্থের দু'টি প্রধান বিভাগ: আদিম ও অন্তর্বর্তী।

সকল অ-তেজস্ক্রিয় মৌল আর পৃথিবীর চেয়েও বয়স্কতর ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম আদিমের দলভুক্ত। তারা সৌরমণ্ডলের জন্মসাক্ষী।

বাকী সবই অন্তর্বর্তীর দলে।

তবু এমন এক সময় আসবে যখন পর্যায়বৃত্তে কয়েকটি মৌলের ঘাটতি দেখা দেবে। এরা অন্তর্বর্তীদের চিরন্তন উৎস — ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম। অবশ্য তাদের চিরন্তনত্ব আপেক্ষিক। সুদূর ভবিষ্যতে, হয়ত কয়েক লক্ষ কোটি বছর পরে এরা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হবে এদের তেজস্ক্রিয় রূপান্তরকালীন উৎপাদগুলিও।

এক, দুই, বহু...

আদিম মানুষ এর বেশি কিছু গণনা করতে পারত না। তাদের গণিতের পরিমাণগত মাত্রা 'অনেক' আর 'অল্প' এই শব্দদুটিতেই সীমিত ছিল।

শ'খানেক বছর আগে আমাদের গ্রহের 'ভাঁড়ারে' মৌলের আলাদা আলাদা পরিমাণ নির্ধারণেও একই শব্দাবলী ব্যবহৃত হত।

সীসক, দস্তা, আর রৌপ্যের কথাই ধরা যাক। তৎকালের বহুলব্যবহৃত এই মৌলগুলির অঢেল প্রাচুর্য ছিল। তাই এগুলির পরিমাণ পর্যাপ্ত বিবেচিত হত। কিন্তু বিরলমৃত্তিক (ল্যান্থেনাইড) বিরলই ছিল। পৃথিবীতে এদের বড় একটা দেখা মিলত না। এদের পরিমাণ খুবই কম।

শতাব্দীকাল আগের এই যুক্তিগুলির সরলতা বারেক লক্ষ্য করুন।

রাসায়নিক মৌলগুলির প্রথম ভাঁড়ারীদের কাজ তখন খুবই সহজ ছিল। তাদের 'কাজকর্ম' দেখে এখন হাসিই পায়।

আর আজ যখন সব কিছুই ঠিক-ঠিক মাপজোখ করা সম্ভব তখন আর না হেসে উপায় কী! কোন মৌলের কত পরমাণু পৃথিবীতে আছে আজ তাও বলা যায় বৈকি। বিরলমৃত্তিক যে সীসক, দস্তা আর রৌপ্যের চেয়ে আমাদের গ্রহে কেবল অল্প কিছু কম তাও এখন নিশ্চিত জানা গেছে।

রাসায়নিক মৌল ভাঁড়ারের যথাযথ 'হিসেব-নিকেশ' শুরু হয় মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক ক্লার্কের একটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব থেকে। উষ্ণমণ্ডল ও তুন্দ্রার খনিজ, দুর্গম অঞ্চলের হ্রদ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের জল নিয়ে তিনি ৫,৫০০টি রাসায়নিক বিশ্লেষণ শেষ করেন। তিনি পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে আনা মাটির নমুনাও পরীক্ষা করেছিলেন।

এই দানবীয় কাজে তাঁর বিশ বছর কেটে যায়। ক্লার্ক ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর গবেষণার কল্যাণে পৃথিবীর ভাঁড়ারে বিভিন্ন মৌলের যথাযথ পরিমাণ মানবজাতি আজ ঠিকই জানতে পেরেছে।

এভাবেই ভূরসায়নের জন্ম। এই বিজ্ঞান থেকে আমরা জানলাম বহু অজানা বিচিত্র কাহিনী।

দেখা গেল, মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রথম ২৬টি প্রতিনিধি — হাইড্রোজেন থেকে লৌহ অবধি মৌল দিয়েই মূলত ভূত্বকটি তৈরি। এদের দখলেই মোট ভরের সিংহভাগ — ৯৯·৭ শতাংশ। আর এক শতাংশের দশ ভাগের তিন ভাগ মাত্র অবশিষ্ট নগণ্য ৬৭টি মৌলের ভাগ্যে।
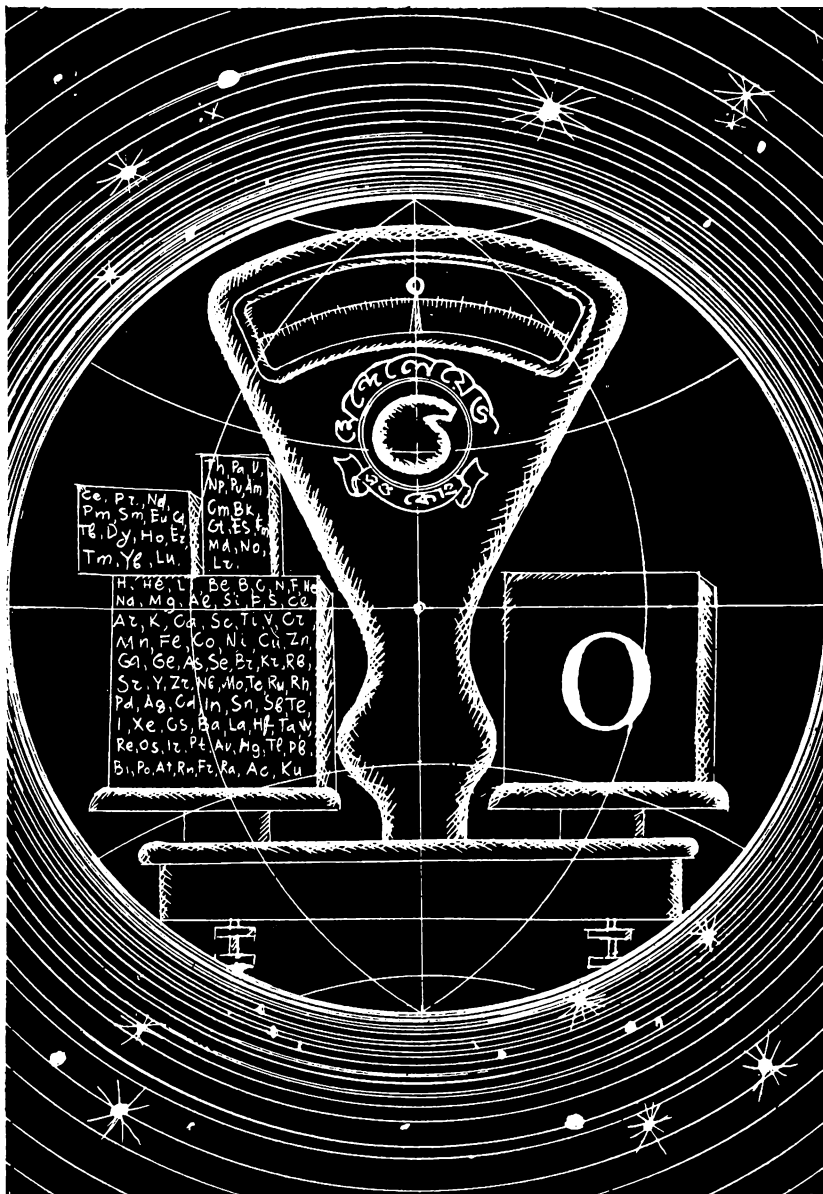
কিন্তু সবচেয়ে বেশি কোনটি?

লোহ নয়, তাম্র নয়, টিনও নয়। অবশ্য মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে এগুলি ব্যবহার করছে, এদের সরবরাহে কোন ঘাটতি নেই, এমন কি এদের অশেষও মনে হত। কিন্তু আসলে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে অক্সিজেন। আমরা যদি কাল্পনিক কোন তৌলের এক পাল্লায় পৃথিবীর সবটুকু অক্সিজেন এবং অন্যটিতে বাকী সব মৌল বোঝাই করি তাহলেই মাপটি প্রায় কাঁটায় কাঁটায় সমান হবে। ভূত্বকের অর্ধেকই অক্সিজেন। অক্সিজেন সর্বগত: জলে, বায়ুমণ্ডলে, বিপুলসংখ্যক পাথরে, সব রকম প্রাণী আর উদ্ভিদে। আর থাকাই শুধু নয়, সর্বত্রই সে নামভূমিকায়।

পৃথিবীর 'খোলকটির' এক-চতুর্থাংশ সিলিকন। অজৈব প্রকৃতির সে ভিত্তিমূল।

প্রাচুর্যের মাত্রানুসারে মৌলগুলির বিন্যাসক্রম: অ্যালুমিনিয়াম ৭·৪; লৌহ ৪·২; ক্যালসিয়াম ৩·৩; সোডিয়াম ২·৪; পটাসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম প্রত্যেকে ২·৩৫; হাইড্রোজেন ১·০ এবং টিটানিয়াম ০·৬ শতাংশ।

এই তো আমাদের গ্রহের দশটি সুলভ রাসায়নিক মৌল।

কিন্তু আমাদের দুর্লভতম মৌল কোনগুলি?

স্বর্ণ, প্ল্যাটিনাম আর প্ল্যাটিনাম ধাতুবর্গ। পরিমাণে এরা খুবই কম আর তাই দামও এদের চড়া।

অথচ কী আশ্চর্য, মানুষ ধাতুর মধ্যে স্বর্ণকেই প্রথম খুঁজে পেয়েছিল। আর এখানেই শেষ নয়। অক্সিজেনের আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল প্ল্যাটিনাম; সিলিকন কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের নাম তখনও শোনাই যায় নি।

বরধাতুবর্গ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা প্রকৃতির মধ্যে যৌগবন্দী হয় না, থাকে অটুট স্বাতন্ত্র্যে আলাদা হয়ে। এতে আকরিক গলানোর ঝামেলা পোহাতে হয় না। তাই অনেক কাল আগেই এদের মাটিতে কুড়িয়ে পাওয়া যেত, সত্যিই পাওয়া যেত।

কিন্তু দুষ্প্রাপ্য হিসেবে এরা 'পয়লা নম্বর' নয়। এই মর্মান্তিক পুরস্কারটি বরং অন্তর্বর্তী তেজস্ক্রিয় মৌলেরই পাওনা।

আলেয়া-মৌল নামেই এদের ডাকা ভাল।

ভূরাসায়নিকদের হিসেব মতো পৃথিবীতে পোলোনিয়ামের মোট পরিমাণ ৯,৬০০ টন, র‍্যাডন কিছুটা কম ২৬০ টন আর অ্যাক্টিনিয়াম আছে ২৬ হাজার টন। এই 'আলেয়া'গুলির মধ্যে রেডিয়াম আর প্রোট্যাক্টিনিয়াম সত্যিই দানবতুল্য। এদের

মোট পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টন, অবশ্য স্বর্ণ বা প্ল্যাটিনামের তুলনায় খুবই সামান্য। অ্যাস্টেটাইন ও ফ্রান্সিয়ামকে আলেয়া বলাও মুশকিল। এদের পরিমাণ নগণ্য। হাস্যকর শোনালেও কিন্তু পৃথিবীর অ্যাস্টেটাইন আর ফ্রান্সিয়াম মাপা হয় সত্যিই মিলিগ্রাম ওজনে।

অ্যাস্টেটাইন পৃথিবীর দুর্লভতম মৌল (সারা ভূত্বকে এর পরিমাণ মাত্র ৬৯ মিলিগ্রাম)। অতঃপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পৃথিবীতে ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত নেপ্চুনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামও আছে। ইউরেনিয়াম ও মুক্ত নিউট্রনের দুর্লভ বিক্রিয়ার ফলেই প্রকৃতিতে এদের উদ্ভব। এই আলেয়ারা শত সহস্র টন পুঁজির 'দেমাক' দেখাতে পারে। কিন্তু প্রোমেথিয়াম ও টেক্নেসিয়াম সম্বন্ধে কি-ই বা বলা যায়? এগুলি ইউরেনিয়ামজাত। ইউরেনিয়াম স্বতঃবিভাজনক্ষম, এর ফলে তার নিউক্লিয়াস প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত হয়। পার্থিব খনিজে বিজ্ঞানীরা বহুকষ্টে টেক্নেসিয়াম ও প্রোমেথিয়ামের দ্রষ্টব্য আভাসই শুধু পেয়েছেন।

প্রকৃতি কি ন্যায়নিষ্ঠ?

বিজ্ঞানীরা দাবি করেন, পৃথিবীর জ্ঞাত সবক'টি রাসায়নিক মৌক যেকোন খনিজেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই যদিও, পরিমাণগত পার্থক্যে আকাশপাতাল ফারাক থাকবে। কিন্তু এখানে একের উচ্ছ্রিত প্রাচুর্য আর অন্যের এই চূড়ান্ত দুর্ভিক্ষ কেন?

পর্যায়বৃত্তে সকল মৌলই সমনাধিকারী। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট স্থানের বাসিন্দা। কিন্তু পৃথিবীর ভাঁড়ারে এদের মজুদ খোঁজ করলেই বিপত্তি, সমানাধিকারটি তখন একেবারে হাওয়া।

মেন্দেলেয়েভ সারণীর হালকা মৌলগুলি, আপাততঃ এর প্রথম দিকের ত্রিশটি প্রতিনিধিই মোটামুটি ভূত্বকের প্রধান অংশের নির্মাতা। কিন্তু সেখানে সাম্যের কোন বালাই নেই। কেউ অঢেল, কেউ-বা মাগ্গা। বোরন, বেরিলিয়াম ও স্ক্যাণ্ডিয়ামের কথাই ধরা যাক। ওগুলি দুষ্প্রাপ্যের দলে।

জন্মের পর পৃথিবীর মৌলভাঁড়ারে কিছু 'রদবদল' ঘটেছে। তেজস্ক্রিয়তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম উধাও হয়ে গেছে। বর-গ্যাসবর্গের অনেকটা আর হাইড্রোজেন মহাশূন্যে বিলীন। তবু সাধারণ অবস্থার তেমন কিছু রদবদল ঘটে নি।

ইদানিং কালের বিজ্ঞানীদের মতে ভূত্বকের রাসায়নিক মৌলগুলির প্রাচুর্য হালকা থেকে মধ্যম ভারি এবং ভারি এই ক্রমপর্যায়ে নিয়মিত খর্বিত হচ্ছে। কিন্তু নিয়মটি সর্বদা সমভাবে প্রযুক্ত নয়। যেমন সীসক। মেন্দেলেয়েভ সারণীর বহু হালকা মৌল অপেক্ষা পৃথিবীর ভাঁড়ারে এর পরিমাণ অনেক বেশি।

কিন্তু কেন? সবার মজুদ সমান নয় কেন? মৌল 'মজুদের' ক্ষেত্রে প্রকৃতি কি পক্ষপাতিত্বের দোষে দোষী নয়?

না, তা নয়। মৌলের প্রাচুর্য ও দুষ্প্রাপ্যতা একটি নির্দিষ্ট নিয়মেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। সত্যি কথা বলতে কি, নিয়মটি আজও অজানা। আমরা আপাতত অনুমান ছাড়া নিরুপায়।

দেখুন, রাসায়নিক মৌলগুলি একেবারে আদ্যিকালের জিনিস নয়। বিশ্বলোকের বিশেষ সংযুতির নিয়মেই এর বিভিন্ন অংশে মৌলগুলির গঠন বা সংশ্লেষের যে বিপুল প্রকরণ অব্যাহত রয়েছে এর ব্যাপকতা তুলনাবিহীন। তারকাই মহাজাগতিক নিউক্লীয় রিয়েক্টার, মহাজাগতিক ত্বরণযন্ত্র। তাদেরই কোন কোনটির গভীরে মৌলবর্গের 'রন্ধনক্রিয়া' নিরন্তর অব্যাহত।

ওখানকার তাপমাত্রা অশ্রুতপূর্ব, চাপ অকল্পনীয়। অবশ্য, তা নিউক্লীয় রসায়নের মূল নিয়মেরই অধীন এবং তদনুসারেই নিউক্লীয় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক মৌল অন্য মৌলে, হালকা মৌল ভারি মৌলে রূপান্তরিত হয়। এই নিয়মে কোন কোন মৌল সহজে এবং অধিক পরিমাণে, অন্যরা বহু প্রতিবন্ধ পার হয়ে এবং স্বভাবতই অল্প মাত্রায় তৈরি হয়।

সবকিছুই আসলে বিভিন্ন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্বের উপর নির্ভরশীল। বিষয়টি সম্পর্কে নিউক্লীয় রসায়নের মতামত অতি স্পষ্ট। হালকা মৌলের আইসোটোপের নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা প্রায় সমান। এখানে মৌলিক কণিকা সুস্থিত সংযুতি গঠনে সক্ষম। তাই হালকা নিউক্লিয়াস সংশ্লেষ সহজতর। সাধারণত, সম্ভাব্য সর্বাধিক সুস্থিত তন্ত্র সৃষ্টিতেই প্রকৃতি সচেষ্ট। এদের সংশ্লেষ সহজতর হলেও, বৃহৎ আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস গঠনের বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণে এরা অনাগ্রহী। শেষোক্তদের নিউক্লিয়াসে প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি, তাই মধ্যম ও ভারি মৌলের নিউক্লিয়াসের সুস্থিতি মাত্রা মোটেই দৃষ্টান্তস্থানীয় নয়। তারা অধিকতর দৈবাধীন, পরিবর্তনপ্রবণ এবং তাই অধিক মাত্রায় সঞ্চয়ী নয়।

যে নিউক্লিয়াসের আধান যত বেশি, তার সংশ্লেষ তত জটিল এবং তার উৎপাদনও কম। নিয়মটি নিউক্লীয় রসায়নের।

আমাদের পৃথিবীর রাসায়নিক সংস্থিতি যেন মৌলের গঠনপ্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক গতিশীল নিয়মের মৌন প্রতিফলন, নিষ্প্রাণ প্রতিলিপি। বিজ্ঞানীরা নিয়মটি পুরোপুরি জানলেই শুধু বিভিন্ন মৌলের প্রাচুর্যগত এই ব্যাপক বৈষাদৃশ্যের কারণটি বোঝা সম্ভব হবে।

অলীক সূর্যের পথরেখায়

গত শতাব্দীর আশির দশকে এক রাসায়নিক সাময়িকীতে এক অদ্ভুত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানজগতে প্রায় অপরিচিত লেখকটি এতে একই সঙ্গে দু-দুটি নতুন মৌল আবিষ্কার ঘোষণা করেন। তিনি এদের গালভরা নাম দিয়েছিলেন: কজ্মিয়াম ও নিয়োকজ্মিয়াম। নতুন মৌল আবিষ্কার তখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অনেক গবেষকই 'নবজাতকদের' নামকরণের ঝামেলা এড়িয়ে ওদের গ্রীক বর্ণমালার অক্ষরে চিহ্নিত করতেন।

অচিরেই বোঝা গেল ঘটনাটি কৌতুকমাত্র। কজ্মিয়াম ও নিয়োকজ্মিয়ামের 'আবিষ্কারক' আবিষ্কারের হিড়িককে ব্যঙ্গ করেছেন। প্রবন্ধটি এপ্রিল-ফুল জাতীয় ব্যাপার। লেখক কজ্ম্যান।

মেন্দেলেয়েভ সারণীতে মৌলসংখ্যা ১০৬। ১০৬টি মৌলের যথার্থ আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। তা ছাড়া আবিষ্কারের আরও একটি তালিকাও আছে। ওটি দীর্ঘতর, কয়েক শ' নাম এর অন্তর্ভুক্ত। মৃতজাত মৌলদের ঐ 'চার্চ ক্যালেণ্ডারটি' হিড়িক, পরীক্ষার ভুলভ্রান্তি এবং ক্ষেত্রবিশেষে গবেষকের ডাহা অসতর্কতার ফসল।

নতুন মৌল আবিষ্কারের দীর্ঘ পন্থাটি পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর। কণ্টকিত এ যাত্রাপথ অরণ্যসংকুল, গুহাগারিবর্তের এক গোলকধাঁধা। কিন্তু এরই পাশে আরও একটি পথ আছে, তা বাঁধানো। পথটি অলীক সূর্যের, ভুয়া রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারের।

আর ঐ পথটি উদ্ভট ঘটনা আর অজস্র স্ববিরোধিতায় পঙ্কিল! এখানে কজ্ম্যানের ব্যাপারটি সত্যিই সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ।

ক্রুক্স নামক জনৈক ব্রিটিশ ইট্রিয়াম থেকে এক দঙ্গল নতুন সরল রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করলেন। তিনি তাদের নাম দিলেন অধিমৌল। অথচ ওগুলি ছিল বহুজ্ঞাত মৌলের মিশ্রণমাত্র।

প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ফ্রীহ্যাণ্ডের নাম স্মরণীয়। তিনি মরুসাগরের নিথর জলে ৮৫ ও ৮৭ নম্বর মৌলের 'শিকারসন্ধানে' এক ব্যর্থ অভিযান পরিচালনা করেন।

কিংবা ধরা যাক মার্কিন নাগরিক অ্যালিসনের কথা। আয়োডিন আর সিজিয়ামের সমবৃত্তীয় ভারি মৌল একেবারে হঠাৎ তিনি যত্রতত্র খুঁজে পাচ্ছিলেন। অথচ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিমধ্যে এদের অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয়ে বৃথাই তখন হয়রান। তিনি এদের হরেক রকম দ্রবণ আর খনিজে আবিষ্কার করেছিলেন স্বকীয় পদ্ধতিতে। দেখা গেল পদ্ধতিটি ভুল। ক্লান্ত বিশ্লেষকের চোখে বিভ্রান্তি ছায়া ফেলেছিল।

এমন কি মহাপণ্ডিতরাও অলীক সূর্য সন্ধানের মোহ এড়াতে পারেন নি। ইতালির ফার্মি মনে করতেন যে, ইউরেনিয়ামের উপর নিউট্রনের আঘাতে একই সঙ্গে কয়েকটি ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল উদ্ভূত হয়। অথচ এগুলি ছিল ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গা টুকরো — পর্যায়বৃত্তের মধ্যমাণ্ডলীয় মৌল।

সেই কুটিল পথরেখাটি আজও নিশ্চিহ্ন নয়। ১৯৫৭ সালে স্টকহোল্মের এক দল বিজ্ঞানী ১০২ নম্বর এক নতুন মৌল সংশ্লেষ করেন। ডিনামাইট আবিষ্কারক নোবেলের সম্মানে এর নাম রাখা হল নোবেলিয়াম। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা একে প্রত্যাখ্যান করলেন। বিজ্ঞানীরা এখন তামাশা করে বলেন, নোবেলিয়ামের আর কিছুই নেই, আছে শুধু 'No'। যা হোক সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা ১০২ নং মৌলের প্রামাণ্য আইসোটোপ পেয়েছেন, তবে ভিন্ন পন্থায়।

সক্রিয়তম ধাতু

সত্যিই, ধাতুটি 'সর্বভুক' ফ্লোরিনের এক স্বকীয় বিকল্প এবং মেন্দেলেয়েভ সারণীর অপর 'রাসায়নিক মেরু'তে অবস্থিত। ফ্লোরিন সক্রিয়তম অধাতু এবং রাসায়নিক সক্রিয়তার বিচারে পরিচিত ধাতুরাজ্যে ফ্রান্সিয়াম তুলনাহীন।

কিন্তু ফ্রান্সিয়াম কেবল রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যেই আশ্চর্য নয়। এর জীবনীটাও অসাধারণ, খানিকটা যেন ডিটেক্টিভ গল্পের মতো। পার্থিব খনিজে এর পরিমাণ এতই কম যে 'বিরল' বিশেষণটিও এর পরিমাণ ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। ফ্রান্সিয়াম আমাদের গ্রহের বিরলতম ধাতু। প্রাকৃতিক ফ্রান্সিয়াম নিষ্কাশনের খরচ হয়ত কৃত্রিম ফ্রান্সিয়ামের চেয়েও বেশি হবে।

শতাব্দীকাল আগে এর নাম ছিল একাসিজিয়াম। মেন্দেলেয়েভ এ নামেই তার অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। কয়েক বছর কাটল। মহান রুশ রাসায়নিকের দেয়া ধাতুর পূর্বাভাস অনুযায়ী কালক্রমে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়। এগুলি দিয়ে পর্যায়বৃত্ত সারণীর শূন্য ঘর পূরণ করা হল। কিন্তু ৮৭ নং ঘরটি তখনও ফাঁকা। আত্মগোপনে

একাসিজিয়ামের এমন বেয়াড়া জেদের কারণ খুঁজে খুঁজে সব বিজ্ঞানী বৃথাই হয়রান।

তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হবার পরই শুধু ঘটনাটির ব্যাখ্যা মিলল। বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা ছিল এরূপ: সারণীতে নিজ তেজস্ক্রিয় পড়শীদের মতো একাসিজিয়ামেরও তো তেজস্ক্রিয় হওয়াই উচিত। উপরন্তু তেজস্ক্রিয়তার প্রবল মাত্রানুসারে এর আয়ুকালও খুবই কম হওয়াই নিয়মসিদ্ধ। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন সেজন্য প্রকৃতিতে ৮৭ নং ধাতু খোঁজা একেবারেই নিরর্থক। বহুকাল আগেই ধাতুটি পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোন স্মরণাতীত যুগেই তা অন্য দীর্ঘজীবী ধাতুতে রূপবদল করেছে।

তবুও সুস্পষ্ট এই বাহ্যিক ব্যাখ্যা সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন জাগাল: কেনই-বা একাসিজিয়াম ঐ পোলোনিয়াম ও র‍্যাডন, রেডিয়াম ও অ্যাক্টিনিয়ামের তুলনায় স্বল্পায়ু? কেনই-বা প্রকৃতি সবচেয়ে ভারি ক্ষারধাতুটিকে এত জীবনীশক্তিহীন করেছে?

এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন জবাব ছিল না। এল ১৯১৩—১৯১৪ সাল। পদার্থবিদ ও রাসায়নিকরা ৩০টিরও বেশি তেজস্ক্রিয় ধাতু আবিষ্কার করলেন। এবার এই জটিল সমস্যাদির বিশদ বিচার-বিবেচনার সময় হল। এসব ধাতুকে তিনটি তেজস্ক্রিয় পরিবারে দলবদ্ধ করা হল: ট্রান্সইউরেনিয়াম, ট্রান্সথোরিয়াম ও অ্যাক্টিনাইড। কিন্তু এর কোনটিতেই একাসিজিয়াম আইসোটোপের জন্য এতটুকু ঠাঁই মিলল না।

এখন দেখা দিল এক নতুন ভাবনা: পৃথিবীর আশ্চর্য হেঁয়ালিতে ৮৭ নং ধাতুটি হয়ত তেজস্ক্রিয় হয় নি। অর্থাৎ, নগণ্যতম পরিমাণে হলেও পৃথিবীতে তা আছেই। ফলত, বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলিতে মাঝে মাঝে একাসিজিয়াম প্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে ছোট ছোট নিবন্ধ বেরুতে লাগল। কিন্তু হায়, শীঘ্রই সে রকম ছোট ছোট প্রবন্ধেই এর যুক্তিসঙ্গত এবং চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানও দেখা দিল।

মরুসাগরের উপকূলে ফ্রীহ্যান্ডের অভিযাত্রী দলের কথা স্মরণ করা যাক। এর জলে গলিত ক্ষারের ঘনত্ব সর্বাধিক। এটা এর অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং ক্লোরাইড ও সালফেট ক্ষারের বেলায় অত্যন্ত সহজলক্ষ্য। ফ্রীহ্যান্ড মনে মনে আশা করতেন যে, মরুসাগরের জলরাশি রহস্যময় একাসিজিয়ামের বিপুল ভাঁড়ার হতে পারে। কিন্তু কয়েক শ' টেস্ট-টিউবেও বিজ্ঞানী ধাতুটির কোনো আভাস পেলেন না।

ত্রিশের দশকের শুরুতে মার্কিন পদার্থবিদ এ. অ্যালিসনের রচনা বিজ্ঞানজগতে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর ধারণা তিনি নীতিগতভাবে রাসায়নিক

সংশ্লেষের নতুন ও অত্যন্ত সুবেদী পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এবং এর বদৌলতেই একাসিজিয়াম সমস্যার সমাধান হল। অজানা ধাতুটি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। মেন্দেলেয়েভ সারণীর ৮৭ নং ঘরে দেখা দিল এক নতুন ধাতুপ্রতীক — Vi। অ্যালিসন এর নামকরণ করলেন 'ভার্জিনিয়াম'। এবং কিছুদিন পরে জানা গেল, ভার্জিনিয়াম নিছক কল্পনার খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

পর্যায়বৃত্ত সারণীর সর্বাধিক আকর্ষী ও আশ্চর্যতম এই ধাতু গবেষণায় রাসায়নিকদের আনন্দভোগ আসলে অকালপক্ক ছিল...

একাসিজিয়াম, এই হতভাগ্য ৮৭ নং ধাতুটি, শেষে রহস্যই রয়ে গেল। আর কালক্রমে তার যে নামান্তর ঘটেছিল — তাও আবার আলেয়ারই নাম।

মার্গারেট পেরের বিরাট সাফল্য

মহিলাজগতের প্রতিনিধিরা মাত্র দু'টি বারই নতুন রাসায়নিক মৌল আবিষ্কারের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

প্রথম বার, ১৮৯৮ সালে, ফ্রান্সে মারিয়া কুরি দু'টি নতুন তেজস্ক্রিয় ধাতু, — পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। তবুও এখানে সহ-আবিষ্কারক ছিলেন দু'জন পুরুষ: মারিয়ার স্বামী পিয়ের কুরি ও গবেষণাগারের তরুণ কর্মী জর্জ বেমোঁ।

দ্বিতীয় বার এই শতকের বিশের দশকে এমন সৌভাগ্যবতী হন জার্মান মহিলা গবেষক ইডা নডাক। এবারও মেন্দেলেয়েভ সারণীর ৭৫ নং ঘরের পূরক নতুন রাসায়নিক মৌলের আবিষ্কারটি ছিল পারিবারিক কাজ। রেনিয়াম আবিষ্কারে ইডার স্বামী ভাল্টার নডাকও সম-অবদানের দাবীদার।

প্যারিসে কুরির গবেষণাগারের তরুণ কর্মী মার্গারেট পেরে নিজ আবিষ্কারের সম্মান কারও সঙ্গে ভাগ করেন নি। ইনি এককভাবেই নতুন একটি মৌলের আবিষ্কারক, আর এটি সেই ৮৭ নং রহস্যময় মৌলটি। এর ঘটনাকাল: ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী।

ধাতুটির নাম দেন তিনি ফ্রান্সিয়াম।

পেরে কী করে শেষে এই অধরা মৌলটিকে ধরলেন? গল্পটি শুরু করতে হলে কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়ার তিনজন তেজরাসায়নিক এস. মায়ার, জি. হেস এবং এফ. পানেট ২২৭ ভর অ্যাক্টিনিয়াম মৌলের

একটি আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। জানা ছিল যে, তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের সময় তা ইলেকট্রন হারায় এবং ফলত, থোরিয়ামের আইসোটোপে রূপান্তরিত হয়। বিজ্ঞানীদের মনে এক অস্পষ্ট চিন্তা হঠাৎ চকিত হল: তবে কি অ্যাক্টিনিয়াম-২২৭ বিরল ক্ষেত্রে আলফা রশ্মিও হারায়। তা হলে তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের ফল হওয়া উচিত ৮৭ নং ধাতুর আইসোটোপ। মাইয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা সত্যি সত্যিই আলফা রশ্মি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। অতঃপর দরকার ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তাতে বাধ সাধল।

মার্গারেট পেরেও সে পথেরই পথিক ছিলেন। তবে তাঁর দখলে ছিল অধিকতর সুবেদী মাপযন্ত্র, বিশ্লেষণের নতুন, নিখুঁততর পদ্ধতি। তাই তো তিনি সফল হলেন।

অনেক সময় ফ্রান্সিয়ামকে কৃত্রিম সংশ্লেষিত মৌলগুলির দলভুক্ত করা হয়। কিন্তু এই ধারণা কি ত্রুটিহীন নয়? যা হোক না কেন, প্রথমবার মৌলটি পাওয়া গেল প্রাকৃতিক অবস্থায় স্বাভাবিক একটি তেজস্ক্রিয় খনিজ থেকে। এটি ছিল ফ্রান্সিয়াম-২২৩ আইসোটোপ, এর অর্ধভাঙ্গনের কালপর্ব মাত্র ২২টি মিনিট। সেজন্য পৃথিবীতে ফ্রান্সিয়ামের পরিমাণ এত কম। প্রথমত, স্বল্পায়ুর জন্য অল্পবিস্তর লক্ষণীয় পরিমাণে তা সঞ্চিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, এ যেন বড় অনিচ্ছায় অ্যাক্টিনিয়াম-২২৭ থেকে উদ্ভূত হয়: অ্যাক্টিনিয়াম পরমাণুগুলির ১ শতাংশের সামান্য বেশিই শুধু আলফা রশ্মিতে ভাঙ্গে। তাই কোনটির খরচ কম? কৃত্রিমভাবে ফ্রান্সিয়াম তৈরি করা, না প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে নিষ্কাশন করা? বলা কঠিন।

মার্গারেট পেরের এই 'সন্তানটি' অনেক দিক থেকে সিজিয়ামের সদৃশ ছিল। রাসায়নিকরা তার সপক্ষে বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, যদিও ফ্রান্সিয়ামের লবণ খুবই দুর্লভ।

ফ্রান্সিয়াম ধাতুর সামান্যতম টুকুরোটিও হাতে ধরার সৌভাগ্য আজও কারও হয় নি। অল্পবিস্তর অনুভব্য পরিমাণে এই ৮৭ নং ধাতুটি তৈরির পদ্ধতি কোনোদিন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারবেন কি না, কেউ জানে না। সুতরাং, পরোক্ষভাবে, এমন কি তাত্ত্বিক হিসেব-নিকেশের মাধ্যমেই মৌলটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নিশ্চয়োক্তি করা যায় যে, পারদ ছাড়া ফ্রান্সিয়ামই সবচেয়ে কম তাপমাত্রায় গলে। এর গলন তাপমাত্রা এখনও নির্দিষ্ট হয় নি: একটি সূত্র অনুযায়ী মাত্রাটি ২০ ডিগ্রির সমান, অন্য তথ্যমতো তা সর্বনিম্ন ৮ ডিগ্রি। হয়ত কক্ষতাপে ফ্রান্সিয়ামকে তরল দেখাত, তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গনের ফলে তা জলের মতো ফুটত আর অন্ধকারে জ্বলজ্বল করত। খোলা হাওয়ায় এমন তরল পদার্থ রাখা কেবল যে নিরর্থকই হত তা নয়, এতে বিপদও ঘটত।

ক্ষারধাতুগুলির মধ্যে ফ্রান্সিয়ামের পরমাণু সর্বাধিক পারমাণবিক ব্যাসার্ধের অধিকারী এবং সহজেই সে তার একমাত্র যোজী ইলেকট্রনকে বিদায় দিতে পারে। এতেই ফ্রান্সিয়ামের অত্যুচ্চ রাসায়নিক তৎপরতার কারণ নিহিত।

মানুষের ব্যবহারিক কার্যকলাপে প্রায় প্রত্যেক ধাতুই কোন না কোন ভূমিকা পালন করে। ফ্রান্সিয়াম সম্বন্ধে আজ শুধু ভবিষ্যকালের ভিত্তিতেই কথা বলা চলে। এখন এর তেজস্ক্রিয় বৈশিষ্ট্যটিই মাত্র কাজে লাগছে। অন্যান্য গুণের সদ্ব্যবহার করা যাবে কি না, এখনই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।

৯২ নম্বরের ভাগ্য

গল্পটি এক রাসায়নিক মৌল নিয়ে।

এর ঠিকানা ৯২ নং ঘর, নাম ইউরেনিয়াম।

নামেই তার গুরুত্ব চিহ্নিত। ইউরেনিয়াম আবিষ্কারের সঙ্গে সর্বকালের, সর্বজনের বৃহত্তম দু'টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যুক্ত। এগুলো: তেজস্ক্রিয়তা এবং নিউট্রন দ্বারা ভারি নিউক্লিয়াস বিভাজন। ইউরেনিয়াম থেকেই মানুষ আণবিক শক্তির চাবিকাঠির নাগাল পেল। এরই সাহায্যে তারা প্রকৃতিবহির্ভূত মৌল উৎপাদন করল: ট্রান্সইউরেনিয়াম, টেক্‌নেসিয়াম ও প্রোমেথিয়াম।

ঐতিহাসিক দলিলপত্র অনুযায়ী ইউরেনিয়ামের জন্ম ১৭৮৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর।

রাসায়নিক মৌল আবিষ্কারের ইতিহাসে কত ঘটনাই না ঘটেছে। এদের অনেকগুলিরই আবিষ্কারক আজও অজ্ঞাত। আবার এমন মৌলও আছে যার 'আবিষ্কারকদের' তালিকাটি বেশ দীর্ঘ। কিন্তু ইউরেনিয়ামের 'ধর্মপিতার' নাম নিয়ে অবশ্য কোন সংশয় নেই। তিনি বিশ্লেষ রসায়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বার্লিনের রাসায়নিক মার্টিন হাইনরিখ ক্লাপ্‌রথ। কিন্তু ইতিহাস তাঁকে নিয়ে কৌতুক করল: মার্টিন ক্লাপ্‌রথ হলেন আমাদের গল্পের নায়কের একক নয়, অন্যতম 'ধর্মপিতা'।

দস্তা ও লোহার আকরিক হিসেবে পিচ্‌ব্লেন্ডের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বহুযুগের। মিশ্রণটিতে আরও একটি অজ্ঞাত ধাতুর সন্দেহজনক অস্তিত্ব বিশ্লেষক ক্লাপ্‌রথের তীক্ষ্ন চোখে ধরা পড়ল। অচিরেই সন্দেহটি সত্য হয়ে উঠল। নতুন ধাতুটি ছিল কালো, ধাতব ঔজ্জ্বল্যে চকচকে চূর্ণবিশেষ। তখন ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদ হার্শেল সবেমাত্র ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার করেছেন। ধাতুটি তারই স্মরণিকা।

তারপর অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেল। ক্লাপ্রথের আবিষ্কারের সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠল না। ইউরোপের অন্যতম প্রাগ্রসর এই বিশ্লেষী রাসায়নিকের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সাহস কারও ছিল না। রাসায়নিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে দিয়ে ইউরেনিয়ামের জয়রথ নির্দ্বিধায় এগিয়ে চলল।

১৮৪৩ সালে ফরাসী রাসায়নিক এজেঁ পেলিগো এই জয়যাত্রার গতি মন্দীভূত করেন। তিনি প্রমাণ করলেন যে, ক্লাপ্রথের জিনিসটি মৌল ইউরেনিয়াম নয়, ইউরেনিয়াম অক্সাইড। অগত্যা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা পেলিগোকে মৌলটির দ্বিতীয় 'ধর্মপিতার' সম্মান দেবার সুপারিশ করলেন।

কিন্তু ইউরেনিয়ামের 'ধর্মপিতাদের' তালিকাটির এখানেই শেষ নয়। এতে তৃতীয় জনের নাম দ. মেন্দেলেয়েভ।

প্রথমে ইউরেনিয়ামকে সারণীতে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব হয় নি। তৃতীয় দলে ক্যাডমিয়াম আর টিনের মাঝখানে ইণ্ডিয়ামের বর্তমান ঘরেই তখন তাকে রাখা হয়েছিল। জায়গাটি তার জন্য বরাদ্দ হল পারমাণবিক ভরের ভিত্তিতে, গুণাগুণের জন্য নয়। তাই স্বভাবের নিরিখে ইউরেনিয়াম রইল সে ঘরে আকস্মিক, সহসা আগন্তুক হয়ে।

মেন্দেলেয়েভের মনে হল ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ভর সঠিক নির্ধারিত হয় নি। তিনি তা দেড় গুণ বাড়ালেন। ফলত, তার জায়গা হল সারণীর চতুর্থ দলে, আনুষঙ্গিক মৌলের সবার শেষে। ইউরেনিয়ামের এই হল তৃতীয় 'জন্ম'।

পরীক্ষায় অচিরেই মেন্দেলেয়েভের অভ্রান্ততা সত্যায়িত হল।

অবশেষে ইউরেনিয়ামের জীবনবৃত্তান্তে সমাপ্তি টানলেন ফরাসী রাসায়নিক আঁরি মুয়াসাঁ। ১৮৮৬ সালে তিনিই প্রথম ধাতুটির বিশুদ্ধ নমুনা খুঁজে পান।

ইউরেনিয়াম, কোথায় তোর ঘর?

মেন্দেলেয়েভ পর্যায়বৃত্তে কোন মৌলই একেবারে গৃহহীন নয়। অবশ্য, ওখানে এমন মৌলও আছে যার আবাস অনির্দিষ্ট। হাইড্রোজেনই এর সেরা নজির। ১ নং এই মৌলটিকে প্রথম কিংবা সপ্তম দলে রাখা হবে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন।

ইউরেনিয়ামের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম।

কিন্তু মেন্দেলেয়েভ কি চিরদিনের জন্য তার অবস্থান নির্ণয় করেন নি?

তার জায়গা হয়েছিল পর্যায়বৃত্ত সারণীর ষষ্ঠ দলের ধাতুবর্গে — ক্রোমিয়াম, মোলিবডেনাম ও ট্যাংস্টেনের সর্বাধিক গুরুভার তাই বলে। বহু দশক তা নিয়ে কোন আপত্তি ওঠে নি। মনে হয়েছিল ওর স্থানটির আর কোন রদবদল হবে না।

কিন্তু সময় এগিয়ে চলল, ইউরেনিয়ামও আর মৌল তালিকার শেষতমটি থাকল না। তার ডান পাশে ভিড় জমাল মানুষের তৈরি পুরো একদঙ্গল ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল। অথচ মেন্দেলেয়েভ সারণীতে এদের ঠাঁই হওয়া দরকার। ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলদের এখন কোন দলে, কোন ঘরে রাখা হবে? যথেষ্ট বাদানুবাদের পর ঠিক হল এরা থাকবে একটি দলে, একই ঘরে। সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন বহু বিজ্ঞানী।

সিদ্ধান্তটি আকাশ থেকে আচমকা পড়ে নি। পর্যায়বৃত্তে আগেও এমনটি ঘটেছে। ল্যান্থেনাইড তো সব মিলিয়ে ১৪টি। ষষ্ঠ পর্যায়ের এই মৌলগুলি তৃতীয় দলে ল্যান্থেনামের সঙ্গে একই ঘরেই তো দিব্যি রয়েছে।

পদার্থবিদরা অনেক আগেই পরবর্তী পর্যায়ে ঘটনাটির সম্ভাব্য পুনরাবৃত্তির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। তাঁদের মতে সপ্তম পর্যায়ে ল্যান্থেনাইডের ঘনিষ্ঠ অন্যতর এক মৌলগোষ্ঠীর অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। গোষ্ঠীটির নাম হওয়া উচিত অ্যাক্টিনাইড, কারণ সারণীতে ল্যান্থেনামের ঠিক নীচেই অ্যাক্টিনিয়াম রয়েছে, আর ওরা থাকবে ঠিক তার পর থেকেই।

সুতরাং, সকল ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলই এই গোষ্ঠী-পরিবারের সদস্য। আর কেবল ওরাই নয়, ইউরেনিয়াম এবং তার বামদিকের নিকটতম প্রতিবেশী প্রোট্যাক্টিনিয়াম আর থোরিয়ামও এদের দলভুক্ত। ষষ্ঠ, পঞ্চম ও চতুর্থ দলের প্রাচীন প্রিয় স্থানগুলি ছেড়ে তারা সকলে শেষে তৃতীয় দলে যোগ দিতে বাধ্য হল।

প্রায় শতবর্ষ আগে মেন্দেলেয়েভ ইউরেনিয়ামকে এই দল থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আবার সে ওখানেই ফিরে এল, কিন্তু 'পূর্ণতর অধিকারে'। তাহলে দেখুন, পর্যায়বৃত্তের জীবনে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে।

পদার্থবিদরা একমত হলেও সকল রাসায়নিক এতে খুশি হন নি। গুণাগুণের বিচারে তৃতীয় দলে থেকেও ইউরেনিয়াম মেন্দেলেয়েভের কালের মতো আজও অভ্যাগতপ্রায়। তা ছাড়া থোরিয়াম আর প্রোট্যাক্টিনিয়ামের জন্যও তৃতীয় দলটি তেমন সুবিধের হয় নি।

ইউরেনিয়াম, কোথায় তোর ঘর? বিজ্ঞানীসমাজে সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত।

প্রত্নতত্ত্বের দু-একটি কাহিনী

লোহের ব্যবহার কখন শুরু হয়েছে? উত্তরটি স্বতঃসিদ্ধ: যখন আকরিক থেকে মানুষ লোহ গলাতে শিখেছে। ঐতিহাসিকরা সভ্যতার মহালগ্ন 'লোহযুগ' শুরুর মোটামুটি একটা দিনক্ষণও ঠিক করেছেন।

আদিম ধাতুবিদদের হাতে আদিম বদ্ধচুল্লিতে লোহের প্রথম কিলোগ্রামটি উৎপন্ন হবার আগেই কিন্তু লোহযুগ শুরু হয়েছিল। সিদ্ধান্তটি রাসায়নিকদের, আর তাঁরা বিশ্লেষণপদ্ধতির শক্তিশালী হাতিয়ারে বলীয়ান।

আমাদের পূর্বসূরীদের ব্যবহৃত প্রথম লোহার টুকরোটি সত্যি সত্যি আকাশ ফুঁড়ে পড়েছিল। যাকে আমরা লোহ উল্কা বলি, তাতে লোহ ছাড়াও থাকে নিকেল আর কোবাল্ট। লোহের আদিতম কোন কোন হাতিয়ার পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা সেখানে মেন্দেলেয়েভ সারণীস্থ লোহের প্রতিবেশী কোবাল্ট ও নিকেল পেয়েছেন।

অথচ পৃথিবীর লোহ-আকরিকে ধাতুদু'টি মোটেই সুলভ নয়।

সিদ্ধান্তটি কি প্রশ্নাতীত? ষোলো আনা নয়, তবু...। প্রাচীন যুগের নিরীক্ষা দুরূহ বৈকি। কিন্তু ওখানে অপ্রত্যাশিতের সাক্ষাৎলাভ সম্ভব।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিম্নোক্ত আবিষ্কারের চমকে রসায়নের ইতিহাসবেত্তারা রীতিমত বিব্রত বোধ করেছিলেন।

...১৯১২ সালে নেপল্‌সের ধারে একটি প্রাচীন রোমান ধ্বংসাবশেষ খননের সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গুন্থার আশ্চর্য সুন্দর কিন্তু কাচের মোজাইক খুঁজে পান। দেখা গেল, দুই হাজার বছরেও কাচের রঙ একটুও ম্লান হয় নি।

প্রাচীন রোমানদের ব্যবহৃত রঙের সংস্থিতি জানার জন্য গুন্থার ম্লান-সবুজ কাচের দু'টি নমুনা ইংলণ্ডে পাঠালেন। কাচদু'টি হাতে পড়ল ম্যাকলের।

বিশ্লেষণে অবাক হবার মতো কিছুই পাওয়া গেল না। অবশ্য নগণ্য দেড় শতাংশ খাদ বের হল আর তা আসলে কী ম্যাকলে বলতে পারলেন না।

দৈবযোগেই সমস্যাটির সমাধান মিলল। কে যেন খাদটির তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করার কথা ভেবেছিল। ভাগ্য ভাল। দেখা গেল, সত্যিই তা তেজস্ক্রিয়। কিন্তু কোন মৌল এর কারণ হতে পারে?

রাসায়নিকদের বিবরণে জানা গেল: খাদটি ইউরেনিয়াম অক্সাইড।

এ কি কোন মহাআবিষ্কার? সম্ভবত না। কাচে রঙ দেয়ার জন্য ইউরেনিয়াম

লবণের ব্যবহার তখন পুরানো ঘটনা। এটিই ইউরেনিয়ামের প্রথম ফলিত ব্যবহার। কিন্তু রোমানদের পক্ষে কাচে ইউরেনিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহার নেহাৎই আপতিক ঘটনা।

কিছুকাল ঘটনাটি যবনিকার অন্তরালবর্তী রইল। কিন্তু কয়েক দশক পরে ভুলে যাওয়া কাহিনীটি মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক ও রাসায়নিক কেলির চোখে পড়ল।

অজস্র পরীক্ষানিরীক্ষা, বিশ্লেষণের বহু পুনরাবৃত্তি এবং তথ্যাবলীর তুলনাক্রমে কেলি এই সিদ্ধান্তে পেঁাছলেন যে, রোমান কাচে ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব মোটেই কোন ব্যতিক্রম নয়, তা নিয়ম। রোমানরা ইউরেনিয়াম সম্পর্কে জানত, ফলিত কাজে, বিশেষভাবে কাচে রঙ দেয়ায় তা ব্যবহার করত।

সম্ভবত, এখানেই ইউরেনিয়াম জীবনীবৃত্তের শুরু।

ইউরেনিয়াম ও তার পেশা

বিংশ শতাব্দীতে পর্যায়বৃত্ত সারণীর ৯২ নং মৌলের খ্যাতিই এখন সবার উপর। কারণ, প্রথম পারমাণবিক রিয়েক্টরটি চালু হয়েছিল ইউরেনিয়াম দিয়েই। মানুষ এই মৌলেই সন্ধান পেল আনকোরা এক শক্তি-উৎসের।

ইউরেনিয়াম উৎপাদনের পরিমাণ এখন বিপুল: বছরে ৪০,০০০ টনের বেশি। আণবিক শক্তি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (অর্থাৎ 'আসল উদ্দেশ্য সাধনের') পক্ষে পরিমাণটি আজও যথেষ্ট বৈকি।

কিন্তু আশ্চর্য, উৎপন্ন ইউরেনিয়ামের ৫ শতাংশের বেশি আসলে কাজে লাগে না। অবশিষ্ট ৯৫ শতাংশই বর্জ্য ইউরেনিয়াম। একে সোজাসুজি ব্যবহার করা যায় না। যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ আইসোটোপটি আণবিক জ্বালানীর প্রধান উপকরণ, বর্জ্যে তার পরিমাণ অতি সামান্য।

অর্থাৎ ভূবিদ, খনিবিশেষজ্ঞ ও রাসায়নিকদের এত শ্রম তাহলে বৃথা?

উদ্বিগ্ন হবেন না। ইউরেনিয়ামের 'অপারমাণবিক' পেশাও রয়েছে। আর তার সংখ্যাও কম নয়। দুর্ভাগ্য, অবিশেষজ্ঞরা বিষয়টি সম্পর্কে খুবই কম জানেন। ইউরেনিয়ামের উপর এখন জীববিদদের নজর পড়েছে। দেখা গেছে, গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য ইউরেনিয়াম অপরিহার্য। এর প্রভাবে গাজর, বীট ও কয়েকটি ফলে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইউরেনিয়াম উপকারী ভূজীবাণু বৃদ্ধিরও সহায়ক।
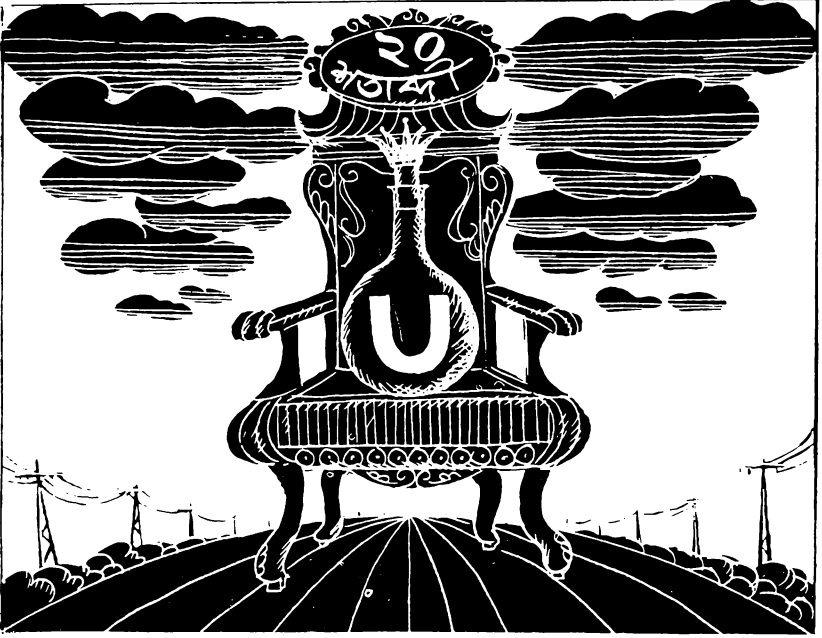
ইউরেনিয়াম প্রাণীর পক্ষেও প্রয়োজনীয়। একটি কৌতূহলপ্রদ পরীক্ষায় কিছু ধেড়ে ইঁদুরকে এক বছর ধরে অল্প পরিমাণ ইউরেনিয়াম লবণ খাওয়ানো হল। দেখা গেল, তাদের শরীরে মৌলগুলির পরিমাণে বস্তুত কোন পরিবর্তনই ঘটে নি। তাদের কোন ক্ষতিও হয় নি, তবে ওজন বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

গবেষকদের ধারণা, ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম আত্মীকরণে ইউরেনিয়ামের ভূমিকা উল্লেখ্য। আমরা তো জানি এই মৌলত্রয় জীবনের জরুরী উপকরণ।

আর ঔষধে? মৌলটির এই ব্যবহার খুবই প্রাচীন। বহুমূত্র, চর্মরোগ, এমন কি টিউমারসহ বহু রোগের চিকিৎসায়ও ইউরেনিয়াম লবণ ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য, প্রয়োগটি সর্বত্র পুরোপুরি ব্যর্থ হয় নি। 'ইউরেনিয়াম চিকিৎসা' আজকাল তো নিয়মেই দাঁড়িয়েছে।

ইউরেনিয়াম ধাতুবিদ্যায়ও সদ্ব্যবহৃত। লৌহ ও ইউরেনিয়ামের মিশ্র

(ফেরোইউরেনিয়াম) ইস্পাত থেকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অপসারণের অত্যুপযোগী উপকরণ। ফেরোইউরেনিয়ামযুক্ত ইস্পাত অতি নিম্ন তাপমাত্রায়ও কর্মক্ষম। ইউরেনিয়াম ও নিকেলযুক্ত ইস্পাত সর্বক্ষয়ী রাসায়নিক উপাদানেও অনাক্রম্য, এমন কি অ্যাকোয়া রিজিয়াও (নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মিশ্র) সেখানে নাচার।

বহু রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনুঘটক হিসেবেও ইউরেনিয়াম এবং এর যৌগের অনন্য ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ্য। ইউরেনিয়াম কার্বাইডের সান্নিধ্যেই অনেক সময় নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়ায় সংশ্লেষিত হয়। অক্সিজেন মাধ্যমে মিথেনের জারণ, কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেন থেকে মিথাইল ও ইথাইল আলকোহল তৈরি এবং অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপাদনে উদ্দীপক হিসেবে ইউরেনিয়াম অক্সাইড বহুলব্যবহৃত। ইউরেনিয়াম অনুঘটক ব্যবহারে পাওয়া জৈব রাসায়নিক উৎপাদের সংখ্যা মোটেই কম নয়।

ইউরেনিয়াম রসায়ন অত্যন্ত সমৃদ্ধ। নিজ যৌগে সে ষষ্ঠ-, পঞ্চ-, চতুঃ- ও ত্রিযোজী ভূমিকা পালনক্ষম। যোজ্যতার বৈষম্যে ইউরেনিয়াম যৌগগুলি পরস্পর থেকে এতই আলাদা যে, এর রসায়ন চারটি স্বতন্ত্র মৌলের সমন্বিত রসায়নেরই সমতুল্য।

প্লুটোনিয়াম গাথা

গত চল্লিশের দশকে একটি সামান্য আলোকচিত্র ছাপা হয়েছিল। দেখলে তাতে কী আছে, বোঝা খুবই কঠিন। ছবির নিচে লেখা ছিল, '২০ মিলিগ্রাম প্লুটোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ৪০ গুণ বর্ধিত।' কেবল অণুবীক্ষণের সাহায্যেই নাজুকতম নলের ভেতরে রাখা পদার্থটির এই নগণ্য পরিমাণটির অস্তিত্ব টের পাওয়া সম্ভব।

আলোকচিত্রটি কিন্তু নতুন রাসায়নিক মৌল, সত্যিকার অদ্বিতীয় মৌল গবেষণার অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ।

১৯৪০ সালে মার্কিন পদার্থবিদ জি. সিবোর্গ এবং এ. ভাল পারমাণবিক বিক্রিয়ার সাহায্যে ৯৪ নং নতুন মৌলের প্রথম পরমাণু সংশ্লেষিত করেন। আজকাল বিশ্বে শত শত কিলোগ্রাম প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হয়। এখন প্লুটোনিয়াম মেন্দেলেয়েভ সারণীর সর্বাধিক গবেষিত মৌলগুলির অন্যতম। বিশ্বাস করুন, কথাটি সাচ্চা। এর

কারণ অবশ্য খুবই সোজা: প্লুটোনিয়াম আণবিক রিয়েক্টরগুলির প্রধানতম ইন্ধন, সুতরাং, এর সবক'টি বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে জানতেই হবে, অন্যথা এ নিয়ে কাজ করা অসম্ভব।

প্লুটোনিয়ামকে কৃত্রিম সংশ্লেষজাত ধাতু বলা হয়। তবুও প্রকৃতিতেও এর অভাব দুর্লক্ষ্য নয়। অত্যল্প পরিমাণে হলেও তা প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামজাত।

কীভাবে তা ঘটে? প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের স্বতঃস্ফূর্ত বিভাজনের দরুণ ভূত্বকে সর্বদাই মুক্ত নিউট্রন থাকে। ইউরেনিয়াম-২৩৮'র আইসোটোপের নিউক্লিয়াসে এগুলি ধরা পড়ে। দেখা দেয় ইউরেনিয়াম-২৩৯'এর নিউক্লিয়াস। ইলেকট্রন নিঃসারিত করে এই নিউক্লিয়াসগুলি ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। সুতরাং, এগুলির আধানে একটি একক বৃদ্ধি পেলেও, এর ভর অপরিবর্তিত থাকে। আমাদের সামনে নেপ্‌চুনিয়াম ৯৩ নং ঘরে অবস্থিত। সে প্রথম ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল। নেপ্‌চুনিয়ামের নিউক্লিয়াসই তেজস্ক্রিয় ভাঙ্গন মাধ্যমে প্লুটোনিয়াম-২৩৯'র নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়।

বিজ্ঞানীদের হিসাবে পৃথিবীর ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়ামের আপেক্ষিক অনুপাত — ১:১০ বা ১:১২। কমই বটে। কিন্তু আবিষ্কারের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, তাও যদি কৃত্রিমভাবে ধাতুটিকে সংশ্লেষ করা না যেত।

আমাদের চেনা প্লুটোনিয়াম-২৩৯টির অর্ধভাঙ্গনের কালপর্ব ২৪,৩৬০ বছরের সমান। প্লুটোনিয়াম আইসোটোপদের মধ্য এটি সবচেয়ে দীর্ঘায়ু নয়, যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। প্লুটোনিয়াম-২৪৪'এর আয়ুকাল সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১০ কোটি বছর।

প্লুটোনিয়াম গবেষণার জন্য আত্যন্তিক সতর্কতা অপরিহার্য। মৌলটির তেজস্ক্রিয়তা এতই প্রকট এবং জীবিতের পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, সাধারণ রাসায়নিক গবেষণাগারে তা নিয়ে কাজ করা যায় না। বিশেষ স্থান, তথাকথিত উত্তপ্ত চেম্বারেই গবেষণাটি চালাতে হয়। সুইচ-বোর্ড পরিচালিত যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এর সবটুকু কাজ শেষ করতে হয়। এখানে উত্তপ্ত গবেষণাকেন্দ্রে সুজটিল হাতলই রাসায়নিকের হাতের স্থলবর্তী হয়েছে।

ট্রান্সইউরেনিয়ামের অন্যান্য মৌলের তুলনায় প্লুটোনিয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, একে বিরাট পরিমাণে জমানো যায় (ইউরেনিয়াম রিয়েক্টরে তৈরি ক'রে)। তবে এর অর্থ মোটেই এ নয় যে, কল্পিত যেকোনো আকারের ধাতব প্লুটোনিয়ামের ইট তৈরি সম্ভব। ইউরেনিয়ামের মতো প্লুটোনিয়ামের নির্দিষ্ট সন্ধি-ভর আছে। তা অতিক্রান্ত হলে এতে অনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুরু হয় ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। তাই

আণবিক বোমায় প্লুটোনিয়াম সদ্ব্যবহৃত। রিয়েক্টরে বিক্রিয়াটি পরিচালিত হলে তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

সমানাধিকারী রাসায়নিক বস্তুরাজ্যে প্লুটোনিয়াম অনেক ক্ষেত্রেই অসাধারণ। পর্যায়বৃত্ত সারণীর কোন ঘরে এর স্থান সে সম্বন্ধে এখনও মতৈক্য নেই। একদল বিজ্ঞানীর মতে প্লুটোনিয়াম অ্যাক্টিনাইড পরিবারের, অন্য দলের মতে এটি ইউরেনিয়াম ও নেপ্‌চুনিয়ামসহ স্বল্পসংখ্যক তথাকথিত ইউরেনাইড দলভুক্ত। আবার তৃতীয়রা মনে করেন যে, প্লুটোনিয়ামের জন্য মেন্দেলেয়েভ সারণীর আট নম্বর দলে স্বতন্ত্র ঠাঁই দেয়া উচিত। ৯৪ নং ধাতুর রসায়ন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এটি তিন যোজ্যতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন যোজ্যতায় কর্মক্ষম। ছয় যোজ্যতার প্রেক্ষিতে প্লুটোনিয়াম ইউরেনিয়ামের অত্যন্ত সদৃশ।

১৯৬৭ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞানী — আ. দ. গেল্মান, ন. ন. ক্রত এবং ম. প. মেফোদিয়েভা প্লুটোনিয়মের যেসব আকর্ষী মিশ্রণ পান, সেগুলিতে সপ্তযোজী প্লুটোনিয়াম ছিল। ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলগুলির রসায়নে এই ফলাফলকে রাসায়নিকরা প্রথম তাৎপর্যশীল ঘটনা বলে বিবেচনা করেন। এর ফলে পর্যায়বৃত্ত সারণীর শেষ তলার মৌলগুলির পরিবর্তনের নিয়ম সম্বন্ধে বহুদিনের বদ্ধমূল অনেক ধারণা পুনর্বিবেচনা জরুরী হয়ে ওঠে।

রাসায়নিকরা প্লুটোনিয়ামের শতাধিক বিভিন্ন মিশ্রণ পেয়েছেন এবং এ নিয়ে গবেষণা করছেন। সংখ্যাটি অন্যান্য ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলের মোট সংখ্যার চেয়েও বেশি। প্লুটোনিয়াম ও তার মিশ্রণেই বহু ডজন বিশেষ গ্রন্থনার হদিস রয়েছে।

তবে বলতে কি, ৯৪ নং মৌলের 'বয়স' চল্লিশ বছরেরও কম।

কক্ষতাপে বাহ্যত প্লুটোনিয়াম দেখতে সাদাটে ঝকঝকে মৌল। ক্রমে ক্রমে গলনাঙ্ক পর্যন্ত এটিকে তপ্ত করলে এর আশ্চর্য রূপান্তর দেখা যায়। তরল হওয়ার আগে কয়েক বার এর কেলাসী গঠন পরিবর্তিত হয়। একই মৌল বিভিন্ন কেলাসী অবস্থায় প্রকটিত হলে একে অ্যালোট্রপি বলা হয়। প্লুটোনিয়ামের অ্যালোট্রপিক অবস্থা ছ'টি। আর কোনো ধাতুই এমন 'দৌলতের' অধিকারী নয়।

প্লুটোনিয়ামের তেজষ্ক্রিয় ভাঙ্গনের সময় অনেক তাপ নিঃসারিত হয়। এর সদ্ব্যবহারও সম্ভবপর। তাপশক্তির বিভিন্ন রূপান্তরণ ঘটিয়ে একে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায়।

আমাদের চোখের আলোয় প্লুটোনিয়াম দেখতে এ রকম...

একটি অসম্পূর্ণ দালান

পর্যায়বৃত্ত সারণী ও এর মহান স্থপতি সম্পর্কে অনেক অনেক ভাল কথাই ইতিপূর্বে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ আমরা বুঝতে পারলাম — দালানটি অসমাপ্ত। এর সপ্তম তলাটির পুরো অর্ধেকই সম্পূর্ণ হয় নি। ওখানে ৩২টি ঘরের স্থলে তৈরি হয়েছে অদ্যাবধি মাত্র ১৯টি। তা ছাড়া ঐ সব ঘরের অনেক বাসিন্দারাও যেন কেমন রহস্যময়: তারা ওখানে ঠিক বাস করে কি না, তাও বলা সহজ নয়। সত্যিকার ভুতুড়ে ব্যাপার।

পর্যায়বৃত্ত সারণীর শেষ কোথায় কিংবা আরও সহজ করে বললে, শেষতম মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা কত? সমস্যাটি রাসায়নিক ও পদার্থবিদদের বহুবিতর্কিত প্রসঙ্গ।

বছর পঞ্চাশ আগে গুরুত্বপূর্ণ সাময়িকী ও গ্রন্থাদিতে সংখ্যাটি ১৩৭ বলে প্রচারিত হচ্ছিল। 'রহস্যময় সংখ্যা ১৩৭' নামে একটি পুস্তিকাও লিখেছিলেন জনৈক বিখ্যাত বিজ্ঞানী।

কিন্তু এই সংখ্যাটির অনন্যতা কী?

পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের ঘনিষ্ঠতম ইলেকট্রন খোলক নিউক্লিয়াস থেকে সর্বদা সমদূরত্বে অবস্থান করে না। নিউক্লীয় আধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খোলকের ব্যাসার্ধও ক্রমাগত খর্বিত হয়। তাই ইউরেনিয়ামে এই খোলকটি অন্যগুলির (যেমন পটাসিয়ামের) তুলনায় নিউক্লিয়াসের অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং, এমন এক সময় আসবে যখন ঐ খোলক আর নিউক্লিয়াসের আয়তন এক হয়ে যাবে। তখন খোলকটির ইলেকট্রনগুলির কী হবে?

এরা নিউক্লিয়াসে 'হুমড়ি' খেয়ে পড়বে আর সে এদের 'গিলে' ফেলবে। কিন্তু নিউক্লিয়াসে ঋণাত্মক আধান প্রবেশের ফলে তার মোট ধনাত্মক আধানের পরিমাণ এক একক হ্রাস পাবে। অতঃপর এভাবে উদ্ভূত নতুন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা পিতৃমৌল থেকে এক একক কম হবে।

এবং এভাবেই আমরা শেষ সংখ্যায় পৌঁছেছি। বড় বাড়ির শেষ ঘরের নম্বর এখন ১৩৭।

পরে, আজ থেকে প্রায় বিশ বছর আগে পদার্থবিদরা এতে কিছু ত্রুটি খুঁজে পান। আরও নির্ভুল গবেষণায় দেখা গেল নিউক্লিয়াসের আধান উপরোক্তের তুলনায় বেশি হলেই কেবল ইলেকট্রনগুলি এতে 'হুমড়ি' খাবে।

বড় বাড়িটি শেষ করার কী উজ্জ্বল সম্ভাবনাই না দেখা দিল! কত নতুন মৌল, কত অভাবিত আবিষ্কারই না রাসায়নিকদের জন্য অপেক্ষিত! আর কত ভাবী বাসিন্দা মেন্দেলেয়েভের তৈরি বাড়িতে আজ আশ্রয়প্রার্থী?

হায়! এ আজ কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কল্পনাটি প্রলুব্ধকারী, কিন্তু আজও অবাস্তব।

শেষতম মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু নজির এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এটি ভুলে যান নি। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন, এতে কী ঘটে যদি...

যদি না তেজস্ক্রিয়তা থাকত। পৃথিবীর অজস্র মৌলের মতো যদি বৃহৎ আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসগুলিও সুস্থিত হত।

বিস্‌মাথের চেয়ে গুরুভার মৌলের রাজ্যে তেজস্ক্রিয়তা একচ্ছত্র শাসক। কিন্তু তার নিয়মে কেউ দীর্ঘজীবী, কেউ-বা ক্ষণজীবী।

১০৪ নং মৌলের নাম কুর্চাতভিয়াম। তার অর্ধায়ু এক সেকেণ্ডের দশভাগের তিনভাগ।

কিন্তু ১০৫ নং ও ১০৬ নং মৌল? তাদের আয়ু সম্ভবত আরও কম। এখন আমরা সেই নির্দিষ্ট সীমান্তরেখার নিকটবর্তী, যখন নতুন মৌলের জন্মের আগেই তার নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে পড়ে। এ অবস্থায় ১১০ নং অবধি পেঁাছা ভাগ্যের কথা...

মেন্দেলেয়েভ সারণী যে অসম্পূর্ণ এজন্য দায়ী প্রকৃতি নিজে এবং তার ভৌত নিয়মাবলীর কঠোরতা।

তবু, মানুষ কতবারই না প্রকৃতিকে জয় করেছে!

আধুনিক কিমিয়াবিদদের স্তুতিগান

মন্দভাগ্য মধ্যযুগীয় কিমিয়াবিদরা স্পেনের বিচারসভার আদেশে নিগৃহীত ও জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিলেন।

কিন্তু আজকের ‘পারমাণবিক’ কিমিয়াবিদদের কপাল খুলেছে। এঁদের কথা সসম্মানে উদ্ধৃত হচ্ছে, তাঁরা নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন।

প্রাক্তন কিমিয়াবিদরা বিশ্বাস করতেন অনেক কিছু, করছেন কী তা জানতেন

খুবই কম। মন্ত্রোচ্চারণ, প্রার্থনা, রহস্যময় পরশ পাথরের ভেলকিতে অন্ধবিশ্বাস ছিল তাঁদের 'তত্ত্বের' অনুষঙ্গ।

আধুনিক কিমিয়াবিদরা নাস্তিক। তাঁরা শয়তানেও ভীত নন। মানববুদ্ধির শক্তি ও অসীম উদ্ভাবনক্ষমতায় তাঁদের অনড় বিশ্বাস। তাঁরা পদার্থবিদ্যা ও গণিতপুক্ত সুনির্দিষ্ট, নির্ভরশীল ভৌত তত্ত্বাবলীর সারবত্তার উপলব্ধি এবং আরও দুঃসাহসিক অনুমান ও প্রকল্প গ্রন্থনায় অধিক বিশ্বাসী।

আমাদের কালের কিমিয়াবিদরা গুরুভার মৌলাবলীর রাজ্যে অনুপ্রবেশে আগ্রহী।

কিন্তু তাঁদের এ প্রত্যাশা কি আকাশকুসুমের সমগোত্রীয় নয়? একটু আগেই আমরা বলেছি, ১১০ পারমাণবিক সংখ্যার ঘনিষ্ঠ মৌলাবলীর পরমায়ু তেজস্ক্রিয়তায় কঠোরভাবে নির্দিষ্ট।

তাই ঠিক, আবার ঠিকও নয়। প্রখ্যাত ডেনিশ পদার্থবিদ নিলস্ বোর একদা 'পাগলামীর' স্বপক্ষে বলেছিলেন। তাঁর মতে কেবল এভাবেই বিশ্বলোক সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাবলীর আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

গুরুভার মৌলসমূহের নির্মাতারা অনুরূপ প্রত্যয়েরই বশবর্তী ছিলেন। অবশ্য আমরা জোর করেই বলতে পারি, আপেক্ষিকবাদের তুলনায় এই ধারণাবলী তেমন কিছু 'পাগলামী' নয়। এগুলি সুচিন্তিত, ভৌত নিয়মভিত্তিক এবং সতর্ক গাণিতিক হিসাবসিদ্ধ।

পূর্বোক্ত ধারণাগুলির নির্যাস: উচ্চ আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসরাজ্যে 'সুস্থিত দ্বীপাবলী'র অস্তিত্ব অবধারিত। অবশ্য, সেখানকার মৌলগুলিও তেজস্ক্রিয়তার অবক্ষয়মুক্ত নয়, এরা শুধু প্রতিবেশীর তুলনায় দীর্ঘজীবী। আর দীর্ঘতর পরমায়ু বিধায় শুধু সংশ্লেষ নয়, এগুলির মৌলিক গুণাগুণ নির্ণয়ও সম্ভব।

১২৬ পারমাণবিক সংখ্যার মৌলটি উক্ত 'দ্বীপাবলী'রই একটি।

কিন্তু এ তো গেল তত্ত্বকথা। এবার বাস্তব ক্ষেত্রেই মৌলটির অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়া চাই। কেমন করে ১২৬ নম্বরটি তৈরি করা যায়?

পারমাণবিক রসায়নের প্রচলিত পদ্ধতি এখানে স্পষ্টতই অচল। নিউট্রন, ডিটেরন, আল্ফা কণা, এমন কি আর্গন, নিয়ন, অক্সিজেনের মতো লঘুভার মৌলের আয়নও এখানে অকেজো। লক্ষ্যস্বরূপ ব্যবহার্য উপযুক্ত মৌলের অনুপস্থিতিই এর কারণ। প্রাপ্তব্য সকল মৌলই ১২৬ নম্বর থেকে সুদূরবর্তী।

অসাধারণ কোন পদ্ধতির আবিষ্কারই অতঃপর একমাত্র পন্থা।

এসম্পর্কিত যে অদ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখন আলোচিত তা হল: ইউরেনিয়াম

দ্বারাই ইউরেনিয়ামের উপর 'বোমাবর্ষণ' করা — বিশেষ ত্বরণযন্ত্রে ত্বরিত ইউরেনিয়াম আয়নকে ইউরেনিয়াম লক্ষ্যে নিক্ষেপন।

এর সম্ভাব্য ফলাফল কী? ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসদু'টির মিশ্রণে অতি জটিল বিরাট এক নিউক্লিয়াসের উদ্ভব। ইউরেনিয়ামের আধান ৯২। তাই এই মহাকায় নিউক্লিয়াসের আধান হবে ১৮৪। এর পক্ষে টিকে থাকা একেবারেই অসম্ভব, এমন কি অবাস্তবও। নিউক্লিয়াসটি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভর ও আধানযুক্ত দু'টি খণ্ডে বিভক্ত হবে আর এদেরই মধ্যে হয়ত-বা মিলবে ১২৬ আধানযুক্ত নিউক্লিয়াসের সন্ধান...

অথবা ধরা যাক, ১৬৪ নং মৌল। তাত্ত্বিকরা পূর্বাভাস দিচ্ছেন যে, এখানে আরও একটি 'সুস্থিত দ্বীপ' থাকা প্রয়োজন... দেখি কী হয়।

অজানার উজানে

কখন তা ঘটবে, কেউ জানে না। কিন্তু তা অবশ্যম্ভাবী। মানুষ প্রকৃতির উপর ইতিহাসের তুলনাহীন এক বিরাট বিজয় অর্জন করবে।

আমরা তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করতে শিখব। অস্থির মৌলকে সুস্থিত, সুস্থিতকে অস্থির করতে পারব। আমরা পারব সেরা সুস্থিত নিউক্লিয়াসে অবক্ষয় সংক্রমিত করতে।

প্রকল্পটি অদ্যাবধি বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীর লেখকদের মনেও ছায়াপাত করে নি। এর মুখোমুখি বিব্রত বিজ্ঞানীরা এখনও কাঁধ ঝাঁকান। তেজস্ক্রিয় স্বতঃপ্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনার তত্ত্বীয় বা ফলিত কোন সম্ভাবনা আজও সহজদৃষ্ট নয়।

কিন্তু কোনদিন যে এর পথ খুঁজে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত, পথটি যতই অজানা হোক না কেন। আর পিথেকানথ্রপাসের কাছে একটি আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যেমন অজানা, অনেকটা তার মতো হলেও। উপমাটি জনৈক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখকের।

ধরা যাক, আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। ভারি মৌল উৎপাদন আর কোন সমস্যা নয়। বড় বাড়ির কয়েক ডজন নতুন বাসিন্দা এখন বিজ্ঞানীদের হাতের মুঠোয়। রাসায়নিকরা এগুলির পরীক্ষার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন।

তাঁরা এখন অজানার মুখোমুখি।

একটু দাঁড়ান। 'অজানা' শব্দটি আর প্রযোজ্য নয়। বিষয়টি এখনই আমাদের জানা।

আমরা কি তাহলে, ধরুন, উপরোক্ত ১২৬ নং মৌলের গুণাগুণ অনুমান করতে পারি?

মনে হতে পারে বিশেষ কোন জটিলতার মুখোমুখি না হয়েও তা করা যায়।

মোটামুটিভাবে পর্যায়বৃত্তকে যত খুশি বাড়ানো সম্ভব। এর সংযুতির সাধারণ ভৌত নীতিমালা মোটামুটি ও সামগ্রিকভাবে অতি স্বচ্ছ। একদা এই বইয়ের অন্যতম লেখককে জনৈক প্রাজ্ঞ হাজার মৌলের একটি সারণী দেখান। তাঁকে সোজা প্রশ্ন করা হয়: 'কেবল হাজার কেন, দুই, কিংবা দশ হাজার নয় কেন?' আবিষ্কারক বিব্রতমুখে উত্তর দিয়েছিলেন: 'দেখুন, কাগজের অভাব কি না...'

তবে সে ঠাট্টার ব্যাপার। ১২৬ নং মৌল সম্পর্কে এটাই বলা যেতে পারে: ওটি নতুন এক মৌল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন অনন্য পরিবার রাসায়নিকরা আর কখনই দেখেন নি।

পরিবারটি শুরু হবে ১২১ নম্বর মৌল দিয়ে। এর আঠারো সদস্যের প্রত্যেকে আমাদের পূর্বপরিচিত ল্যান্থেনাইড মালার চেয়েও পরস্পরের ঘনিষ্ঠতর। বড় বাড়ির এই অদ্ভুত বাসিন্দারা আইসোটোপ ও মূল মৌলের পার্থক্যের চেয়ে তেমন কিছু আলাদা হবে না।

পরিবারের সকলের তিনটি প্রত্যন্ত পারমাণবিক খোলকের অটুট সাদৃশ্যই এর কারণ; কেবলমাত্র প্রত্যন্ত থেকে চতুর্থ খোলকটিই পূর্ণ হবে। এই সকল ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন পার্থক্য দেখা দিতে পারে কি?

আমাদের বইয়ের 'চৌদ্দ যমজ' নামের কাহিনীটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়। পরিবারটির গুণাগুণ বর্ণনাসহ কাহিনীটির শিরোনাম দিতে গিয়ে অনেক মাথা ঘামাতে হত। সম্ভবত, 'অভিন্ন আঠারো' অথবা 'অভিন্ন মুখের আঠারো মৌল এবং সকলের মুখ অভিন্ন এক' লেখাই উচিত। কারণ, এদের বেলায় 'যমজ' শব্দটি 'খাটে না'।

কিন্তু বইটি তো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। তাই বাস্তব বর্ণনার জন্য আমরা সুসময়ের অপেক্ষায় রইলাম।

কিন্তু, পর্যায়বৃত্তে এই 'অভিন্ন আঠারোর' বিন্যাসের সমস্যাও আছে বৈকি।

সত্যি বলতে কি, বিষয়টি নিয়ে আমাদের ধারণা তেমন স্বচ্ছ নয়। তা ছাড়া ল্যান্থেনাইড ও অ্যাক্টিনাইড মালাদ্বয়ের সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত, যদিও তুলনামূলকভাবে তা অনেক সহজ ব্যাপার।

কম্পিউটার গল্প শোনায়

মেন্দেলেয়েভ সারণীর ৮ নং পর্যায় তৈরির সেই বিমূর্ত সমস্যাটি অপ্রত্যাশিতভাবেই কম্পিউটারের হস্তক্ষেপে বিশেষ তীব্রতা ধারণ করল।

কম্পিউটার যে সংখ্যাগণক যন্ত্র, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এ হচ্ছে বিভিন্ন সংখ্যা গণনার উপকরণ ও যন্ত্রের (ইলেকট্রনিক সংখ্যাগণক যন্ত্রও তন্মধ্যে) বেলায় ব্যবহৃত পরিভাষা।

কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বহুমুখী। একে বাদ দিলে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা অচল হয়ে পড়বে। বহুবিধ ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পূর্বাভাস দানক্ষম এই যন্ত্রটি আমাদের পক্ষে অশেষ উপকারী।

অতি বড় পারমাণবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে বড় অর্ধভাঙ্গন পর্বের অজানা মৌলের অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পর্কে কম্পিউটারই পদার্থবিদদের এই পূর্বাভাষ দিয়েছে। অবশ্য, এ সাধারণ কম্পিউটারের কাজ নয়, এজন্য প্রয়োজন অতি দ্রুত কর্মক্ষম এক কম্পিউটার, পলকমাত্র বহু লক্ষ অংক কষা যার পক্ষে সহজ। এমন যন্ত্রই অতি দ্রুত জটিলতম গাণিতিক সমীকরণের এই সমাধানটি বের করেছে।

অতঃপর সারা বিশ্বে এই রহস্যময় অজানা মৌলগুলির সংশ্লেষ এবং প্রকৃতিতে এদের সন্ধান শুরু হয়।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের হাতে পড়লেও অজানা মৌলকে সনাক্ত করার জন্য আগে থেকেই এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানা প্রয়োজন; অন্তত প্রধানগুলি তো বটেই। এ সব জ্ঞান না থাকলে সমস্ত কাজই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

মনে হতে পারে যে, পর্যায়বৃত্ত সারণীর ভিত্তিতে মোটামুটিভাবে আসন্ন মৌলগুলির চারিত্র্যের পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব। অনুমানটি ছিল নিম্নরূপ: মেন্দেলেয়েভের স্থাপত্য অনুসারেই বড় বাড়িটির সাত তলার নির্মাণ শেষ করতে এবং আট তলার নির্মাণ আরম্ভ করতে হবে।

অল্প কথায়, অষ্টম পর্যায়ের ১৮টি মৌলের পরিবারটি নিয়ে আমরা যেভাবে অনুমান করেছিলাম ঠিক সেভাবে...

মেন্দেলেয়েভ সারণীর ধ্রুপদী কাঠামোর অনুসারী কালপর্যায় হওয়া উচিত এরূপ: এর অন্তর্ভুক্ত হবে ৫০টি মৌল, কমও নয় বেশিও নয়। এর সূচনা হওয়া চাই ক্ষারধাতু ইকাফ্রান্সিয়ামে (পারমাণবিক নম্বর ১১৯) এবং এর অন্তে থাকবে পারমাণবিক নম্বর ১৬৮ সহ নিষ্ক্রিয় গ্যাস (হয়ত বা তরল পদার্থ?)।

ইকাফ্রান্সিয়াম ও তার পড়শী ক্ষারমৃত্তিক ধাতু ইকারেডিয়ামের (পারমাণবিক

নম্বর ১২০) ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর আট নম্বর আবরণটি বা R-খোলকটি পূরণ করে। তারপর এই তথাকথিত ১৮ পদার্থের পরিবারটিতে (পারমাণবিক নম্বরগুলি ১২১ থেকে ১৩৮) পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি অনেকদিন আগেই বিস্মৃত পাঁচ নম্বর O-খোলকটি পূরণ করে। এর পরে ছয় নম্বর P-খোলকের ইলেকট্রনগুলির পালা (শেষোক্তটির নির্মাণ আরম্ভ হয় সিজিয়ামের স্বকালে) এবং আট নম্বর কালপর্যায়ে স্থান পাবে অ্যাক্টিনাইড সদৃশ ১৪টি মৌলের সমষ্টি —১৩৯ থেকে ১৫২ নম্বর পর্যন্ত। অতঃপর, দেখা দেবে যে- ১০টি মৌল, এগুলির ইলেকট্রনগুলো সাত নম্বর Q-খোলকের পূরক হবে। এর প্রথম আবির্ভাব ফ্রান্সিয়ামে। সমাপ্তিতে মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রধান প্রধান উপদলের মৌলগুলি — থলিয়াম, সীসক, বিস্‌মাথ, পোলোনিয়াম, অ্যাস্টেটাইন ও র‍্যাডনের ভারী উপমাগুলি। এগুলির পরমাণুতে আট নম্বর খোলকের নির্মাণ অব্যাহত থাকবে।

এই হল পরমাণুর ইলেকট্রনিক মডেলের ধ্রুপদী ভাষায় লিপিবদ্ধ মেন্দেলেয়েভ পর্যায় সারণীর আট নম্বর কালপর্যায়ের গঠন।

আপনাদের জানা সঙ্কেত ব্যবহারক্রমে আমরা নতুন নতুন তলা বানাতে পারতাম, এক কথায় যতটা কাগজ আছে এর সবটাই ভরাট করে দিতাম।

বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারে অজানা গুরুভার মৌলগুলির বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস দেয়ার ঝুঁকি নিলে পাওয়া তথ্যাদি এঁদের হতবাক করল। দেখা দিল আশঙ্কা। নতুন নতুন গবেষণায় ব্যয়িত হল যন্ত্রের শত শত, হাজার হাজার ঘণ্টার কাজ। কিন্তু নতুন তথ্যাদি মোটের উপর পুরানো তথ্যাবলী সমর্থন ক'রে কেবল খুঁটিনাটি সংযোজন ও সংশোধন করল।

কম্পিউটার তার ভাষায় যা যা বলেছে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের প্রতীকে তার অনুবাদ অনেকটা আদিম রহস্যময় রূপকথার মতো শোনাত...

কম্পিউটারগুলি আরও জানাল যে, অষ্টম পর্যায়ের মৌলগুলির পরমাণুর ইলেকট্রন খোলক পূরণের কোন কড়া নিয়ম নেই। এমন কি শৃঙ্খলার লক্ষণীয় আভাসও নেই। আগে আমরা যেভাবে বর্ণনা দিয়েছি মোটেই তার মতো নয়।

অষ্টম খোলকের গঠন ক্ষারমৃত্তিক ইকারেডিয়ামকে নিয়ে সম্পন্ন হয় না। বড় বাড়ির প্রারম্ভিক তলায় — দ্বিতীয়, তৃতীয় তলায় — কেবলই আমরা অনুরূপ ঘটনা লক্ষ্য করেছি। অতঃপর, ক্ষারমৃত্তিক মৌলের পরে নতুন ইলেকট্রন খোলকের নির্মাণ সাময়িকভাবে ব্যাহত হল।

প্রত্যন্ত থেকে সপ্তম, ষষ্ঠ ও পঞ্চম খোলকের ইলেকট্রনই পরমাণুতে উদ্ভূত হবার দাবীদার। উক্ত খোলকগুলিতে খালি জায়গার যে কামাই নেই তা জানাই আছে। এই আপোসহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতাই কিনা কখনও তীব্রতর হয়ে কখনও মন্দীভূত হয়ে সমগ্র অষ্টম পর্যায় ধরে অব্যাহত থাকে।

ইলেকট্রনের 'অসঙ্গতি'ই মৌলগুলির গুণাগুণে প্রতিফলিত। ফলত, সহজেই অনুমেয় যে, অষ্টম পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈশিষ্ট্য হবে অনন্যতম রাসায়নিক আচরণ। নতুন নতুন মৌলের প্রধানতম গুণাগুণের সুদীর্ঘ তালিকা দিতে গিয়ে কম্পিউটারও অনুরূপ রায় দেয়: সম্ভবত, ব্যাপারটা সত্যি এই রকমই!

একটি আশ্চর্য সিদ্ধান্তের উদাহরণ দিই। সহজে বোধগম্য না হলে তা ভেবে নেয়ার চেষ্টা করুন।

কম্পিউটার দাবি করছে: অষ্টম পর্যায়ের সমাপ্তি ১৬৪ নং মৌলে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পারমাণবিক সংখ্যার ৪টি নম্বর আগেই। এর পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসে মৌলটি অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় (যদিও গ্যাস নয়, বরঞ্চ ধাতু) হবে।

যা হোক কম্পিউটারের মতে অষ্টম পর্যায়ে থাকা উচিত ৫০টি মৌল, ৪৬টি নয়...

মাপ করবেন, নবম পর্যায়ের তা হলে কী হবে? এখানে দৃশ্যটি নেহাত বিস্ময়কর: ১৬৫ নম্বরের পরবর্তী মৌলগুলির নবম ইলেকট্রন খোলকের — S-খোলক পূরণ আরম্ভ হয়। এই পর্যায়ের থাকবে ৮টি মৌল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মতোই...

আমরা যদি অনুমান করি যে, কম্পিউটার কোন ভুল করে নি এবং সত্যিকার অবস্থাও এই রকম, তা হলে বলতে পারতাম: পর্যায়বৃত্তের গঠন আরো জটিল হওয়া চাই। মাত্র ১০৬টি মৌলের বৈশিষ্ট্য জেনে যা অনুমান করা যায়, এটি তার চেয়েও জটিল। এবং, বড় বাড়ির উপরতলার অভ্যন্তরীণ বিন্যাস হবে অসাধারণ।

ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের জন্য যা প্রতীক্ষমান তা হল: রাসায়নিক মৌল ও এগুলির যৌগসমূহের রহস্যকীর্ণ, তাক লাগানো, বিস্ময়কর জগৎ।

বাদবাকী যা,তা হল: 'আপেক্ষিক সুস্থিতির দ্বীপপুঞ্জ' প্রকল্পটি যে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পুরাকথা নয় তাই বাস্তবক্ষেত্রে প্রমাণ করা। হাতেনাতে অতিমৌল (অন্তত কয়েকটি) পেয়ে এদের গুণাগুণ জানা।

তখনই 'কম্পিউটার শোনানো গল্প' বাস্তব রূপ নেবে। হয়ত-বা তা গল্পই হয়ে থাকবে।

ভবিষ্যতই তা ঠিক করবে।

মৌলের নাম পঞ্জিকা

একটি অদ্ভুত লোককে নক্ষত্র, এদের গড়ন, কেন তারা আলো দেয় ইত্যাদি বলা হলে, সে বিস্ময়ে বলল: 'আমি সবই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি যা জানতে চাই তা হল জ্যোতির্বিদরা কী করে জানতে পারলেন তারাগুলির নাম?'

নক্ষত্রপঞ্জীতে লক্ষ লক্ষ 'নামাঙ্কিত' গ্রহনক্ষত্রের হদিস আছে। মনে করবেন না যেন সুন্দর সুন্দর নাম সকল তারার ভাগ্যেই জুটেছে। জ্যোতির্বিদরা নক্ষত্রের সাঙ্কেতিক নামই পছন্দ করেন। নামগুলো বর্ণ ও সংখ্যার সমবায়ে উদ্ভাবিত, অন্যথা বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। সংকেত থেকে বিশেষজ্ঞের পক্ষে নক্ষত্রের অবস্থান ও শ্রেণী নির্ণয় সহজতর।

নক্ষত্রের তুলনায় রাসায়নিক মৌলের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এখানেও নাম থেকে তাদের আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী বোঝা দুষ্কর। আর নতুন মৌল আবিষ্কারের পর রাসায়নিকরাও অনেক সময় 'নবজাতক'এর সঠিক 'নাম' খুঁজে পান না।

মৌলের ধর্মবিশেষের ইঙ্গিতলগ্ন নামই সর্বাধিক বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের নাম অবশ্য প্রায়োগিক। এতে কল্পনার আতিশয্য নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে, হাইড্রোজেন (জলজনক), অক্সিজেন (অম্লজনক), ফ্লোরিন (ধ্বংসী), ফসফরাস (আলোকবাহী)। নামগুলি স্পষ্টতই গুরুত্বপূর্ণ মৌলধর্মের স্মারক।

কতকগুলি মৌল আবার সৌরমণ্ডলীয় গ্রহের নামাঙ্কিত। যথা: সেলেনিয়াম ও টেলুরিয়াম (যথাক্রমে গ্রীক শব্দার্থ 'চন্দ্র' ও 'পৃথিবী' থেকে), ইউরেনিয়াম, নেপ্‌চুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম।

অন্য অনেক নামের উৎস পৌরাণিক কাহিনী।

এগুলির অন্যতম ট্যাণ্টেলাম। ট্যাণ্টেলাম জিউসের প্রিয় পুত্র, দেবতাদের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য কঠোর দণ্ডভোগী। গলাজলে তাকে দাঁড় করে রাখা হয়েছিল, মাথার উপর ঝুলছিল সুগন্ধি রসালো ফল। কিন্তু তৃষ্ণায় জলপানের চেষ্টামাত্র জল দূরে সরে যেত আর ক্ষুধায় ফল পাড়ার সময় ঘটত এরই পুনরাবৃত্তি। ট্যাণ্টেলামকে আকরিক থেকে পৃথক করার চেষ্টায় রাসায়নিকরা যে কষ্টভোগ করেছিলেন জিউসপুত্রের যন্ত্রণার সঙ্গেই শুধু তা তুলনীয়।

টিটানিয়াম ও ভেনেডিয়াম নামদু'টিও গ্রীক পুরাকথা থেকে গৃহীত।

দেশ ও মহাদেশের নামাঙ্কিত মৌলও দুষ্প্রাপ্য নয়। যথা, জার্মেনিয়াম, গ্যালিয়াম (গল — ফ্রান্সের প্রাচীন নাম), পোলোনিয়াম (পোল্যাণ্ড), স্ক্যাণ্ডিয়াম

(স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া), ফ্রান্সিয়াম, রুথেনিয়াম (রুথেনিয়া রাশিয়ার লেটিন নাম), ইউরোপিয়াম ও অ্যামিরিসিয়াম। প্রসঙ্গত, নগর নামাঙ্কিত মৌলও স্মরণীয়: হ্যাফ্নিয়াম (কোপেনহেগেন), লুটিসিয়াম (লুটিসিয়া প্যারিসের লেটিন নাম), বার্কেলিয়াম (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কেলি শহর), ইট্রিয়াম, টার্বিয়াম, আর্বিয়াম, ইটার্বিয়াম (সুইডেনের ছোট শহর ইটার্বির স্মরণিকা। ওখানকার একটি খনিজ থেকে মৌলগুলি আবিষ্কৃত)।

শেষে, প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের স্মরণিকাস্বরূপ মৌলাবলী উল্লেখ্য: কুরিয়াম, ফার্মিয়াম, আইন্স্টাইনিয়াম, মেন্দেলেভিয়াম, লরেন্সিয়াম, কুর্চাতভিয়াম, নিল্স্বোরিয়াম।

কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত ১০২ নং মৌলটিরই শুধু এখনও জন্মপঞ্জিকায় নাম ওঠে নি।

সুপ্রাচীন বহু মৌলের নামরহস্য সমাধানে বিজ্ঞানীরা আজও অভিন্নমত নন। কেন যে গন্ধককে গন্ধক, লৌহকে লৌহ আর টিনকে টিন বলা হয়, কেউ জানে না।

দেখুন, মৌলের নাম পঞ্জিকায় কত না বিচিত্রের দেখা মেলে।

$2H_2+O_2 \rightleftarrows 2H_2O$

যে সাপের
মুখে লেজ
৬৬
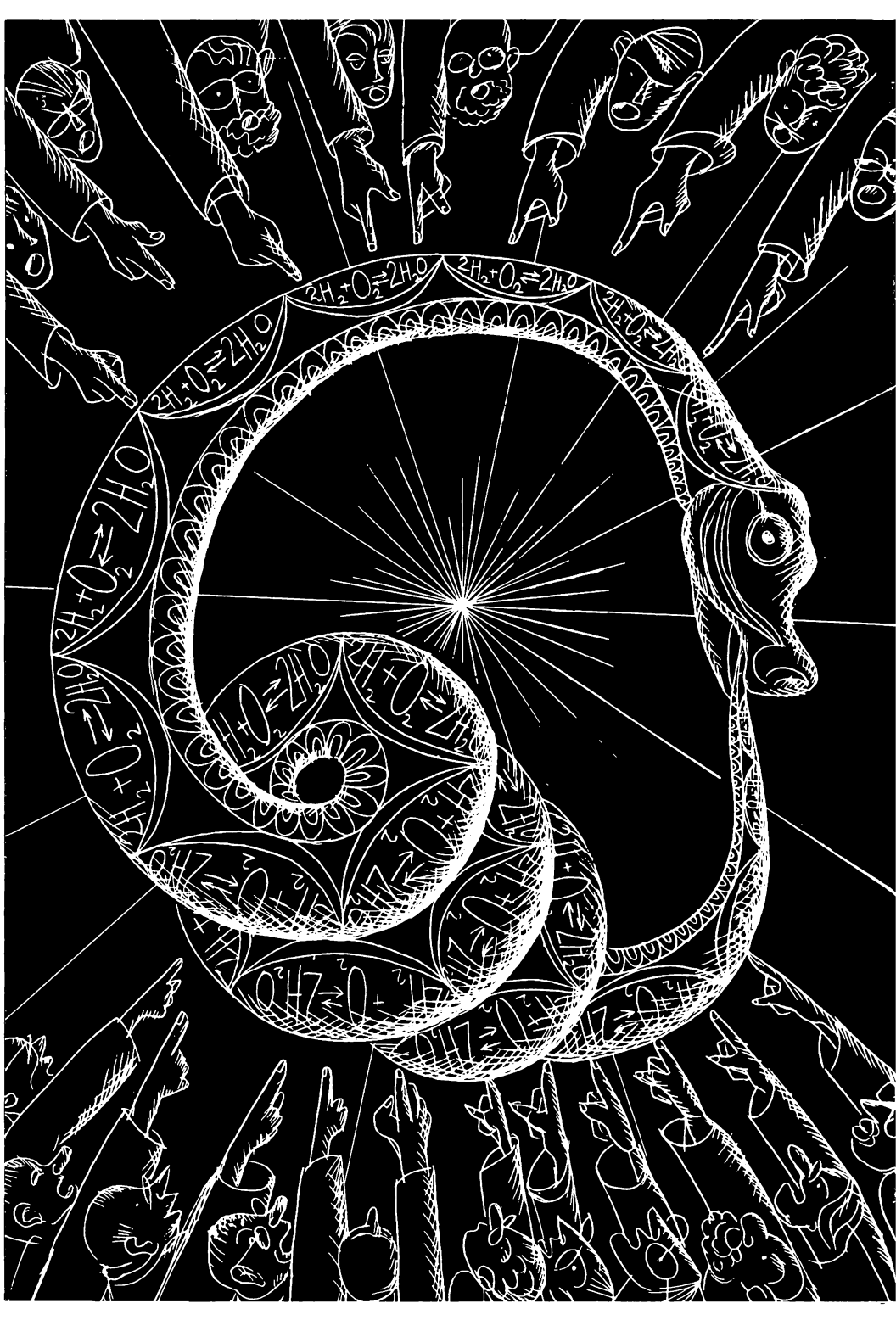
রসায়নের প্রাণশক্তি

আমাদের চারিদিকে যাকিছু আছে, তার প্রায় সবই রাসায়নিক যৌগে রাসায়নিক মৌলের অজস্র সমাবন্ধনে গঠিত।

ভূমিস্থ সামান্য পরিমাণ মৌলই কেবল মৌলস্বরূপ অবস্থিত; যথা, বর-গ্যাসবর্গ, প্ল্যাটিনাম ধাতুসমূহ এবং নানা আকারের কার্বন। আর কিছু না।

বহুকাল আগে মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের যে খণ্ডটি পৃথিবীতে পরিণত হয়েছিল, সম্ভবত, তাতে রাসায়নিক মৌলের সংখ্যা ছিল শ'খানেক এবং সবই পরমাণুপর্যায়ে। শত, সহস্র লক্ষ বছর পার হল। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হল। প্রকৃতির বিশাল রাসায়নিক পরীক্ষাগার সক্রিয় হয়ে উঠল। রাসায়নিকরূপী প্রকৃতি বিবর্তনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় জলের মতো সরল অণু থেকে প্রোটিন অবধি মহাজটিল বস্তু তৈরি করতে শিখল।

পৃথিবী ও প্রাণের বিবর্তন বহুলাংশে রসায়নেরই অবদান।

রাসায়নিক যৌগের এতো অজস্র প্রকারভেদ যে প্রক্রিয়াজাত তার নাম রাসায়নিক বিক্রিয়া। ওগুলিই রসায়ন-বিজ্ঞানের সত্যিকার প্রাণশক্তি ও মূল উপকরণ। পৃথিবীতে একটি সেকেণ্ডে কত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে, তার মোটামুটি একটা সংখ্যানির্ণয়ও অসম্ভব।

যেমন, কোন লোক 'সেকেণ্ড' কথাটি উচ্চারণ করতে চাওয়ামাত্র তার মস্তিষ্কে বহু রাসায়নিক প্রকরণ সংঘটিত হবে। আমরা কথা বলি, চিন্তা করি, ফুর্তিতে মাতি, উদ্বিগ্ন হই। কিন্তু এর সবগুলিই অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ানির্ভর। ঐ বিক্রিয়াগুলি আমাদের চোখে কখনই ধরা পড়ে না। কিন্তু আরও হাজার রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিত্য ঘটে, আমাদের কাছাকাছি ঘটে, কিন্তু আমরা ফিরেও তাকাই না।

...কড়া চায়ে এক টুকরো লেবু দিই। চা ফিকে হয়ে যায়। দেশলাইয়ে কাঠি ঠুকি, আগুন জ্বলে ওঠে। গাছ কয়লায় পরিণত হয়।

এ সবগুলিই রাসায়নিক পরিবর্তন।

যে আদিম মানুষ প্রথম আগুন জেবলেছিল, সে প্রথমতম রাসায়নিকও। ইচ্ছাকৃত প্রথম রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের সে-ই প্রথম হোতা। বলা বাহুল্য, বিক্রিয়াটি দহন এবং তা মানবেতিহাসের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়, শ্রেষ্ঠতম ঘটনা।

আমাদের অতিদূর পূর্বপুরুষরা এরই তাপে তাদের শীতার্ত গৃহে একদা উষ্ণতা সঞ্চারিত করতেন। আজ আকাশে বহু টন ওজনের রকেট পাঠিয়ে দহনই আমাদের জন্য মহাশূন্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। প্রমিথিয়াস কর্তৃক মানুষকে প্রথম
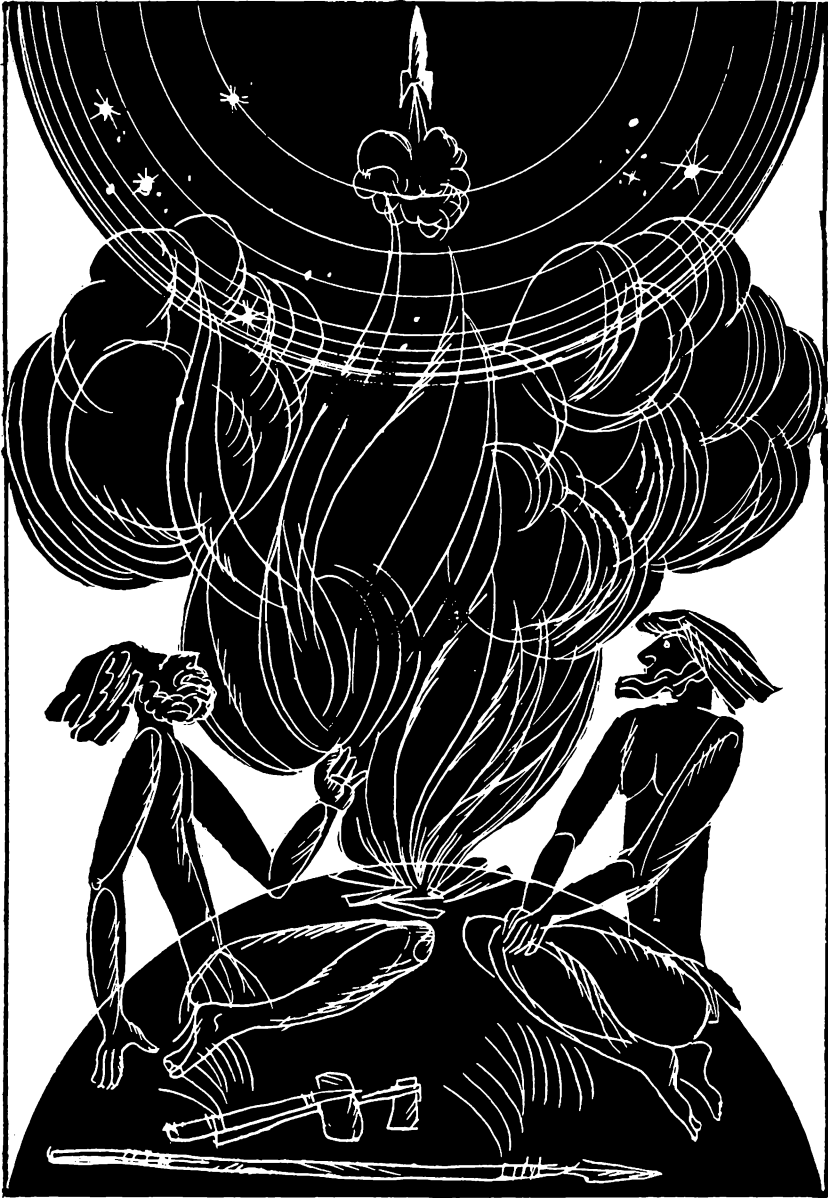
আগুনের অধিকারদানের কাহিনীটি আসলে প্রথম রাসায়নিক বিক্রিয়া সঙ্ঘটনের কাহিনীও।

পদার্থ সরল হোক, জটিল হোক, বিক্রিয়ালগ্ন হলে আমরা সাধারণত তা জানতে পারি।

সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে এক টুকরো দস্তা ফেলুন। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের বুদ্বুদ ওঠা শুরু হবে আর অল্পক্ষণের মধ্যে টুকরোটিও যাবে মিলিয়ে, দস্তা অ্যাসিডে বিগলিত ও হাইড্রোজেন মুক্ত হবে। বিক্রিয়াটি নিজের হাতেই করে দেখুন।

কিংবা গন্ধকের টুকরো জ্বালান। ওর শিখাটি নীলচে। সালফার ডাইঅক্সাইডের গন্ধে আপনার শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা হবে। রাসায়নিক যৌগটি গন্ধক ও অক্সিজেনের সমাবন্ধনে উৎপন্ন।

অনার্দ্র তুঁতেকে $CuSO_4$ জলসিক্ত করলে সাদা গুড়ো পরক্ষণেই নীল হয়ে ওঠে। লবণটি জলের সঙ্গে মিশে তুঁতের নীল রঙ কেলাস $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ তৈরি করে। এ ধরনের পদার্থ কেলাসী হাইড্রেট নামে পরিচিত।

জানেন, চুন নেভানো কী? কলি চুনে জল ঢাললে, নরম চুন $Ca(OH)_2$ তৈরি হয়। পদার্থটির অপরিবর্তিত রঙ সত্ত্বেও নেভানোর ফলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে, প্রচুর তাপোদ্‌গারেই তা চোখে পড়ে।

রাসায়নিক বিক্রিয়ামাত্রেই তাপশক্তি শোষণ অথবা উদ্‌গীরণের প্রাথমিক ও অনিবার্য শর্তের অধীন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপোদ্‌গারের পরিমাণ কখনও অত্যুচ্চ এবং সহজে অনুভব্য, কখনও অত্যল্প এবং বিশেষ যন্ত্রে পরিমাপ্য।

বিদ্যুৎ বিজলী ও কচ্ছপ

বিস্ফোরণ — মারাত্মক জিনিস। মুহূর্তে ঘটে বলেই বিস্ফোরণ এত ভয়ানক।

কিন্তু বিস্ফোরণ কী? বিস্ফোরণ প্রচুর গ্যাস উদ্‌গীরণকারী একটি সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ামাত্র। বুলেটের অভ্যন্তরে বারুদের দহন অথবা ডিনামাইট বিস্ফোরণের মতো মুহূর্তের মধ্যে সঙ্ঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়াই এর দৃষ্টান্ত।

কিন্তু বিস্ফোরণ চরম বিক্রিয়া। অধিকাংশ বিক্রিয়াতেই অল্পবিস্তর সময় লাগে।

কোন কোন বিক্রিয়া এতই শ্লথগতি যে, তার অস্তিত্বই দুর্নিরীক্ষ ঠেকে।

...জলের দুই উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক। এদের যদি কোন পাত্রে রাখা হয় তবে দিন, মাস, বছর ও শতাব্দী শেষে কিছুই ঘটবে
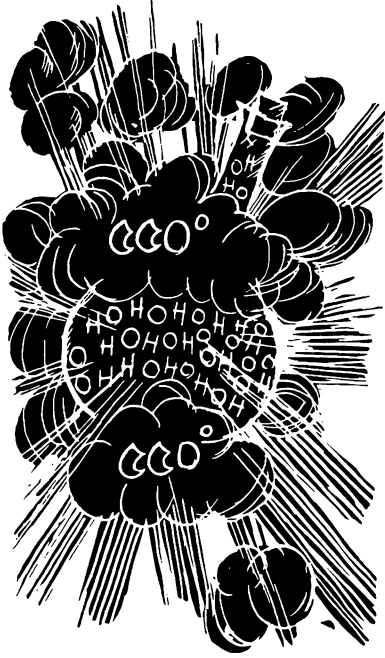
না। বাষ্পের একটি ফোঁটাও জমবে না পাত্রের গায়ে। হয়ত মনে হবে হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে মোটেই মিশছে না। কিন্তু তা নয়। ওরা মিশছে এবং অত্যন্ত ধীরে। পাত্রে চোখে পড়ার মতো জল জমতে লাগবে হাজার বছর।

কিন্তু কেন? তাপমাত্রাই এর কারণ। কক্ষতাপে (১৫-২০ ডিগ্রি) হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হয় অতি ধীরে। কিন্তু পাত্রটিতে তাপ দিলে অচিরেই ওর গা ঘামতে শুরু করবে। এর নিশ্চিত অর্থ বিক্রিয়া ঘটছে। ৫৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পাত্রটি চূর্ণবিচূর্ণ হবে। এ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়া বিস্ফোরণশীল।

মুক্তাবস্থায় হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন H_2 এবং O_2 অণু হিসেবেই অবস্থিত। কেবলমাত্র সংঘর্ষ মাধ্যমেই এরা জল উৎপাদনে সক্ষম। জলের অণু উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিমাণ সংঘর্ষের সংখ্যার উপরই নির্ভরশীল। কক্ষতাপ ও সাধারণ চাপে একটি হাইড্রোজেন অণু প্রতি সেকেণ্ডে অক্সিজেন অণুর সঙ্গে ১০০০ কোটি বার সংঘর্ষলিপ্ত হয়। সংঘর্ষটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পর্যবসিত হলে তা বিস্ফোরণের চেয়েও দ্রুত গতিতে — সেকেণ্ডের হাজার কোটি ভাগের একভাগ সময়ে নিষ্পন্ন হত!

অথচ পাত্রে আমরা কোনই পরিবর্তন দেখি না: আজ, কাল, এমন কি দশ বছরেও না। সাধারণ অবস্থায় কোন সংঘর্ষ দৈবাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়। এর কারণ সংঘর্ষটি তখন ঘটে আণবিক পর্যায়ে।

আসলে বিক্রিয়ালিপ্ত হবার আগে পরমাণু পর্যায়ে এদের বিভক্তি কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে, নিজ নিজ অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুর যোজ্যতার বন্ধন দুর্বল হওয়া প্রয়োজন। দুর্বলতার যে মাত্রায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মতো বিসম পরমাণুর সমাবন্ধনও আর অবরুদ্ধ হয় না, এখানে তাই বাঞ্ছনীয়। তাপমাত্রাই বিক্রিয়ার গতিসঞ্চারক। এতে সঙ্ঘর্ষের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি

পায়। এরই প্রভাবে অণুরাশি সজোরে কম্পিত হয়, তাদের যোজ্যতার বন্ধনে দৌর্বল্য দেখা দেয়। অতঃপর, পরমাণু পর্যায়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সাক্ষাৎ ঘটলে এরা তৎক্ষণাৎ বিক্রিয়ালিপ্ত হয়।

জাদু-প্রতিবন্ধ

কল্পনা করুন।

হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্রই জল উৎপন্ন হল। লৌহের পাতে বাতাস লাগামাত্রই লালচে-বাদামী মরিচা দেখা দিল আর কয়েক মিনিটেই নিরেট, উজ্জ্বল ধাতুপাতটি লৌহ অক্সাইডের শিথিল চূর্ণে পরিণত হল।

যেন পৃথিবীর যাবতীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াই ঈর্ষণীয় গতিতে ঘটছে; নিজস্ব সঞ্চিত শক্তি নির্বিশেষেই অণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হচ্ছে। সংঘর্ষমাত্রই দু'টি অণু রাসায়নিক বন্ধনে বাঁধা পড়তে বাধ্য।

ফলত, জারিত হয়ে সকল ধাতু পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হল। জীবন্ত কোষে এবং অন্যত্র অবস্থিত সকল জটিল জৈব পদার্থ সরল তথা সুস্থিততর যৌগে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তাহলে পৃথিবী অচেনা এক জগৎ হয়ে উঠত। এখানে জীবনের অস্তিত্ব থাকত না, থাকত না রসায়ন। উদ্ভট এই পৃথিবী ভরে উঠত রাসায়নিক বিক্রিয়াঅনীহ স্থায়ী যৌগে।

সৌভাগ্য, আমরা এমন কোন দুর্দশায় পীড়িত নই। এরূপ সার্বিক 'রাসায়নিক ধ্বংসে'র পথ এক জাদু-প্রতিবন্ধে অবরুদ্ধ।

প্রতিবন্ধটি বিকারক শক্তি নামে খ্যাত। অণুর শক্তির মাত্রা বিকারক শক্তির সমপরিমাণ অথবা তা অতিক্রম না করলে অণু রাসায়নিক বিক্রিয়ালিপ্ত হয় না।

সাধারণ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মতো বহু অণুর শক্তিই বিকারক শক্তির সমপরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশি থাকে। এমতাবস্থায়, অতি ধীরে হলেও জল উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি শ্লথ, কারণ এখানে পর্যাপ্ত শক্তিধর অণুর সংখ্যা অত্যল্প। কিন্তু তাপনের ফলে বহু অণুই বিকারক শক্তির মাত্রা অতিক্রম করে এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন অণুর রাসায়নিক মিথষ্ক্রিয়ার ঘটনা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

যে সাপের মুখে লেজ

ঔষধের নির্দিষ্ট প্রতীকটি অতীত ঐতিহ্য থেকে নেওয়া। বহু দেশের সামরিক ডাক্তাররাই আজ কাঁধে যে ব্যাজ পরেন, তাতে লাঠিতে পেঁচানো অথবা বাটির দণ্ডে জড়ানো সাপের প্রতিকৃতি থাকে।

রসায়নেও অনুরূপ একটি প্রতীক আছে। প্রতীকটি একটি সাপ যার মুখে লেজ।

প্রাচীনরা বহু অলৌকিক প্রতীকে বিশ্বাসী ছিলেন। এদের কোন কোনটি আজও ইতিহাসবিদের ব্যাখ্যাসাধ্য নয়।

এ তো গেল অলৌকিক প্রতীকের কথা। কিন্তু এই 'রাসায়নিক সাপ'টির অর্থ সুস্পষ্ট। পূর্বানুবৃত্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ার এটি প্রতীক।

জলসংশ্লেষে হাইড্রোজেনের দুইটি ও অক্সিজেনের একটি পরমাণুর সমবায়ে জলের একটি অণু তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে জলের অন্যতর একটি অণু স্বীয় উপাদানে তৎক্ষণাৎ বিভক্ত হয়। দু'টি বিপরীত বিক্রিয়াই সমকালে সংঘটিত: জলসংশ্লেষ (পুরোগামী) এবং জলবিয়োজন (পশ্চাদ্গামী)। রাসায়নিক পদ্ধতিতে এর উপস্থাপনা: $2H_2 + O_2 \rightleftarrows 2H_2O$। ডান ও বামের তীরদু'টিতে যথাক্রমে পুরোগামী ও পশ্চাদ্গামী বিক্রিয়া প্রদর্শিত।

রাসায়নিক বিক্রিয়ামাত্রেই মুখ্যত পূর্বানুবৃত্তিশীল এবং ঘটনাটি ব্যতিক্রমহীন।

প্রথমে পুরোগামী বিক্রিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। শুরু হয় জলের অণু তৈরি। তারপরই পশ্চাদ্গামী বিক্রিয়ার আরম্ভ। শেষে, এক পর্যায়ে গঠিত ও বিয়োজিত জলের অণুসংখ্যা সমান হয়ে ওঠে এবং বাম থেকে ডানে ও ডান থেকে বামে — উভয় বিক্রিয়াই একই গতিমাত্রা অর্জন করে।

রাসায়নিকের ভাষায় অবস্থাটি ভারসাম্যের নজির।

সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ই এক সময় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোথায়ও তা তাৎক্ষণিক, কোথায়ও-বা কয়েক দিনের ব্যাপার। প্রতিটি ক্ষেত্রে এক-একরকম।

নিজ বাস্তব কাজে রসায়ন দু'টি লক্ষ্য সাধনে সচেষ্ট। প্রথমত, রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে হবে, যাতে সমস্ত আদি উপাদান পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় সর্বাধিক পরিমিত উৎপাদ তৈরিতে এটি সচেষ্ট। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রাসায়নিক ভারসাম্যের সম্ভাব্য বিলম্বন অপরিহার্য। পুরোগামী বিক্রিয়া — হ্যাঁ, পশ্চাদ্গামী বিক্রিয়া — না।

আর এখানেই রাসায়নিককে গাণিতিক হতে হয়। তিনি দুই পরিমাণ — উৎপাদ ও আদি পদার্থের ঘনত্বের অনুপাত নির্ণয় করেন।

এখানে অনুপাতটি ভগ্নাংশ। কোন ভগ্নাংশের লব যত বড়, হর যত ছোট, ভগ্নাংশটিও সে পরিমাণের বড় হয়।

পুরোগামী বিক্রিয়ার প্রাধান্যে উৎপাদমাত্রা কালক্রমে আদি পদার্থের পরিমাণকে অতিক্রম করে। লব তখন হর অপেক্ষা বড়, এর ফল বিসম ভগ্নাংশ। বিপরীত ক্ষেত্রে ভগ্নাংশটির সুসমতাই সম্ভাব্য।

রাসায়নিকের ভাষায় ভগ্নাংশের এই মাত্রা বিক্রিয়ার ভারসাম্যের ধ্রুবক এবং তা K চিহ্নিত। রাসায়নিক যদি বিক্রিয়া থেকে প্রয়োজনীয় সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদ প্রত্যাশা করেন, তবে তাঁকে প্রথমেই বিভিন্ন তাপমাত্রায় K-র মান নির্ণয় করতে হবে।

'অঙ্কটি'র বাস্তব চেহারা নিম্নরূপ।

কক্ষতাপে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষে K-র মান প্রায় ১০,০০,০০,০০০। মনে হয়, নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ এমতাবস্থায় মুহূর্তেই অ্যামোনিয়ায় পরিণত হবে। কিন্তু মোটেই তা ঘটে না। পুরোগামী বিক্রিয়া অত্যন্ত শ্লথ। তাপমাত্রা বাড়ালে কি কোন ফল হবে?

মিশ্রণটিকে ৫০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হোক।

কিন্তু রাসায়নিক উদ্যোগটি গোড়াতেই থামিয়ে দেবেন:

'কী যে করছেন আপনারা? কোন কাজই হবে না এভাবে!'

তিনি যথাসময়েই আমাদের থামিয়েছেন। রাসায়নিক এর অঙ্ক জানেন। দেখুন: ৫০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় K হবে মাত্র ৬,০০০, ৬ × ১০^৩ ! এ তো পশ্চাদ্গামী বিক্রিয়ারই $(2NH_3 \rightarrow 3H_2+N_2)$ 'মহেন্দ্রক্ষণ'। তাই তাপনে কোনই ফল ফলত না। বৃথাই আমরা এর কারণ খুঁজতাম।

অ্যামোনিয়া সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজন যথাসম্ভব নিম্ন তাপ ও অত্যুচ্চ চাপ। রাসায়নিক বিক্রিয়ারাজ্যের শাসক আর একটি নিয়মই এখানে সহায়ক।

নিয়মটির আবিষ্কারক ফরাসী বিজ্ঞানী লে শাতেলিয়ে। তাঁরই নামানুসারে এটি শাতেলিয়ে সূত্র নামে পরিচিত।

কাঠে আটকানো একটি স্প্রিঙের কথা কল্পনা করুন। এটি যদি প্রসারিত কিংবা সঙ্কুচিত না থাকে, তবে বলা যায় এটি ভারসাম্যে স্থিত রয়েছে। স্প্রিঙটি টানলে কিংবা চাপলে তার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, এর সম্প্রসারণরোধী কিংবা সঙ্কোচনরোধী স্থিতিস্থাপক শক্তিসমূহ বৃদ্ধি পায়। শেষে, উভয় শক্তিই আবার ভারসাম্যে স্থিত হয়। স্প্রিঙটিতে আবার ভারসাম্য ফিরে আসে, কিন্তু কোনক্রমেই তা আর পূর্বাবস্থায় নয়। সম্প্রসারণ অথবা সঙ্কোচনের দিকে নতুন ভারসাম্যটির ঈষৎ স্থানচ্যুতি ঘটে।

প্রসারিত স্প্রিঙের ভারসাম্য পরিবর্তনের ঘটনাটি লে শাতেলিয়ের রীতির একটি উপমা (যদিও স্থূল)। রসায়নে তা এভাবে সূত্রবদ্ধ। ধরা যাক, একটি বাহ্য শক্তি ভারসাম্য ব্যবস্থার উপর সক্রিয়। তখন বাহ্য শক্তির প্রভাবানুসারে ভারসাম্যের দিকপরিবর্তন ঘটবে। এমতাবস্থায় সক্রিয় শক্তির প্রতিবন্ধে বাহ্য শক্তিগুলি ভারসাম্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া অবধি এই স্থানান্তরণ অব্যাহত থাকবে।

আমরা আবার অ্যামোনিয়া উৎপাদনের প্রসঙ্গে ফিরি। সংশ্লেষের সমীকরণ অনুসারে ৪ ঘনমান গ্যাস (হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত ৩ : ১) থেকে ২ ঘনমান গ্যাসীয় অ্যামোনিয়া ($2NH_3$) উৎপন্ন হয়। বাহ্য চাপ প্রয়োগে ঘনমানের সঙ্কোচন ঘটে। এ ক্ষেত্রে প্রভাবটি অনুকূল। 'স্প্রিঙটি সঙ্কুচিত'। বিক্রিয়া মূলত এখানে বাম থেকে ডানমুখী: $3H_2 + N_2 \longrightarrow 2NH_3$ এবং অ্যামোনিয়া উৎপাদন বর্ধমান।

অ্যামোনিয়া সংশ্লেষে তাপমুক্তি ঘটে। আমরা যদি তাপ প্রয়োগ করি, বিক্রিয়া ডান থেকে বামমুখী হবে। কারণ, তাপনে গ্যাসের ঘনমান বৃদ্ধি পায় আর এখানে বিক্রিয়াভুক্ত দ্রব্যের ($3H_2$ এবং N_2) ঘনমান উৎপাদের ($2NH_3$) ঘনমান অপেক্ষা অধিক। সুতরাং, পুরোগামিতার উপর পশ্চাদ্‌গামী বিক্রিয়ার আধিপত্য অবধারিত। 'স্প্রিংটি' সম্প্রসারিত হবে।

উভয় প্রভাবের ফলেই একটি নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়ার উৎপাদ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা দ্রুত খর্বিত হয়।

'কচ্ছপে' 'তড়িৎ গতি' সঞ্চারণ এবং তদ্বিপরীত...

শতাব্দীকাল আগে জনৈক রাসায়নিক হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণপূর্ণ পাত্রে অতি সতর্কভাবে প্ল্যাটিনামের একটি তার প্রবেশ করান।

ফল ফলল অভাবিত। পাত্রটি কুয়াশায় অর্থাৎ জলীয় বাষ্পে ভরে উঠল। তাপ, চাপ কিছুই বদলাল না। অথচ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যে বিক্রিয়ার জন্য 'হিসেবমতো' হাজার হাজার বছর প্রয়োজন, তা ঘটল মুহূর্তে।

কিন্তু বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়। দেখা গেল, গ্যাসদু'টিকে তৎক্ষণাৎ সংযুক্তকারী প্ল্যাটিনাম তারটির কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। এর চেহারা, রাসায়নিক সংস্থিতি, ওজন বিক্রিয়ার পূর্ববৎ অটুট আছে।

বিজ্ঞানীরা তো জাদুকর নন। চালবাজীতে জনসাধারণকে তাক লাগানো তাঁদের পেশা নয়। উপরোক্ত ব্যক্তিটি নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি জার্মান রাসায়নিক ডোবেরাইনার। প্রক্রিয়াটিকে এখন অনুঘটন বলা হয়। যে উপাদানে 'কচ্ছপ তড়িৎগতি পায়' তারই নাম অনুঘটক। এদের সংখ্যা যথার্থই বিরাট। অনুঘটক ধাতু, নিরেট অথবা চূর্ণ হরেক রকম মৌলের অক্সাইড, লবণ অথবা ক্ষার হতে পারে। এরা বিশুদ্ধ অবস্থায় অথবা মিশ্রণরূপে ব্যবহার্য।

চাপ ও তাপের যত রদবদলই হোক, অনুঘটক ছাড়া অ্যামোনিয়া উৎপাদন যথেষ্ট ফলপ্রসূ নয়। অনুঘটক ব্যবহারে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সাধারণ ধাতব লৌহের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম ও পটাসিয়াম অক্সাইড দু'টির মিশ্রণ প্রয়োগে বিক্রিয়ার গতিবেগ উল্লেখ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পায়।
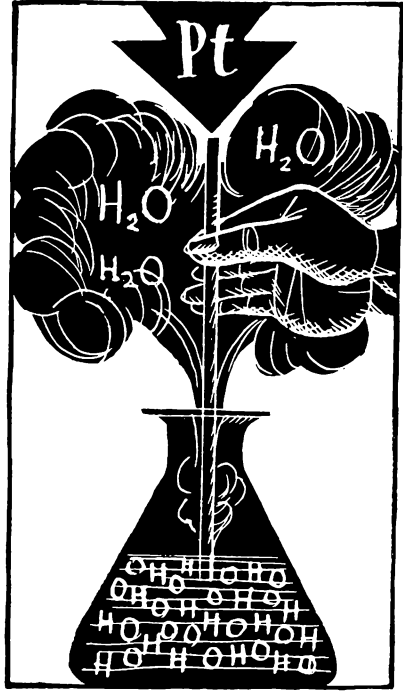
বিশশতকী রসায়ন তার নজিরবিহীন উন্নতির জন্য অনুঘটকের কাছে সবিশেষ ঋণী। আর এটিই শেষ কথা নয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের বহু প্রাণদ প্রক্রিয়া উৎসেচক নামক অনুঘটকনির্ভর। জীব ও জড়ের রসায়নে এই আশ্চর্য ত্বরকের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী!

কিন্তু প্ল্যাটিনামের বদলে তাম্র, অ্যালুমিনিয়াম, অথবা লৌহের তার নিলে? এতে পাত্রের গায়ে কুয়াশার আঁচ লাগবে? না, প্ল্যাটিনামের জাদুকাঠি ছাড়া আর কিছুতেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বিক্রিয়ালিপ্ত হবার প্রবণতা দেখাবে না।

পদার্থমাত্রেই যেকোন নির্দিষ্ট বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে না। তাই রাসায়নিকরা বলেন, অনুঘটক কার্যত নির্বাচনপটু। একটি বিক্রিয়াকে তারা প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু অন্যটি সম্পর্কে পুরোপুরি নিস্পৃহ থাকে। অবশ্য, নিয়মটির ব্যতিক্রম আছে। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে জৈব ও অজৈব যৌগের কয়েক ডজন

সংশ্লেষক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন অনুঘটক একই মিশ্রণকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও নানা ধরনের উৎপাদ তৈরি করে।

উন্নেতা নামক পদার্থগুলির বৈচিত্র্যও কিছুমাত্র কম নয়। এরা নিজে বিক্রিয়ার গতিকে প্রভাবিত করতে — তা বাড়াতে বা কমাতে পারে না। কিন্তু অনুঘটকের সঙ্গে ব্যবহারে এতে বিক্রিয়ার গতি মূল অনুঘটক অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, অথবা সিলিকন ডাইঅক্সাইডের 'ভেজালপৃক্ত' প্ল্যাটিনাম তারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ প্রবলতরভাবে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়।

অনুঘটক ও অনুঘটনের প্রতিপক্ষ হিসেবে অনুঘটনরোধী পদার্থও আছে। বিজ্ঞানীরা তাদের বাধক বলেন। রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি মন্দীকরণেই এরা সক্রিয়।

শৃঙ্খল বিক্রিয়া

...ধরা যাক, ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণ কোন ফ্লাস্কে আছে। সাধারণ অবস্থায় তারা অতি ধীরে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়। কিন্তু এর কাছাকাছি ম্যাগ্নেসিয়ামের টুকরোটি জ্বালিয়ে দেখুন।

মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটবে (পরীক্ষা করতে হলে ফ্লাস্কটিকে অবশ্যই শক্ত তারের জালে ঢাকবেন)।

ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ উজ্জ্বল আলোর পাশাপাশি কেন বিস্ফোরিত হয়?

শৃঙ্খল বিক্রিয়া সংযোগই এর কারণ।

আমরা যদি ফ্লাস্কটিকে ৭০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করি, তা বিস্ফোরিত হবে। তখন ভগ্নাংশ মুহূর্তে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের তাৎক্ষণিক সমাবন্ধন ঘটবে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমরা জানি তাপের ফলে অণুর কর্মকারী শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পূর্বোক্ত পরীক্ষায় তাপমাত্রার কোনই পরিবর্তন ঘটে নি। বিক্রিয়াটি আসলে আলো-প্রভাবিত।

আলোর ক্ষুদ্রতম কণিকা — কোয়াণ্টামে যে শক্তি সংহত থাকে, অণুকে সক্রিয় করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। আলো-কোয়াণ্টামের সঙ্গে ক্লোরিন অণুর সংঘর্ষ ঘটলে, কোয়াণ্টামের আঘাতে অণু পরমাণুতে বিভক্ত ও পরমাণুগুলিতে কোয়াণ্টামের শক্তি সঞ্চারিত হয়।

ক্লোরিন অণুগুলি এখন শক্তিসমৃদ্ধ ও উত্তেজিত। অতঃপর এরা হাইড্রোজেন অণুর প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলে তাকে পরমাণুতে বিভক্ত করে। এই শেষোক্ত

পরমাণুগুলির একটি ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হয় ও অন্যটি মুক্ত থাকে। কিন্তু মুক্ত পরমাণুটি তখন উত্তেজিত। শক্তির একাংশ নিষ্কাশনে সে অস্থির। কিন্তু কোথায়? কেন, যেকোন ক্লোরিন অণুতে। আর সে ক্লোরিন অণুর সঙ্গে সংঘর্ষমাত্রই ওদের সকল ঔদাসিন্যের সমাপ্তি। এখন আবার একটি সক্রিয় ক্লোরিন পরমাণুর জন্ম হল। কিন্তু শক্তিদানের জন্য পরমাণুটির অতঃপর আর অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

আর এভাবেই ধারাবাহিক শৃঙ্খল বিক্রিয়ার উদ্ভব। বিক্রিয়া শুরু হলেই বিক্রিয়াজাত শক্তিতে ক্রমান্বয়ে অধিকসংখ্যক অণু কর্মকারী শক্তি লাভ করে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া হিমানী প্রপাতের মতো এই বিক্রিয়ার মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ধসটি উপত্যকায় নামলেই সবকিছু শান্ত। সকল অণুর অন্তর্ভুক্তি, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সবক'টি অণু বিক্রিয়ালিপ্ত হলেই শৃঙ্খল বিক্রিয়ার সমাপ্তি।

রাসায়নিকরা শৃঙ্খল বিক্রিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। বিক্রিয়াটির খুঁটিনাটি গবেষণায় এদেশের প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী নিকোলাই সেমিওনভের অবদান সর্বস্বীকৃত। শৃঙ্খল বিক্রিয়া পদার্থবিদদেরও জানা প্রসঙ্গ। নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস বিভাজন ভৌত শৃঙ্খল বিক্রিয়ার একটি নজির।

রসায়ন ও বিদ্যুতের মিতালি

সম্ভ্রান্ত, উচ্চপদাসীন একজন ব্যক্তির পক্ষে কাজটি তেমন মানানসই নয়।

তিনি অনেকগুলি ধাতব চাকতি তৈরি করলেন। তাম্র, দস্তার গণ্ডা গণ্ডা চাকতি। তারপর স্পঞ্জের গোল টুকরো কেটে লবণদ্রবে ডুবালেন। তিনি এগুলিকে স্তূপাকারে সাজালেন, যেন শিশুর তৈরী পিরামিড। কিন্তু তাঁর সাজানোর একটা নির্দিষ্ট ধরন ছিল: তাম্র চাকতি, স্পঞ্জের টুকরো, দস্তার চাকতি। স্তূপটি হেলে না পড়া অবধি বিন্যাসটি বহুবার পুনরাবৃত্ত হল।

স্তূপের মাথা তিনি ভেজা আঙ্গুলে স্পর্শ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত সরিয়ে নিলেন। আজকের ভাষায়, তিনি তড়িতাহত হয়েছেন। এই হল ১৮০০ সালে ইতালির বিখ্যাত পদার্থবিদ আলেসান্দ্রো ভোল্টা কর্তৃক আবিষ্কৃত বিদ্যুতের অন্যতম রাসায়নিক উৎস — গ্যালভেনিক কোষ। 'ভোল্টা স্তম্ভে' বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে।

অতঃপর জন্ম নিল বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা: তড়িতরসায়ন।

বিজ্ঞানীরা উল্লেখ্য সময় অবধি বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি নতুন যন্ত্র পেলেন। 'ভোল্টা স্তম্ভে' রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষ না হওয়া অবধি বিদ্যুৎধারা অব্যাহত থাকত।

বিভিন্ন পদার্থের উপর বিদ্যুতের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ অতঃপর একটি আকর্ষণীয় প্রকল্প হয়ে উঠল।

দুজন ব্রিটিশ, কার্লাইল এবং নিকোল্‌সন জল নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের প্রথম জন ডাক্তার ও দ্বিতীয় জন ইঞ্জিনিয়র। জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ, রাসায়নিকরা সে সম্পর্কে ততদিনে নিশ্চিত হলেও তাঁদের হাতে এর কোন চূড়ান্ত প্রমাণ ছিল না।

কার্লাইল ও নিকোল্‌সন ১৭ ভোল্টা কোষের একটি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তৈরি করলেন। এতে শক্তিশালী তড়িৎ উৎপন্ন হল। তড়িতাঘাতে জলে দেখা দিল প্রবল বিয়োজন প্রক্রিয়া। জল বিভক্ত হল দু'টি গ্যাসে — হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে। কিংবা বলা যায় জলের তাড়িদ্বিশ্লেষ শুরু হল। পদার্থের তড়িৎ-বিয়োজন নামেই প্রক্রিয়াটি পরিচিত।

পয়লা নম্বর শত্রু...

দুনিয়াজোড়া হাজার হাজার ব্লাস্ট ফার্নেসে ইস্পাত ও লৌহ তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিবিদ চলতি ও আগামী বছর কত লক্ষ টন ধাতু উৎপন্ন হবে তার চুলচেরা হিসেব-নিকেশ করেন।

আর এই অর্থনীতিবিদরাই যখন বলেন, প্রতি অষ্টম ব্লাস্ট ফার্নেসে বেহুদা কাজ করছে, আমরা তখন অবাক হই। প্রতি বছর উৎপন্ন ধাতুর ১২ শতাংশই মানুষের কোন কাজে না এসে মাঠে মারা যায় সেই নির্দয় হন্তার শিকার হয়।

শত্রুটি আমাদের অতি পরিচিত। সে মরিচা। বিজ্ঞানে প্রক্রিয়াটি ধাতু-অবক্ষতি নামে পরিচিত।

কেবল লৌহ ও ইস্পাতই এর একমাত্র শিকার নয়। তাম্র, টিন ও দস্তারও এ থেকে রেহাই নেই।

অবক্ষতির অর্থ ধাতুজারণ। অনেক ধাতু মুক্তাবস্থায় যথেষ্ট সুস্থিত নয়। ধাতব জিনিসের চকচকে চেহারা বাতাসের ছোঁয়ায় কালক্রমে বিচিত্র রঙের সর্বনাশী অক্সাইড-আবরণে ঢাকা পড়ে।

জারিত ধাতু ও মিশ্রধাতুর বহু সদ্‌গুণবঞ্চিত। এমতাবস্থায় এদের দৃঢ়তা, স্থিতিস্থাপকতা, তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহণের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

অবক্ষতি শুরু হলে মাঝপথে আর কখনই থামে না। ধীরে হলেও, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই 'পিঙ্গল শয়তান'টি ধাতুর জিনিসটিকে পুরোপুরি শেষ করবেই। শুরুতে গুটিকয়েক অক্সিজেন অণু ধাতুর উপরে আটকে যায় এবং প্রথম কয়েকটি
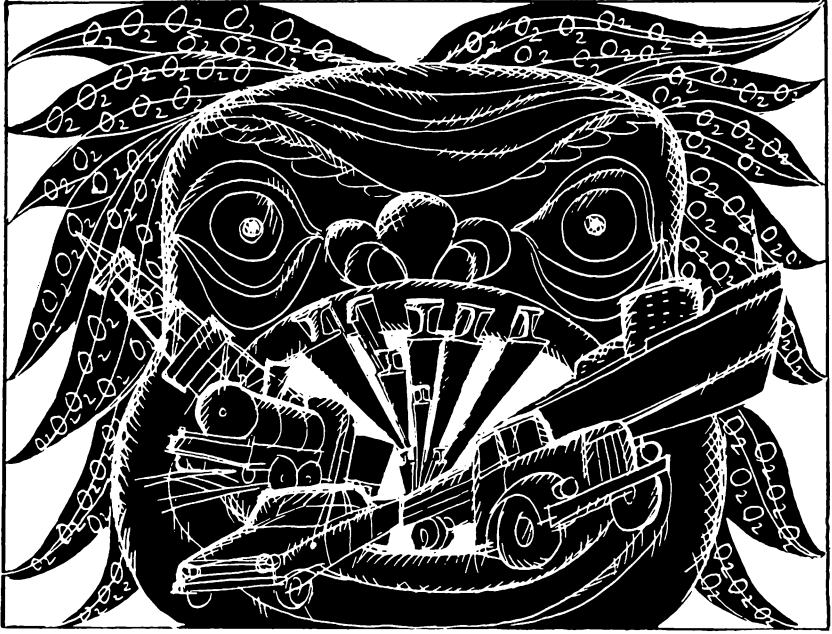
অক্সাইড অণু তৈরি হয়। দেখা দেয় অক্সাইডের পাতলা আস্তর। আস্তরটি যথেষ্ট শিথিল, প্রায় ছাঁকনির মতো ঝাঁঝরা এবং এর ভেতর দিয়ে গড়িয়ে পড়ামাত্রই ধাতুর পরমাণু জারিত হয়। আস্তরের ছিদ্র পথে অক্সিজেন অণুও ধাতুর গভীরে প্রবেশ করে এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে।

অধিকতর আগ্রাসী রাসায়নিক প্রতিবেশে অবক্ষতি দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। ক্লোরিন, ফ্লোরিন, সালফার ডাইঅক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সালফাইড কিন্তু ধাতুর ফেলনা শত্রু নয়। গ্যাস-প্রভাবিত ধাতুর অবক্ষয় প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানীরা গ্যাসীয় অবক্ষতি বলেন।

আর নানাবিধ দ্রবণ? এরাও ধাতুর মারাত্মক শত্রু। সাধারণ সমুদ্রজলের কথাই ধরা যাক। মহাকায় সামুদ্রিক জাহাজের নিচ ও পাশের অবক্ষয়িত ধাতুপাত বদলানোর জন্য মাঝে মাঝে পোতাশ্রয়ে জাহাজ মেরামত করতে হয়।

প্রসঙ্গত, জনৈক মার্কিন কোটিপতির একটি ভুলের শিক্ষাপ্রদ কাহিনীটি উল্লেখ্য।

তার ইচ্ছা ছিল দুনিয়ার সেরা ইয়টের মালিক হবার। জাহাজ তৈরির ফরমাশ পাঠিয়েই সে একটি রোমাণ্টিক নামও ঠিক করল: ‘সমুদ্রের ডাক’। টাকাকড়ি খরচের

কোন কমতি ছিল না। ঠিকাদাররা ক্রেতাকে খুশি করার জন্য প্রাণান্ত করল। বাকি রইল শুধু ভেতরের সাজসজ্জার কাজটি।

কিন্তু জাহাজটিকে আর সমুদ্রে যেতে হল না। জলযাত্রা অনুষ্ঠানের দিনকয়েক আগেই এর সারা কাঠামো ও তলা মরচে পড়ে ঝাঁজরা হয়ে গেল।

কেন? কারণ, অবক্ষতি তড়িতরাসায়নিক বিক্রিয়া।

নির্মাতারা জাহাজটির তলা জার্মান সিলভার নামের নিকেল ও তাম্রের মিশ্রধাতু দিয়ে তৈরি করেছিল। বুদ্ধিটি ভালই ছিল। দামী হলেও লোনা জলের অবক্ষয় এড়ানোর পক্ষে জার্মান সিলভার চমৎকার বৈকি। কিন্তু ধাতুটি তেমন মজবুত নয়। তাই জাহাজটির অনেক অংশই অন্যতর ধাতু — বিশেষ ধরনের ইস্পাতে তৈরি করা হয়েছিল।

আর এতেই সর্বনাশটি হল। জাহাজের জার্মান সিলভার ও ইস্পাতের সংযোগস্থানে শক্তিশালী গ্যালভেনিক কোষের উদ্ভব ঘটল, শুরু হল তলার দ্রুত অবক্ষয়। পরিণতিটি মর্মান্তিক। কোটিপতি গভীর দুঃখে মুষড়ে পড়ল। জাহাজ নির্মাতাদেরও একটি শিক্ষা হল। তারা অবক্ষতির একটি নতুন নিয়ম জানল: মূল ধাতুর সঙ্গে অন্য ধাতুর ব্যবহারে গ্যালভেনিক কোষের উদ্ভব ঘটলে অবক্ষতি ত্বরিত হয়।

...এবং এর প্রতিবিধান

দিল্লীর একটি আশ্চর্য মিনার বহু শতাব্দী পুরানো। খাঁটি লোহের ব্যবহারই মিনারটির অনন্য বৈশিষ্ট্য। মহাকাল তার কাছে অবনত। বহু যুগ পরে মিনারটি আজও যেন নতুন — সে লৌহমলে কলঙ্কিত হয় না। অবক্ষতি এখানে যেন পরাহত...

দূর অতীতের ধাতুবিদরা কিভাবে খাঁটি লৌহ তৈরি করেছিলেন, সে এক রহস্য। কল্পনাবিলাসীদের মতে মিনারটি পৃথিবীর মানুষের তৈরি নয়। গ্রহান্তরবাসীদের পৃথিবী পদার্পণের এটি এক স্মারকবিশেষ।

অবশ্য, মিনারটির উৎস সংক্রান্ত রহস্যকল্পনা এড়িয়ে রাসায়নিকরা এতে শিক্ষণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ খুঁজে পান: ধাতু যত খাঁটি তার অবক্ষতির গতিমাত্রাও সে পরিমাণেই ধীর। মরিচা এড়াতে বিশুদ্ধতম ধাতুই ব্যবহার্য।

আর কেবল বিশুদ্ধতাই নয়, ধাতুদ্রব্যের ফিনিশিংও সর্বাধিক উন্নত মানের হওয়া প্রয়োজন। উপরিতলের 'উচু' বা 'নিচু' জায়গায় বহিস্থ বর্জ্য সঞ্চিত হয়। বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ররা আদর্শ মসৃণ উপরিতল নির্মাণে এখন সমর্থ। এ ধরনের মসৃণ উপকরণ ইতিমধ্যেই রকেট ও মহাশূন্যযানে ব্যবহৃত।

অবক্ষতি সমস্যার সমাধান তা হলে এ-ই? মোটেই না। বিশুদ্ধ ধাতু দুর্মূল্য এবং যথেষ্ট পরিমাণে সহজলভ্য নয়। আবার মিশ্রধাতুই ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পছন্দ: এদের গুণাগুণের পরিসর অধিকতর ব্যাপ্ত। আর মিশ্রণটি কমপক্ষে দু'টি ধাতুর হওয়া চাই।

রাসায়নিকরা অবক্ষতি প্রক্রিয়ার সকল খুঁটিনাটিই সন্ধান করেছেন। ঈপ্সিত গুণের কোন মিশ্রধাতু তৈরির আগে 'অবক্ষতি'র বিষয়টি তাঁরা পুঙখানুপুঙখভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এখনকার বেশ কিছু মিশ্রধাতুর অবক্ষয়রোধী ক্ষমতা খুব বেশি।

আমরা ঘরকন্নায় রাং ঝালাই ও টিন কলাই করা জিনিস প্রতিদিন ব্যবহার করি। টিন বা দস্তামোড়া এই জিনিসগুলি মরিচা এড়িয়ে অনেক দিন ব্যবহারোপযোগী থাকে। তা ছাড়া, লৌহের পাতে ছাওয়া ছাদে রঙের ব্যবহার তো সর্বত্রই চোখে পড়ে।

অবক্ষতি দুর্বলতর কিংবা বিলম্বিত করার অর্থ অবক্ষতি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত তড়িৎরাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ মন্দীকরণ। বিশেষ জৈব ও অজৈব পদার্থের তথাকথিত বাধকই এজন্য ব্যবহার্য।

ভুলভ্রান্তি মাধ্যমে চেষ্টা করে করে শেষে এগুলি হঠাৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জার পিতারের রাজত্বকালের আগেই রুশ কামান নির্মাতারা একটি অদ্ভুত প্রক্রিয়া জানত। তারা কামান নলের মরিচা সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে মুছে ফেলত। তবে তার আগে অ্যাসিডে তুঁষের মিশ্রণ ছিটাত। এই আদি পদ্ধতিতে অ্যাসিডের আক্রমণ থেকে ধাতু রক্ষায় তারা সফল হয়েছিল।

বাধক সন্ধান এখন আর কোন প্রত্যাদিষ্ট, কিংবা আপতিক ব্যাপার নয়। এটি একটি নিখুঁত বিজ্ঞান। অবক্ষতি মন্দীভূত করার শত শত রাসায়নিক পদার্থ আজ ব্যবহৃত।

'ক্ষয়াক্রান্ত' হবার আগেই ধাতুর 'স্বাস্থ্য' সম্পর্কে সতর্কতা প্রয়োজন। 'ধাতুচিকিৎসক' রাসায়নিকদের এটাই প্রথম কর্তব্য।

একটি প্রদীপ্ত উচ্ছ্রয়

পদার্থের অবস্থা কত প্রকার? আধুনিক পদার্থবিদরা সাতটি প্রকারভেদ নির্ধারণ করেছেন — কমও নয় বেশিও নয়। অবশ্য পদার্থের তিন অবস্থা — গ্যাসীয়, তরলিত ও কঠিন সর্বজনজ্ঞাত। দৈনন্দিন জীবনে এর বাড়তি আর কিছু কখনই আমরা জানি না।

তিন শতাব্দী ধরে রসায়নের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্পর্কে তার কৌতূহলের শুরু কেবলমাত্র গত দুই দশক থেকে। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্‌মা।

বলতে কী, প্লাজ্‌মাকে গ্যাসও বলা যায়। কিন্তু তা অসাধারণ। প্রশমিত পরমাণু ও অণু ছাড়াও এতে আয়ন ও ইলেকট্রন থাকে। সাধারণ গ্যাসও আয়নিত কণাযুক্ত এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির নিরিখে এতে এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, আয়নিত গ্যাস ও প্লাজ্‌মার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তবু, গ্যাস বিদ্যুৎ পরিবহণের অত্যুচ্চ ক্ষমতা লাভ করলেই তাকে প্লাজ্‌মা বলা প্রথাসিদ্ধ। আসলে এই পরিবহণ ক্ষমতাই প্লাজ্‌মার অন্যতম প্রধান ধর্ম।

হঠাৎ শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও প্লাজ্‌মাই কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের শাসক। সূর্য, নক্ষত্র এবং মহাশূন্যের গ্যাসসমূহের পদার্থ প্লাজ্‌মার অবস্থায় থাকে। এটি প্রাকৃতিক প্লাজ্‌মা। পৃথিবীতে এটি প্লাজ্‌মোট্রন নামে বিশেষ যন্ত্রে কৃত্রিমভাবে তৈরি হয়। বিবিধ গ্যাসকে (হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন) বৈদ্যুতিক চাপের সাহায্যে প্লাজ্‌মায় রূপান্তরিত করার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহৃত। প্লাজ্‌মোট্রনের সংকীর্ণ মুখনল ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্লাজ্‌মার উজ্জ্বল ফোয়ারার সংকোচন ঘটে এবং এতে বহু হাজার ডিগ্রি তাপ উৎপন্ন হয়।

রাসায়নিকরা বহুদিন থেকেই এমন এক তাপমাত্রার স্বপ্ন দেখছিলেন। বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অত্যুচ্চ তাপমাত্রার অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত। এখন স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হয়েছে, জন্ম নিয়েছে এক নতুন রসায়নশাখা:প্লাজ্‌মা রসায়ন বা 'শীতল' প্লাজ্‌মার রসায়ন।

শীতল 'প্লাজ্‌মা' কেন? কারণ, 'তপ্ত' প্লাজ্‌মাও আছে এবং এর তাপমাত্রা বহু লক্ষ ডিগ্রি। এই প্লাজ্‌মার সাহায্যেই পদার্থবিদরা তাপনিউক্লীয় সংশ্লেষ অর্থাৎ হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরের নিয়ন্ত্রিত পারমাণবিক বিক্রিয়া সংঘটনে এখন সচেষ্ট।

কিন্তু রাসায়নিকরা 'শীতল' প্লাজ্‌মাতেই তুষ্ট। দশ হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরীক্ষার মতো আকর্ষী প্রকল্প আর কী আছে?

নৈরাশ্যবাদীরা একে নিষ্ফল প্রয়াস মনে করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, এত উচ্চ তাপমাত্রায় সকল পদার্থেরই নির্বিশেষ ধ্বংস ঘটবে এবং জটিলতম অণুরাশি পরমাণু ও আয়নে পৃথকীভূত হবে।

বাস্তব অবস্থা জটিলতর প্রকটিত হল। দেখা গেল, প্লাজ্‌মা শুধু বিধ্বংসীই নয়, সে স্রষ্টাও। অন্যথা অসম্ভাব্য সমেত বহু অভিনব রাসায়নিক যৌগ এতে সহজেই সংশ্লেষিত হল। Al_2O, Ba_2O_3, SO, SiO, CaCl ইত্যাদি পদার্থগুলি একেবারে আনকোরা এবং রসায়নের কোন পাঠ্যগ্রন্থেই প্রাপ্তব্য নয়। এই যৌগগুলির মৌলরাশি অস্বাভাবিক, ব্যতিক্রমী যোজ্যতার পরিচয় দিল। এগুলি খুবই আকর্ষী। কিন্তু প্লাজ্‌মা রসায়নের লক্ষ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ: জ্ঞাত মহার্ঘ পদার্থের সুলভ ও দ্রুত উৎপাদন। এই তো গেল উদ্দেশ্য।

এবার কিছু সাফল্যের কথা বলা যাক।

প্লাস্টিক, রবার, রঙ, ঔষধ তৈরির অন্যতম অপরিহার্য উপাদান অ্যাসেটিলিন। কিন্তু আজও অ্যাসেটিলিন উৎপাদিত হয় সেই আদিকালের পদ্ধতিতে, ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে জলে ভিজিয়ে। পদ্ধতিটি অসুবিধাজনক আর মহার্ঘ।

প্লাজ্‌মোট্রনে ব্যাপারটি একেবারে আলাদা। হাইড্রোজেন থেকে তৈরি প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা এখানে ৫,০০০ ডিগ্রি। মিথেন ভর্তি একটি বিশেষ রিয়েক্টরে হাইড্রোজেন প্লাজ্‌মার ফোয়ারা থেকে প্রচণ্ড তাপ পরিবাহিত করা হয়। অতঃপর, বিপুল বেগে মিথেন ও হাইড্রোজেনের মিশ্রণ ঘটে এবং সেকেণ্ডের $\frac{১}{১০,০০০}$ সময়ে ৭৫ শতাংশ মিথেনই অ্যাসেটিলিনে রূপান্তরিত হয়।

আদর্শ ব্যবস্থা, তাই না? তাই! কিন্তু হায়, সর্বত্র, সর্বক্ষণ কিছু বাধা থাকবেই।

অ্যাসেটিলিনকে আর এক মুহূর্ত সময় প্লাজ্‌মার উচ্চ তাপে রাখলেই তার ভাঙন শুরু হয়। সুতরাং, তাপমাত্রাকে তৎক্ষণাৎ নিরাপদমাত্রায় নামিয়ে আনা প্রয়োজন। নানা ভাবেই তা সম্ভব। কিন্তু এখানেই যত ইঞ্জিনিয়রিং সংক্রান্ত গলদ। অদ্যাবধি মাত্র ১৫ শতাংশ অ্যাসেটিলিনকেই অনিবার্য বিয়োজন থেকে বাঁচানো গেছে। আর তাও খুব খারাপ নয়!

সস্তা তরল হাইড্রোকার্বনকে প্লাজ্‌মা-রাসায়নিক পদ্ধতিতে ভেঙ্গে অ্যাসেটিলিন, ইথিলিন ও প্রোপিলিন উৎপাদনের একটি কৌশলও পরীক্ষাগারে উদ্ভাবিত হয়েছে।

বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি আজও অমীমাংসিত। অ্যামোনিয়া জাতীয় নাইট্রোজেন যৌগাবলীর রাসায়নিক উৎপাদন শ্রমসাধ্য, জটিল ও ব্যয়বহুল। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে শিল্পভিত্তিক নাইট্রোজেন অক্সাইড সংশ্লেষের চেষ্টাটি মহার্ঘ বিধায় কয়েক দশক আগেই পরিত্যক্ত হয়। এখানেও প্লাজ্‌মা রসায়নের শুভ প্রেক্ষিতের ভবিষ্যৎ সহজলক্ষ্য।

সূর্য এক রসায়নবিদ

কথা আছে: বাষ্প চালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কারক স্টিভেন্‌সন ইংলণ্ডের প্রথম রেলপথের পাশে তাঁর বন্ধু বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ব্যাক্‌ল্যান্ডের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করছিলেন। একটি গাড়ি তাঁদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

স্টিভেন্‌সন জিজ্ঞেস করলেন, ‘ব্যাক্‌ল্যান্ড বলুন তো, গাড়ি কেমন করে চলে?’

‘কেন, আপনার আবিষ্কৃত চমৎকার রেল-ইঞ্জিনের কোন চালকের হাতে?’

‘না।’

‘তা হলে যে-বাষ্পে ইঞ্জিন চালায়?’

‘না।’

‘বয়লারের আগুনে?’

‘আবারও না। আসলে, গাড়ি চালাচ্ছে সূর্য, যার আলোকের আশ্রয়ে বেঁচেছিল বহুযুগ আগের গাছপালা আর পরে এরাই রূপান্তরিত হয়েছিল কয়লায়।’

জীবিতমাত্রেই, বিশেষভাবে উদ্ভিদজগৎ সূর্যের উপর নির্ভরশীল। অন্ধকারে এদের জন্মানোর চেষ্টা করেই দেখুন, রসালো কাণ্ডের বদলে পাবেন বিবর্ণ এক সূত্রালী। ক্লোরোফিল (সবুজ পাতার বর্ণকণিকা) সূর্যালোকের সাহায্যেই কার্বন ডাইঅক্সাইডকে জৈব পদার্থের জটিল অণুতে রূপান্তরিত করে এবং এই পদার্থ থেকেই তৈরি হয় উদ্ভিদের দেহবস্তু।

তা হলে সূর্য, কিংবা বলা যায় সূর্যালোকই সেই মূল 'রসায়নবিদ' যে উদ্ভিদের সকল জৈব পদার্থের সংশ্লেষক? মনে হয় তাই। বৃথাই কার্বন আত্মীকরণকে সালোকসংশ্লেষ বলা হয় না।

বহু রাসায়নিক বিক্রিয়া যে সূর্যালোক প্রভাবিত, সে কথা সর্ববিদিত। আলোকরসায়ন নামে রসায়নের একটি বিশেষ শাখাও এজন্য নির্দিষ্ট।

কিন্তু আলোকরাসায়নিক বহু বিক্রিয়া অধ্যয়নের ফলেও অদ্যাবধি পরীক্ষাগারে কোন শর্করা বা প্রোটিনের সংশ্লেষ সম্ভব হয় নি। অথচ এগুলিই উদ্ভিদের সালোকসংশ্লিষিত আদি পদার্থ।

অতি জটিল জৈবাণু সংশ্লেষের জন্য উদ্ভিদ প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র কার্বন ডাইঅক্সাইড, জল ও সূর্যালোক ব্যবহার করে। কিন্তু এই বিক্রিয়ায় অন্যতর কোন উপাদান কি অপরিহার্য নয়?

একটি কারখানা কল্পনা করা যাক, যার একদিকে ঢুকছে সোডিয়াম, খনিজ তেল, পটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি আর অন্য দিক থেকে বেরিয়ে আসছে রুটি, সসেজ, চিনি। স্বপ্নবিলাস বৈকি? কিন্তু উদ্ভিদে তাই ঘটছে।

উদ্ভিদের নিজস্ব অনুঘটক আছে। নাম উৎসেচক। এক-একটি উৎসেচক একটি বিক্রিয়াকেই সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে। দেখা গেছে, সালোকসংশ্লেষে সূর্যই একক 'রসায়নবিদ' নয়, এর সহযোগী উৎসেচকবর্গের (অনুঘটক) ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বিক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস সূর্য, কিন্তু তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে উৎসেচক।

বহু পদার্থ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি, বিশেষভাবে উদ্ভিদের কাছ থেকে আজও তাদের 'পেটেণ্ট' ছিনিয়ে নিতে না পারলেও কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনানুগ উৎপাদনে এদের প্ররোচিত করতে আমরা অবশ্যই সফল হয়েছি। এজন্য সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার গবেষণা থেকে বিজ্ঞানীরা উপকৃত হয়েছেন অত্যধিক। ইদানীং জানা গেছে যে, সালোকসংশ্লেষের সময় বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক ব্যবহারে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদিত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে লাল-হলুদ ও নীল আলো উল্লেখ্য। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে শর্করাই মূল উৎপাদ, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রোটিনেরই আধিক্য।

সুতরাং, মনে হয় উদ্ভিদের সাহায্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয় পদার্থ সংগ্রহের কাল আর দূরবর্তী নয়। হয়ত, কলকারখানা নির্মাণ, এতে অনন্য যন্ত্র বসানো এবং সংশ্লেষের জটিল প্রকৌশলের স্থলবর্তী হিসেবে তৈরি হবে আলো-বর্ণালীর উপাদান

ও তীব্রতা নিয়ন্ত্রিত হট হাউস। অতঃপর, উদ্ভিদ নিজেই প্রয়োজনীয় সবকিছু তৈরি করবে: সরলতম শর্করা থেকে জটিলতম প্রোটিন।

দু'টি ধরনের রাসায়নিক বন্ধ

আদিযুগে, মান্ধাতার আমলেও পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু বস্তুমধ্যে পরমাণুগুলি কীভাবে পরস্পরবদ্ধ? নীরবতা অথবা অতিকল্পনার সমুদ্রে উধাও হওয়া ছাড়া প্রশ্নটির মুখোমুখি দার্শনিকরা তখন নিরুপায়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রখ্যাত ফরাসী নিসর্গী দেকার্ত উল্লেখ্য। তাঁর মতে কিছু পরমাণু হুক ও অন্যগুলি আঙটা যুক্ত এবং আঙটাপ্রবিষ্ট হুকে তারা সন্নিবদ্ধ।

পারমাণবিক সংযুতি সম্পর্কে অল্প জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা বিধায় পরমাণুর পারস্পরিক অন্বয়, রাসায়নিক বন্ধ ইত্যাদির তৎকালীন প্রত্যয় ভিত্তিহীন ছিল। এই সত্য নির্ধারণে বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রন থেকে বিশেষ সহায়তা লাভ করেন। কিন্তু তা রাতারাতি ঘটে নি। ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হয় ১৮৯৭ সালে। কিন্তু ইলেকট্রনভিত্তিক রাসায়নিক বন্ধের ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন ছিল আরও বছর বিশেক অপেক্ষার। পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন বিন্যাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছাড়া তা সম্ভবপর ছিল না।

ইলেকট্রনমাত্রেই রাসায়নিক বন্ধের অংশগ্রাহী নয়। কেবলমাত্র যেগুলি প্রত্যন্ত কিংবা অন্ততপক্ষে প্রত্যন্ত অথবা এর পূর্ববর্তী খোলকে অবস্থিত তারাই এর শরিক।

ধরা যাক, সোডিয়ামের কোন পরমাণুর সঙ্গে ফ্লোরিন পরমাণুর সাক্ষাৎ ঘটল। প্রত্যন্ত খোলকে এদের ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে এক ও সাত। সাক্ষাতের ফলে জন্ম নিল সোডিয়াম ফ্লোরাইডের অতি সুস্থিত অণু। কিন্তু কীভাবে?
ইলেকট্রন পুনর্বিন্যাস করে।

সোডিয়াম পরমাণুর পক্ষে প্রত্যন্ত ইলেকট্রনটি ত্যাগ করা অতি সহজ। ফলত, তা ধনাত্মক আয়নে রূপান্তরিত হয় এবং তার প্রত্যন্তের পূর্ববর্তী ইলেকট্রন খোলক উন্মোচিত করে। এই খোলকের ইলেকট্রন সংখ্যা আট আর অষ্টক ভেঙ্গে ফেলা মোটেই সহজ নয়।

পক্ষান্তরে, ফ্লোরিন পরমাণু তার প্রত্যন্ত খোলকে সানন্দে ঐ বাড়তি ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে। এরই ফলে তার পক্ষে আট ইলেকট্রনের একটি পুরো খোলক পাওয়া সম্ভব হয়। আর এভাবেই ঋণাত্মক আধানযুক্ত ফ্লোরিন আয়নের উদ্ভব।

ধনাত্মককে ঋণাত্মক আকর্ষণ করে। বিপরীত শক্তির বৈদ্যুতিক আধানের জন্য সোডিয়াম ও ফ্লোরিন আয়ন সজোরে পরস্পরাকর্ষিত হয়। এগুলির মধ্যে দেখা দেয় একটি রাসায়নিক বন্ধ। এই আয়নীয় বন্ধ অন্যতম প্রধান রাসায়নিক বন্ধবিশেষ।

দ্বিতীয়টি নিম্নরূপ।

F_2 জাতীয় যৌগ কীভাবে টিকে থাকে? ফ্লোরিন অণু প্রত্যন্ত খোলক থেকে ইলেকট্রন হারাতে পারে না। বিপরীত আধানের আয়ন উৎপাদন এখানে অসম্ভব।

ফ্লোরিণ অণুর রাসায়নিক অন্বয় যুগ্ম ইলেকট্রনধৃত। এখানে প্রতিটি পরমাণু সাধারণ ব্যবহারের জন্য একটি করে ইলেকট্রন সরবরাহ করে। এখন উভয় পরমাণুর প্রত্যন্ত খোলকে ইলেকট্রনের সংখ্যা আট। এই বন্ধ সহযোজী বন্ধ। আমাদের জানা রাসায়নিক যৌগের অধিকাংশই প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধে উৎপন্ন।

রসায়ন ও বিকিরণ

রাসায়নিকরা অদ্যাবধি সবুজ পাতা তৈরি করতে পারেন নি। কিন্তু সালোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই আলো ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আলোকচিত্রের কথা উল্লেখ্য। প্রক্রিয়াটি সালোক রসায়ন সংক্রান্ত। আলোই মুখ্য চিত্রগ্রাহক।

কিন্তু রাসায়নিকদের কৌতূহল কেবলমাত্র আলোক রশ্মিতেই সীমিত নয়। এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণও তো রয়েছে। এগুলো অমিত শক্তিধর। আলোক রশ্মির তুলনায় রঞ্জন ও গামা রশ্মির 'তীব্রতা' যথাক্রমে বহু হাজার ও বহু লক্ষগুণ বেশি।

রাসায়নিকের পক্ষে অতঃপর এদের অবহেলা করা কীভাবে সম্ভব?

আর তাই বিশ্বকোষ ও পাঠ্যগ্রন্থ, বিশেষ গ্রন্থাবলী ও রচনা, জনপ্রিয় পুস্তিকা ও নিবন্ধাদিতে একটি নতুন শব্দ ইদানীং চোখে পড়ছে। শব্দটি 'তেজরসায়ন'। বিজ্ঞানের এই শাখাটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবসন্ধানে রত।

শাখাটি নবীনতর হলেও ইতিমধ্যেই সে উল্লেখ্যসংখ্যক সাফল্যের গৌরব অর্জন করেছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে তৈলরসায়নের অন্যতম সাধারণ প্রক্রিয়া — ক্র্যাকিং উল্লেখ্য। এরই মাধ্যমে জটিল জৈব যৌগাবলীকে সরল যৌগে ভেঙ্গে ফেলা হয়। ভাঙ্গনের ফলে উৎপন্ন হাইড্রোকার্বনই পেট্রলের অন্যতম উপাদান।

ক্র্যাকিং প্রক্রিয়া অত্যন্ত নাজুক। উচ্চ তাপ, অনুঘটক ও দীর্ঘ সময় এজন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত সবই সেকেলে ব্যাপার। নতুন পন্থায় ক্র্যাকিং'এ তাপ, রাসায়নিক ত্বরক ও দীর্ঘ সময় নিষ্প্রয়োজন।

নতুন পদ্ধতিতে গামা রশ্মি ব্যবহৃত। এই ক্র্যাকিং বিকিরণজাত। এতে জটিল জৈব অণুসমূহের ভাঙ্গন ঘটে। বিকিরণ এখানে ধংসাত্মক।

কিন্তু সর্বত্র তা হয় না।

মিথেন, ইথেন, অথবা প্রোপেনের মতো হালকা গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনে ইলেকট্রন ধারা (বিটা রশ্মি) চালিত হলে জটিলতর অণু জন্মে, পূর্বোক্ত গ্যাসগুলি ভারি তরল হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত হয়। বিকিরণ এখানে ধ্বংসাত্মক নয়, সংশ্লেষাত্মক।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির অণু-'সীবন' ক্ষমতাটি পলিমারিজেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার্য।

আমরা সকলেই পলিএথিলিনের কথা জানি। কিন্তু আমরা এটি তৈরির আত্যন্তিক জটিলতার কথা জানি না। পলিএথিলিন তৈরিতে উচ্চ চাপ, বিশেষ অনুঘটক ও নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি অপরিহার্য। বিকিরণজাত পলিমারিজেসনে পূর্বোক্ত সবই নিষ্প্রয়োজন। এতে পলিএথিলিন উৎপাদনের খরচ অর্ধেক কমে যায়।

তেজরসায়নের ব্যাপক সাফল্যের কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লিখিত হল। স্মরণীয়, তালিকাটি দিনে দিনে দীর্ঘতর, আকর্ষণীয়তর হচ্ছে।

কিন্তু তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মাত্রেই মানুষের বন্ধু নয়। এরা শত্রুও — ধূর্ত, নির্দয় শত্রু। এতে বিকিরণজাত ব্যাধি দেখা দেয়।

দুরারোগ্য ব্যাধিটির সর্বজনীন নিদান আজও অনাবিষ্কৃত। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এড়িয়ে চলাই এর সর্বোত্তম পন্থা।

কিন্তু কীভাবে? সীসকের টুকরো, কয়েক মিটার পুরু কংক্রিটের প্রাচীর, ধাতু ও পাথরের পুরু আস্তরে রশ্মিটি যথেষ্টই শোষিত হয়। কিন্তু তা ব্যয়বহুল, কষ্টসাধ্য ও অসুবিধাজনক। সীসক পোষাকে কাউকে কল্পনা করে দেখুন না···

রাসায়নিক, আপনারা কোথায়? মানুষকে তেজাঘাত থেকে বাঁচানোর কোন সহজ পথ কি আপনারা আবিষ্কার করতে পারে না?

এই ধারার প্রথম পরীক্ষা (অদ্যাবধি কেবল পরীক্ষাই) ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

ফোটোগ্রাফিক প্লেট ও ফিল্ম রঞ্জনরশ্মি দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত হয়। সিল্‌ভার ব্রোমাইড অবদ্রবের আলোসংবেদী আস্তর এতে ভেঙ্গে পড়ে।

এবার দেখুন, ইতালির রাসায়নিকরা চার বছর আগে এ নিয়ে কী কাজ করেছিলেন। তাঁরা ফোটোগ্রাফিক প্লেটকে অজৈব পদার্থ টিটানিয়াম সালফেট ও সেলেনিয়াম অ্যাসিডের দ্রবণে ভিজিয়ে নেন। দেখা গেল, শুধু দৃষ্ট আলোই নয়, রঞ্জনরশ্মিতেও প্লেটটি এখন অসংবেদী।
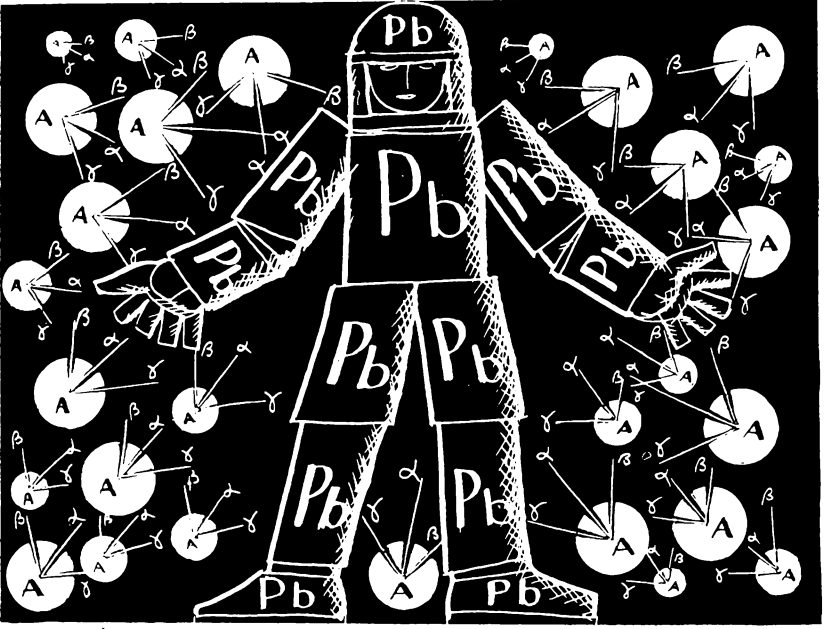
এর কারণ কী? সিল্‌ভার ব্রোমাইড ও পূর্বোক্ত পদার্থদু'টির বিক্রিয়াজাত কোন নতুন যৌগে কি তেজাঘাত প্রহৃত হয়েছে?

মোটেই না! কোন বিক্রিয়াই এখানে ঘটে নি। প্লেটটি জলে ভাল করে ধুয়ে ফেললেই এর পুরো সংবেদনশীলতা আবার ফিরে আসে। তা হলে কী ঘটেছে? কেউই এর উত্তর জানে না। হয়ত, এই সঙ্কেতেই নিহিত আছে তেজস্ক্রিয়তা থেকে আত্মরক্ষার এক অপ্রত্যাশিত সম্ভাবনা।

আর আমরা মনশ্চক্ষে দেখছি — বিশেষ রাসায়নিক পদার্থপুক্ত সাধারণ পোষাকে মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এরা এই হন্তা রশ্মির ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দীর্ঘতম বিক্রিয়া

অধুনা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে শত শত, হাজার হাজার অতি জটিল জৈব যৌগ তৈরি করেছেন। এদের কোন কোনটি এতই জটিল যে কাগজে এদের সংযুতি সঙ্কেত লেখাও মোটেই সহজ নয়। আপাতত, সেজন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন।

প্রোটিন অণুর সংশ্লেষই জৈব রাসায়নিকদের প্রশ্নাতীত শ্রেষ্ঠতম কীর্তি, আর অণুটি অতি প্রয়োজনীয় এক প্রোটিনের।

আমরা ইন্সুলিনের রাসায়নিক সংশ্লেষের কথা বলছি। হরমোনটি দেহের শর্করা বিপাকের নিয়ন্তা।

স্মরণীয়, এই প্রোটিন অণুর সংযুতির কোন কোন খুঁটিনাটি অদ্যাবধি রসায়ন বিশেষজ্ঞদের কাছেও সুস্পষ্ট নয়। এর অন্তর্ভুক্ত মৌলের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও ইন্সুলিন সত্যিকার মহাণু। কিন্তু মৌলাবলী সেখানে অত্যন্ত বিচিত্র সমাবন্ধনে বিন্যস্ত।

সরলীকরণের জন্য ধরা যাক, ইন্সুলিন অণু দুই অংশ কিংবা দুই শৃঙ্খলে গঠিত। শৃঙ্খলদু'টি A এবং B এবং এরা ডাইসালফাইড বন্ধে যুক্ত। ভাষান্তরে, এরা আড়াআড়িভাবে স্থাপিত দু'টি গন্ধক অণু দ্বারা যেন সেতুবন্দী।

ইন্সুলিনের উপর চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনাটি নিম্নরূপ। প্রথমে A ও B শৃঙ্খল আলাদাভাবে সংশ্লেষিত হল। তারপরই আড়াআড়ি স্থাপিত ডাইসালফাইড বন্ধে তাদের সংযোজন।

এবার কিছু অঙ্ক কষা যাক। বিজ্ঞানীরা প্রায় শ'খানেক অনুবর্তী বিক্রিয়ায় A শৃঙ্খলটি তৈরি করেন। আর B-র জন্য প্রয়োজন হয় শতাধিক বিক্রিয়ার। সব মিলিয়ে কয়েক মাসের কাজ, শ্রমসাধ্য কাজ।

শেষে, দু'টি শৃঙ্খলই পাওয়া গেল। এবার এদের সংযোজনের কাজ। আর এখানেই যত সব জটিলতা। ব্যর্থতার যেন কমতি নেই। তা সত্ত্বেও এক শুভ সন্ধ্যায় পরীক্ষাগারের ডায়ারিতে সংক্ষেপে লেখা হল: 'ইন্সুলিন অণুর পূর্ণ সংশ্লেষ সম্পন্ন হয়েছে।'

ইন্সুলিনের কৃত্রিম সংশ্লেষে বিজ্ঞানীদের দুই শ' তেইশটি ক্রমিক স্তর উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সংখ্যাটি ভেবে দেখুন: জানা অন্য কোন রাসায়নিক যৌগ তৈরিতে আর এত জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় নি। দশ জন লোক এজন্য কাজ করেছেন অবিরাম তিন বছর...

কিন্তু জৈব রাসায়নিকদের হিসেবমতো জীবন্ত কোষে এই প্রোটিন তৈরিতে সময় লাগে... দুই থেকে তিন সেকেন্ড।

তিন বছর বনাম তিন সেকেন্ড! আজকের রসায়নের তুলনায় জীবন্ত কোষের সংশ্লেষক সরঞ্জাম কত না নিখুঁত!

রসায়নের জাদুঘর
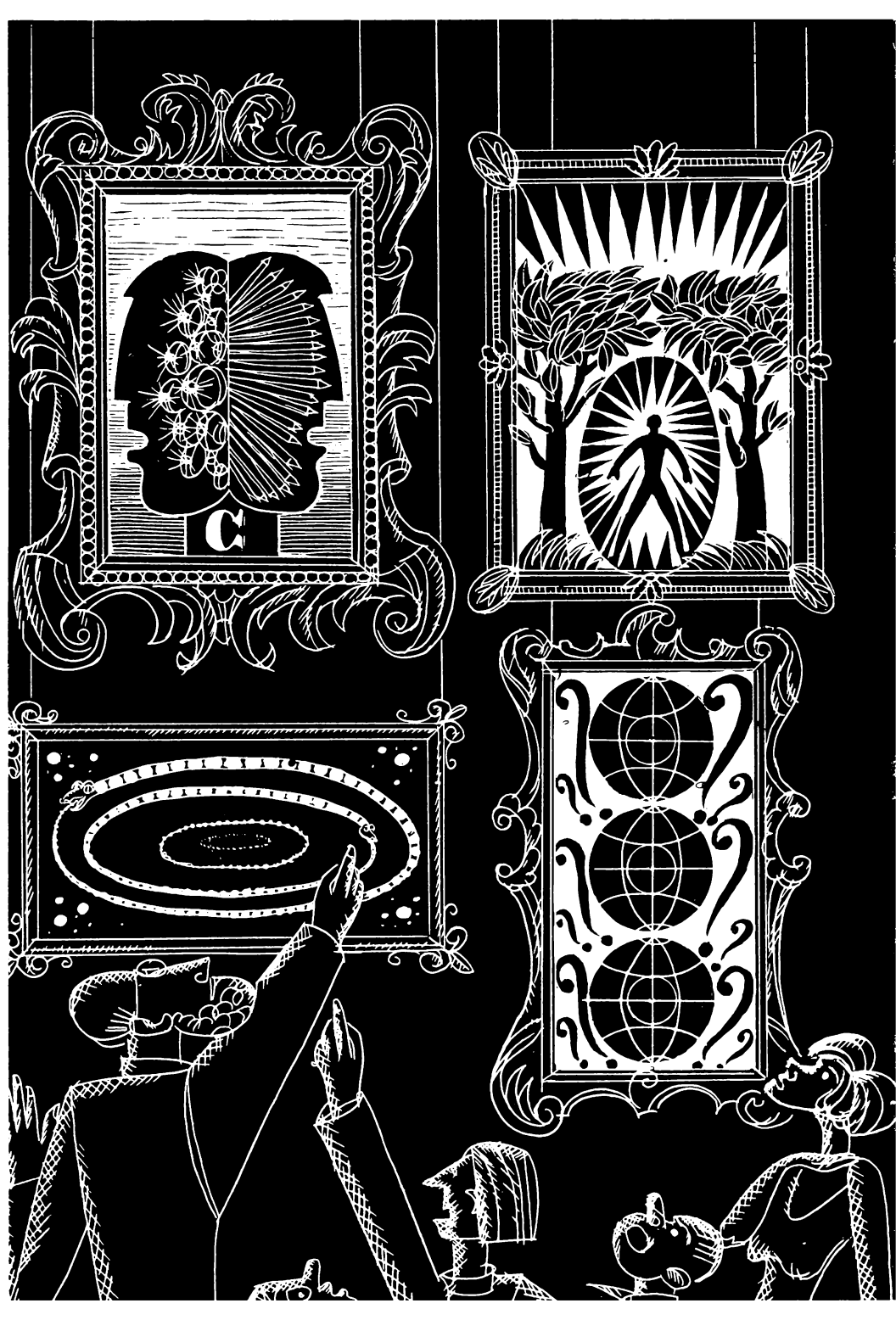
যে প্রশ্নের জবাব নেই

পর্যায়বৃত্তের মৌলাবলী থেকে উৎপাদ্য রাসায়নিক যৌগের সম্ভাব্য সংখ্যা কত? পৃথিবীর সম্মিলিত সেরা রাসায়নিকরাও এর মোটামুটি একটি সন্তোষজনক উত্তরদানে ব্যর্থ হবেন।

আমরা সরলতম রাসায়নিক যৌগটি জানি। এটি হাইড্রোজেন অণু। এর চেয়ে সরলতর যৌগের অস্তিত্ব অসম্ভব। হাইড্রোজেনই মেন্দেলেয়েভ সারণীর প্রথমতম এবং লঘুতম প্রতিনিধি। হাইড্রোজেন অণুরই গঠন ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানীদের জটিল ভৌত তত্ত্বাদি এবং জটিলতর গাণিতিক হিসেব-নিকেশের শরণাপন্ন হতে হয়।

কিন্তু জটিলতমটি? প্রশ্নটির সঠিক উত্তর আজও অজ্ঞাত। বহু হাজার, বহু লক্ষ এমন কি বহু কোটি অণুপুঞ্জিত সত্যিকার মহাণু সম্পর্কেও রসায়ন অবহিত। তবুও এই জটিলতার সীমানা আছে কি না, কেউ জানে না।

পক্ষান্তরে, জ্ঞাত রাসায়নিক যৌগের মোটামুটি নির্ভুল একটি হিসেব দেওয়া হয়ত সম্ভব। কিন্তু আজকের সংখ্যাটি আগামী কালই পুরানো হয়ে যাবে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত নতুন পদার্থের দৈনিক হার ডজনখানেক এবং বছরে বছরেই তা বাড়ছে।

রাসায়নিক তথ্যসরবরাহ কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে প্রকাশ, প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে পৃথকীকৃত এবং কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত রাসায়নিক যৌগের মোট সংখ্যা এখন প্রায় ত্রিশ লক্ষ।

সংখ্যাটি মনোহারী। কিন্তু বড় বাড়ির বাসিন্দাদের সকলের অবদান এতে মোটেই সমান নয়।

যেমন, বর-গ্যাসবর্গ — হিলিয়াম, নিয়ন ও আর্গনের কথাই ধরা যাক। এদের যৌগের সংখ্যা শূন্য। বিরলমৃত্তিক জাতীয় মৌল প্রোমেথিয়াম থেকে উৎপাদিত (পদার্থবিদদের হাতে পারমাণবিক রিয়েক্টরে এটি তৈরি) প্রামাণিক যৌগ মাত্র তিনটি এবং তাও অতি সাধারণ হাইড্রেট, নাইট্রেট ও ক্লোরাইড মাত্র। অন্যান্য কৃত্রিম মৌলের অবস্থাও তেমন কিছু ভাল নয়। এদের কোন কোনটির ক্ষেত্রে উৎপাদিত পরমাণুর সংখ্যা গণাই সার… এদের যৌগ সম্পর্কে-বা কী বলা সম্ভব!

কিন্তু মেন্দেলেয়েভ সারণীতে একটি অনন্য মৌল আছে। যৌগ পদার্থ উৎপাদনে তার জুড়ি মেলা ভার।

সে বড় বাড়ির ৬ নং ঘরের বাসিন্দা — কার্বন।

আমাদের জানা ত্রিশ লক্ষ অণুর মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষই কার্বন পরমাণুর

কাঠামোলগ্ন। রসায়নের যে বিশাল শাখাটি এদের গবেষণায় নিযুক্ত, তার নাম জৈব রসায়ন। অন্যান্য সকল মৌলঘটিত যৌগাবলী অজৈব রসায়নের 'প্রভাবাধীন'।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, জৈব পদার্থের পরিমাণ অজৈব পদার্থের প্রায় ছয় গুণ।

নিয়মানুসারে, জৈব পদার্থের সংশ্লেষ সহজতর। অজৈব রাসায়নিকদের এখন উচিত রোজ একটি নতুন যৌগ তৈরি করা। অবশ্য, গত ক'বছরের অভিজ্ঞতায় সম্ভাবনাটি আজ আর দূরবর্তী নয়।

কার্বন পরমাণুর অনন্য বৈশিষ্ট্যই জৈব রাসায়নিকদের সহায়ক।

বৈচিত্র্যের হেতু, ফলশ্রুতি

কার্বন পরমাণু অতি সহজেই সারিবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরি করে।

এদের সবচেয়ে খাটো শৃঙ্খলটি দুই পরমাণুর। দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্যতম হাইড্রোকার্বন ইথেনের কথাই ধরা যাক। এর শৃঙ্খলে কড়া দু'টি: $H_3C — CH_3$। কিন্তু সবচেয়ে লম্বাটি? অদ্যাবধি তা অজ্ঞাত। কার্বনের ৭০টি কড়াযুক্ত শৃঙ্খলের যৌগ অবধি আমরা জানি। (স্মর্তব্য, সাধারণ যৌগের কথাই এখানে বলা হচ্ছে, পলিমারের কথা নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে শৃঙ্খলটি দীর্ঘতর হতে পারে।)

অন্য মৌলের তা সাধ্যাতীত। কেবলমাত্র সিলিকনই ছয়টি কড়ার দুর্লভ সৌভাগ্যে গর্বিত। বিজ্ঞানীরা জার্মেনিয়ামের একটি অদ্ভুত যৌগও তৈরি করেছেন। এটি হাইড্রোজেন জার্মেনাইড: Ge_3H_8। তিনটি ধাতব পরমাণু এতে একই শৃঙ্খলে স্থিত। ধাতুরাজ্যে ঘটনাটি অদ্বিতীয়।

সংক্ষেপে বললে, 'শৃঙ্খল গঠনে' কার্বন একেবারে অতুল্য। কিন্তু কার্বনের শৃঙ্খলটি কেবল রৈখিক হলে জৈব রসায়নে এত বিপুলসংখ্যক যৌগের দেখা মিলত না।

শৃঙ্খলগুলি শাখায়িত তথা বৃত্তবন্দীও হয়। এগুলি বহুভুজী এবং তিন, চার, পাঁচ, ছয় অথবা ততোধিক কার্বনের পরমাণুলগ্ন।

হাইড্রোকার্বন বিউটেনের শৃঙ্খলে কার্বন পরমাণু চারটি:
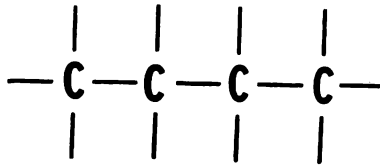
এখানে পরমাণুরা রেখাবন্দী। কিন্তু এদের পক্ষে নিচের বিন্যাসও সম্ভব:
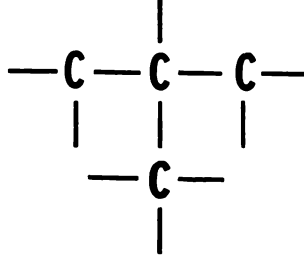
এখানেও পরমাণুর সংখ্যা অভিন্ন, শুধু বিন্যাসটিই পৃথক। কিন্তু শেষের সঙ্কেতটি অন্যতর পদার্থের। এর নাম, ধর্ম সবই আলাদা। এটি আইসোবিউটেন। বহুরূপী আর কী।

পাঁচটি কার্বন পরমাণুর পক্ষে রৈখিক শৃঙ্খল ছাড়াও আরও পাঁচটি শাখা-শৃঙ্খল তৈরি সম্ভব। এ ধরনের প্রতিটি 'সংযুতি' এক-একটি পৃথক রাসায়নিক পদার্থ।

একই পরমাণু সংখ্যার বিভিন্ন বিন্যাসজাত রাসায়নিক পদার্থের জন্য রসায়নে একটি বিশেষ নাম নির্দিষ্ট আছে। এগুলি আইসোমার। অণুতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা যত বেশি, আইসোমারের সংখ্যাও তত বেশি। বস্তুত, এদের সংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতির অনুসারী।

আর এভাবেই সঞ্চিত হয়েছে জৈব রসায়নের ভাঁড়ারে শত সহস্র রকমের নতুন যৌগরাশি।

রাসায়নিক অঙ্গুরি

প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের বিখ্যাত আবিষ্কারের কাহিনীর সীমা-সংখ্যা নেই।

বলা হয়, বাগানে চিন্তামগ্ন নিউটনের পায়ের কাছে হঠাৎ একটি আপেল পড়ে, আর তা থেকেই তিনি পান মহাকর্ষসূত্রের সন্ধান।

বলা হয়, মেন্দেলেয়েভ পর্যায়বৃত্ত সারণীটি প্রথমে স্বপ্নে দেখেন এবং জেগে ওঠে 'স্বপ্ন'টি কাগজে টুকে রাখা ছাড়া তাঁকে আর কিছুই করতে হয় নি।
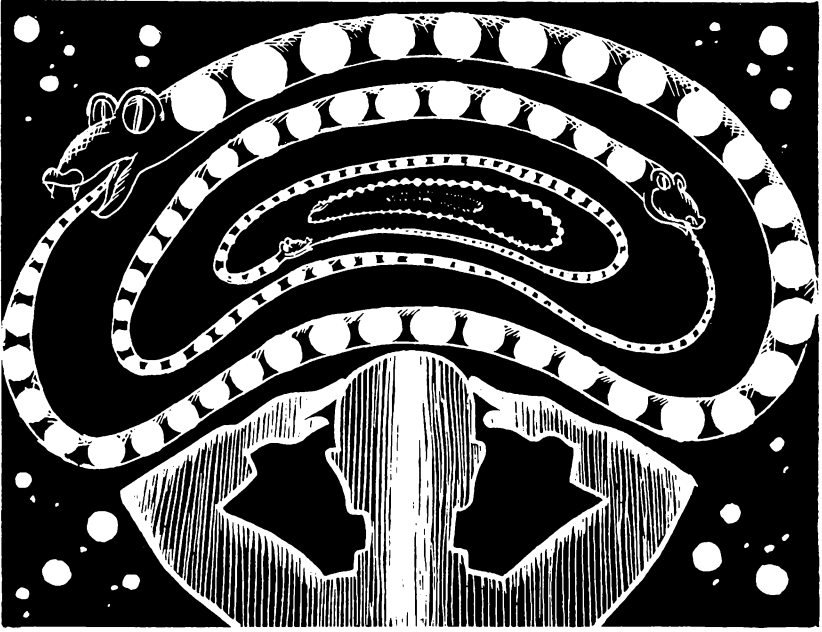
অল্প কথায় আবিষ্কারক ও আবিষ্কার নিয়ে যত বানানো গল্পের ছড়াছড়ি আর কী!

কিন্তু বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক কেকুলে'র ধারণাটির উৎস সত্যিই এক অদ্ভুত ছবি থেকে।

জৈব রাসায়নিক পদার্থের অন্যতম প্রধান বস্তু বেঞ্জিন বিজ্ঞানীদের বহুকালের পরিচিত। তাঁরা জানতেন, বেঞ্জিন ৬টি কার্বন ও ৬টি হাইড্রোজেন পরমাণুতে তৈরি। তাঁরা এর বহুবিধ বিক্রিয়াও পরীক্ষা করেছিলেন।

কিন্তু মূল ব্যাপারটিই তাঁদের অজানা ছিল। কার্বনের ৬টি পরমাণুর বিন্যাস তখনও অনাবিষ্কৃত আর সেজন্য কেকুলের মনে শান্তি ছিল না। সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করা হয়েছিল, তাঁর নিজের মুখেই শুনুন: 'আমি টেবিলের পাশে বসে একটি পাঠ্যবই লিখছিলাম, কিন্তু কোন কাজ এগুচ্ছিল না। আমার মন তখন বহু দূরে। চোখের সামনে পরমাণুর তাণ্ডবলীলা দেখছি। মনশ্চক্ষে সাপের মতো তাদের আঁকাবাঁকা ঘূর্ণ্যমান দীর্ঘ সারি চিনতে পারছিলাম। আরে দেখুন, একটি সাপ

তার লেজ কামড়ে ধরে আমাকে উত্যক্ত করার জন্যই যেন বেদম পাক খেতে লাগল। আমি যেন তড়িতাহত হয়ে হঠাৎ জেগে উঠলাম।'

কেকুলের মনে ভেসে ওঠা এই প্রতিবিম্বেই কার্বন শৃঙ্খলের বৃত্তবন্দী হবার ইঙ্গিত নিহিত ছিল।

কেকুলের পর থেকে বিজ্ঞানীরা বেঞ্জিন সংযুতি এভাবে চিহ্নিত করছেন:

জৈব রসায়নে বেঞ্জিন অঙ্গুরির ভূমিকা অনন্যসাধারণ।

অঙ্গুরি বিভিন্নসংখ্যক কার্বন পরমাণু ধারণে সক্ষম। জ্যামিতিক চিহ্নের আকারে অঙ্গুরিগুলির যোজনও সম্ভবপর। উন্মুক্ত কার্বন অণু-শৃঙ্খলের মতো অঙ্গুরির সংযুতিমাত্রাও বহুবিধ। জৈব রসায়নের যেকোন বই জ্যামিতিতুল্য, কারণ এর পৃষ্ঠাগুলি 'জ্যামিতিক চিহ্ন' অর্থাৎ জটিল জৈব যৌগের সংযুতি সঙ্কেতে প্রায় বোঝাই থাকে।

নিচে বেঞ্জিন অঙ্গুরির দু'টি সম্ভাব্য গড়ন লক্ষ্যণীয়:
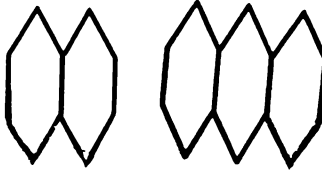
বামের গড়নটি ন্যাফ্থালিনের সংযুতি সঙ্কেত। ডানে শক্ত পাথুরে কয়লার অন্যতম উপাদান অ্যান্থ্রাসিন।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা

মনে করা হত যে, কার্বন যেন ত্রিমূর্তি। বিজ্ঞানীদের মধ্যে অবস্থাটি 'ত্রয়ী' অ্যালোট্রপি নামেই পরিচিত। অথবা অন্য কথায়, একই পদার্থের তিনটি অ্যালোট্রপিক রূপভেদ।

C
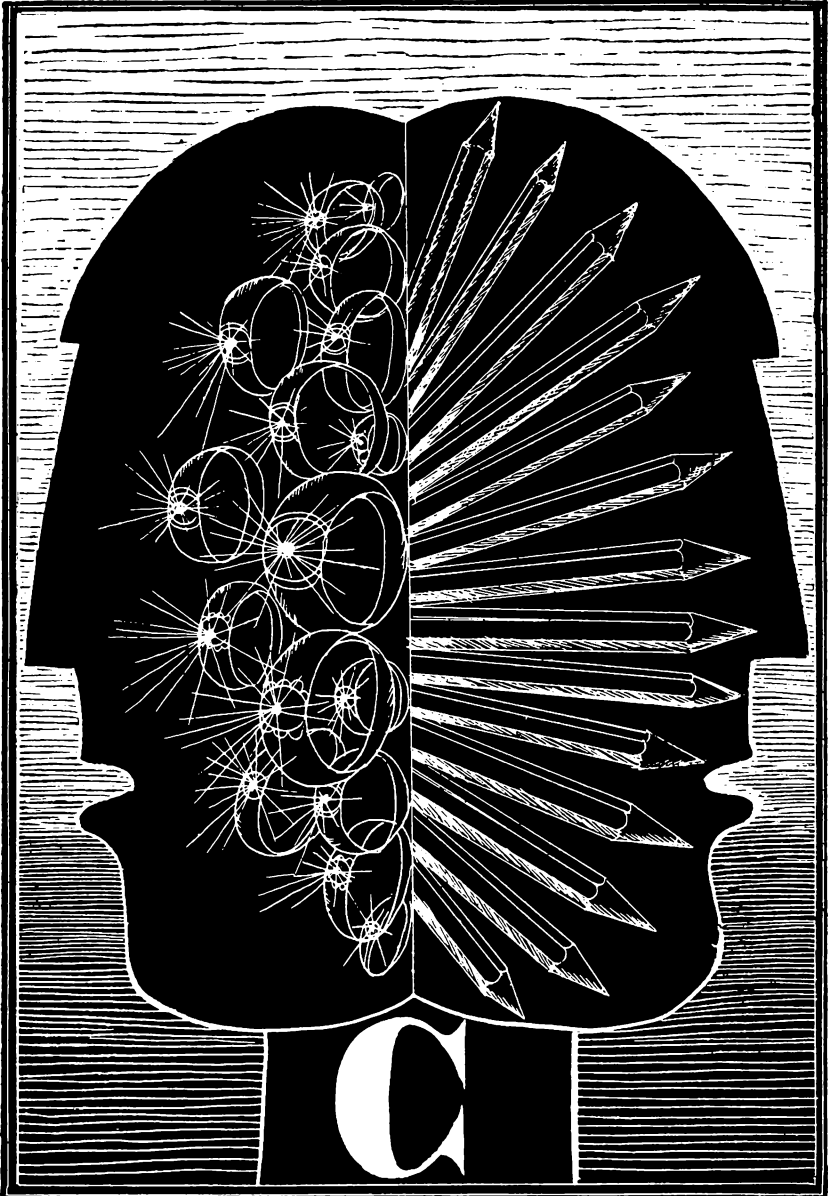
কার্বনের ত্রিমূর্তি: হীরক, কৃষ্ণসীস ও কৃষ্ণকার্বন। এরা পরস্পর থেকে দুস্তর পৃথক। হীরক 'কাঠিন্যের রাজা'। কৃষ্ণসীস পরতযুক্ত, পাতলা, নরম। আর কৃষ্ণকার্বন অনুজ্জ্বল কালো ধূলি। কার্বন অণুতে পরমাণুর বিসম বিন্যাসই এই পার্থক্যের কারণ।

হীরকে পরমাণুগুলি জ্যামিতিক চিত্র — চতুস্তলকের শীর্ষে অবস্থিত এবং অতি দৃঢ়বদ্ধ। তাই হীরক এত কঠিন।

কৃষ্ণসীসে অবস্থাটি বিপরীত। কার্বন পরমাণু এখানে সমতলে বিন্যস্ত এবং এদের বন্ধ দুর্বল। সেজন্যই কৃষ্ণসীস নরম আর এর পরত ঢিলেঢালা।

আর কৃষ্ণকার্বনের সংযুতি নিয়ে অসংখ্য বিতর্ক ছিল। কৃষ্ণকার্বন কেলাসিত পদার্থ নয় — অনেক কাল এই মতেরই প্রাধান্য ছিল। বলা হত, এটি কার্বনের রূপহীন এক রকমফের মাত্র। ইদানীং জানা গেছে, কৃষ্ণসীস আর কৃষ্ণকার্বন কার্যত একই বস্তু এবং এদের আণবিক বিন্যাসও অভিন্ন। রইল কেবল হীরক আর কৃষ্ণসীস। সুতরাং, তিন নম্বরটি খসল।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে তৃতীয় প্রকার কার্বন তৈরির উদ্যোগ নিলেন। তাঁদের কাজের সূত্রটি নিম্নরূপ।

স্থানপরিসরে হীরক ও কৃষ্ণসীসের কার্বন পরমাণুর বিন্যাস ভিন্নতর হলেও বিন্যাসটি উভয়তই বৃত্তবন্দী। কার্বন পরমাণুর শৃঙ্খলকে কি দীর্ঘ রেখা বরাবর টেনে লম্বা করা যায়? অর্থাৎ কেবল কার্বন নিয়ে গঠিত কোন সরল রৈখিক পলিমার অণুর উৎপাদন কি সম্ভব?

রসায়নিক পদার্থ তৈরির জন্য শুরুতেই প্রয়োজন প্রাথমিক উপকরণের। আর এই 'তিন নম্বর কার্বন' এর এমন কাঁচামাল পূর্বনির্দিষ্ট।

দুই কার্বন ও দুই হাইড্রোজেন পরমাণুধর অ্যাসেটিলিনই C_2H_2 — কেবল কাঁচামাল হিসেবে আদর্শ।

কিন্তু অ্যাসেটিলিন কেন? কারণ, এর অণুস্থ কার্বন পরমাণু সম্ভাব্য স্বল্পতমসংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। বাড়তি হাইড্রোজেন এই সংশ্লেষের প্রতিবন্ধ।

রাসায়নিকদের মতে বিক্রিয়ায় আত্যন্তিক সক্রিয়তাই অ্যাসেটিলিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর অণুতে কার্বন পরমাণু তিনটি বন্ধে যুক্ত ($H—C\equiv C—H$) এবং এর দু'টিকে ভেঙ্গে ফেলা সহজ। অতঃপর এই কার্বন পরমাণুদের অন্যান্য (যথা, অ্যাসেটিলিন অণুর) অণুর পরমাণুর সঙ্গেও যুক্ত করা সম্ভব।

এভাবেই মনোমার অ্যাসেটিলিন থেকে পলিমার পলিঅ্যাসেটিলিন তৈরির প্রথম পদক্ষেপ পরিকল্পিত হয়েছিল।

কিন্তু এটিই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান রাসায়নিক বায়ারও একই বিক্রিয়া সংঘটনের চেষ্টা করেছিলেন। চারটি অ্যাসেটিলিন অণুর সমবায়ে তিনি টেট্রাঅ্যাসেটিলিন তৈরি করেন এবং এটিই তাঁর সেরা সাফল্য। কিন্তু পদার্থটি মোটেই সুস্থিত হয় নি। বহু দেশের বিজ্ঞানীরা একই গবেষণার পুনরাবৃত্তি করে ব্যর্থ হন।

বর্তমান শক্তিশালী জৈব সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার কল্যাণেই আজ পলিঅ্যাসেটিলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই এর জন্মভূমি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা পলিইন নামের নতুন এক শ্রেণীর জৈব পদার্থ তৈরি করেছেন। চমৎকার অর্ধপরিবাহী বিধায় নবজাত পদার্থটির ফলিত প্রয়োগে কালবিলম্ব ঘটে নি।

অতঃপর শুরু হল তৃতীয় প্রকার কার্বন সংশ্লেষের উদ্যোগ। এজন্য প্রয়োজন ছিল পলিঅ্যাসেটিলিন অণু থেকে হাইড্রোজেন বিয়োজন এবং তাও কার্বন পরমাণুর অবিমিশ্র শৃঙ্খলটি অটুট রেখে।

হাইড্রোজেন পরমাণু বিয়োজনের এই প্রক্রিয়াটির রাসায়নিক নাম দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর: অক্সিডেটিভ ডিহাইড্রোপলিকণ্ডেন্সেশন। প্রক্রিয়াটি মূল খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ল্যাবরেটরি নোটবুকের বহু ডজন পৃষ্ঠায় এর বর্ণনা লিপিবদ্ধ। কারণ, পলিঅ্যাসেটিলিন থেকে হাইড্রোজেন বিয়োজন মোটেই সহজসাধ্য নয়।

যা হোক, সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাই এক্ষেত্রে উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

...ঝুলকালির মতো দেখতে একটি বাজে জিনিস। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেল এর ৯৯ শতাংশই বিশুদ্ধ কার্বন। কিন্তু ৯৯ তো আর ১০০ নয়।

যথাযথভাবে বললে, শেষ জয়ের মাত্র একটি পর্যায় বাকি রইল। হাইড্রোজেনের কুখ্যাত শেষ ১ শতাংশটি বিতাড়ন প্রয়োজন। এর জন্যই কার্বন পরমাণু সমান্তরাল রৈখিক শৃঙ্খলে বিন্যস্ত হচ্ছে না। 'তৃতীয় কার্বন' পাওয়ার এটিই শেষ প্রতিবন্ধ।

রাসায়নিকদের ভাষায় সংশ্লেষিত পদার্থটি 'প্রায় তৃতীয়' কার্বন কার্বাইন। ইতিমধ্যেই এতে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে। চমৎকার অর্ধপরিবাহী এবং আলোকতড়িৎ উপকরণ ছাড়া এর তাপসহিষ্ণুতাও অতুল্য। ১,৫০০ ডিগ্রি এর কাছে কিছুই না!

আমাদের আশা 'পুরো শতাংশের' কার্বাইন উৎপাদনের দিন আর দূরে নয়।

জটিল যৌগ সম্পর্কে দু-একটি কথা

ঊনবিংশ শতাব্দী প্রখ্যাত রাসায়নিকদের সংখ্যাধিক্যে সুচিহ্নিত। কিন্তু তাঁদের তিন জন অনুপমতম। নিজ বিজ্ঞানে তাঁদের অবদান অন্যদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাঁরা আধুনিক রসায়নের প্রতিষ্ঠাতা।

এঁদের দুজন মৌলাবলীর পর্যায়বৃত্ত সূত্র ও পর্যায়বৃত্ত সারণীর স্রষ্টা দ্মিত্রি মেন্দেলেয়েভ এবং জৈব যৌগাবলীর সংযুতি তত্ত্বের প্রবক্তা আলেকসান্দর বুত্‌লেরভ।

এই দলের তৃতীয় ব্যক্তি সুইজারল্যাণ্ডের রাসায়নিক আল্‌ফ্রেড ভের্নার। মাত্র দু'টি শব্দে বর্ণিত তাঁর আবিষ্কারের নাম 'সমন্বয় তত্ত্ব'। কিন্তু জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে অবদানটি যুগান্তকারী।

...আসলে ধাতু ও অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া সঙ্ঘটনের প্রচেষ্টা থেকেই ঘটনাবলীর শুরু। কপার ক্লোরাইডের মতো সাধারণ লবণের দ্রবণে রাসায়নিকরা অ্যামোনিয়ার অ্যালকোহল যোগ করেছিলেন। দ্রবণের বাষ্পীকরণ থেকে পাওয়া গেল সুদৃশ্য নীল-সবুজ কেলাস। বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেল, কেলাসগুলির সংস্থিতি খুবই সরল। কিন্তু এই সারল্যেই ছিল যত রহস্যময় সমস্যা।

কপার ক্লোরাইডের সঙ্কেত $CuCl_2$। তাম্র দ্বিযোজী এবং সবই এখানে স্বচ্ছ। আর 'অ্যামোনিয়া' যৌগের কেলাসের গঠনও তেমন কিছু জটিল নয়: $Cu(NH_3)_2Cl_2$।

কিন্তু অ্যামোনিয়ার অণুদু'টি কোন শক্তির বলে তাম্র পরমাণুর সঙ্গে এত দৃঢ়বদ্ধ? এই অণুর উভয় যোজ্যতাই ক্লোরিন পরমাণুর বন্ধে ইতিমধ্যেই ব্যয়িত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, এই যৌগে তাম্র চতুর্যোজী।

কোবাল্ট যৌগ $Co(NH_3)_6Cl_3$ একই দৃষ্টান্তের অনুসারী। কোবাল্ট যথার্থই ত্রিযোজী মৌল কিন্তু যৌগে তার আচরণ ন'যোজীর মতো।

এমন বহু যৌগই সংশ্লেষিত হল। আর এরা ছিল যোজ্যতা তত্ত্বের ভিত্তিমূলে প্রোথিত এক-একটি মেয়াদী বোমার মতো।

অবস্থাটি সকল যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই অতিক্রম করল। দেখা গেল, অনেক ধাতুই অস্বাভাবিক যোজ্যতার অধিকারী।

শেষে আল্‌ফ্রেড ভের্নার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যাদানে সফল হলেন।

তাঁর মতানুসারে সাধারণ, নিয়মানুগ যোজ্যতার পরিপূর্তির পরও পরমাণুর অতিরিক্ত যোজ্যতা থাকা সম্ভব। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাম্র ও অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া

উল্লেখ্য। এখানে তাম্রের দু'টি প্রধান যোজ্যতা ক্লোরিন অণুতে ব্যয়িত হবার পরও অ্যামোনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দু'টি বাড়তি যোজ্যতা যোগাতেও সে সমক্ষ।

$Cu(NH_3)_2Cl_2$ জাতীয় যৌগকে জটিল বলা হয়। এই যৌগে ধন-আয়ন $[Cu(NH_3)_2]^{2+}$ জটিল। অন্যতর বহু যৌগে ঋণায়নের জটিলতা অত্যধিক; যথা, $K_2[PtCl_6]$। এর ঋণায়নের জটিলতা সহজলক্ষ্য: $[PtCl_6]^{2-}$

কিন্তু কোন ধাতুর পক্ষে কতসংখ্যক গৌণ যোজ্যতার অধিকারী হওয়া সম্ভব? সমন্বয়ী সংখ্যার উপরই তা নির্ভরশীল এবং এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান যথাক্রমে ২ এবং ১২। পূর্বোক্ত তাম্র ও অ্যামোনিয়ার যৌগে সমন্বয়ী সংখ্যা ২, এবং অ্যামোনিয়ার কতটি অণু তাম্র পরমণুর সঙ্গে যুক্ত তা এতে প্রদর্শিত।

অস্বাভাবিক যোজ্যতার দুরূহ সমস্যাটি অতঃপর মীমাংসিত হল। জন্ম নিল জৈব রসায়নের একটি নতুন শাখা: জটিল যৌগের রসায়ন।

বর্তমানে জ্ঞাত জটিল যৌগের সংখ্যা লক্ষাধিক। দুনিয়াজোড়া রাসায়নিক ইনস্টিটিউট ও ল্যাবরেটরিতে এগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। যে সকল তাত্ত্বিক রাসায়নিক জটিল যৌগাবলী ও সাধারণ পদার্থের সংযুতিগত পার্থক্য বিশ্লেষণে উৎসাহী, এগুলি শুধু তাঁদের কৌতূহল নিরসনের উপকরণমাত্র নয়।

জটিল যৌগ ব্যতীত প্রাণের অস্তিত্বই কল্পনাতীত। রক্তের মৌল উপাদান হিমোগ্লবিন ও উদ্ভিবজীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ ক্লোরোফিল — উভয়ই জটিল যৌগবিশেষ। বহু কিণ্ব আর উৎসেচকের সংস্থিতিও 'জটিলতাচ্ছন্ন'।

বিশ্লেষকরা বহুবিধ পদার্থের দুরূহতম বিশ্লেষণে জটিল যৌগ ব্যবহার করেন।

জটিল যৌগ ব্যবহার বহুসংখ্যক অতিশুদ্ধ ধাতু সংগ্রহ সম্ভব। মূল্যবান রঞ্জক এবং জল মৃদুকরণেও তা ব্যবহার্য। এক কথায়, জটিল যৌগাবলী সর্বগামী।

সরল যৌগের বিস্ময়

আমাদের কালে ছবি তোলা শেখা খুবই সহজ। এমন কি স্কুলছাত্রের পক্ষেও তা সম্ভব। প্রক্রিয়াটির অনেক খুঁটিনাটি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলেও (জনান্তিকে বলছি, এর কোন কোনটি বিশেষজ্ঞরাও জানেন না), ছবি তুলতে ও তা ওয়াশ করতে কিছুটা চর্চা ও বয়স্কদের সদুপদেশই যথেষ্ট।

সুতরাং, ফোটোগ্রাফারের কাজের বিশদ বর্ণনা অতঃপর নিষ্প্রয়োজন।

তিনি জানেন, ছবিগুলিতে বাদামী রঙের তিল দেখা দেয়, বিশেষভাবে দীর্ঘদিন আলোতে রাখলে। ফোটোগ্রাফারদের মতে কাগজের (বা প্লেটের) অসম্পূর্ণ ঘনীভবনই এর কারণ।

বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই কাগজ অথবা প্লেট যথেষ্ট সময় বন্ধায়ক দ্রবণে রাখা হয় নি।

বন্ধায়ক কিজন্য প্রয়োজন? ফোটোগ্রাফি সম্পর্কে আনাড়ী ব্যক্তিও তার উত্তর জানেন।

ছবি নেবার পর ফিল্মের উপর যে আবিয়োজিত সিল্‌ভার ব্রোমাইড থাকে তা ধুয়ে ফেলা প্রয়োজন।

হরেক রকম বন্ধায়কই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে হাইপো সবচেয়ে সস্তা আর জনপ্রিয়। রাসায়নিকদের ভাষায় এটি সোডিয়াম থিওসালফেট।

কিন্তু শুরুতে সোডিয়াম সালফেট সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যাক। জিনিসটি বহুদিনের পুরানো এবং এর আবিষ্কারক জার্মান রাসায়নিক য়োহান গ্লাউবার। তাই সোডিয়াম সালফেটের অন্য নাম গ্লাউবার লবণ। এর সূত্র $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$।

রাসায়নিকরা পদার্থের সংযুতি সঙ্কেত লিখতেই অভ্যস্ত। তাঁদের কলমে অনাদ্র সোডিয়াম সালফেট নিম্নরূপ:

```
Na—O\   //O
     S
Na—O/   \\O
```
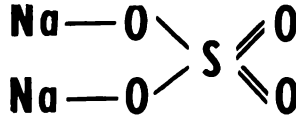
সঙ্কেতটির দিকে বারেক তাকালেই, রসায়নের হাতুড়েও বুঝতে পারে যে, এখানে গন্ধক ধনাত্মক ষড়যোজী এবং অক্সিজেন ঋণাত্মক দ্বিযোজী।

থিওসালফেটের সংযুতিও প্রায় অনুরূপ। শুধু একটুই যা ব্যতিক্রম। এখানে একটি অক্সিজেন পরমাণু একটি গন্ধক পরমাণুতে প্রতিস্থাপিত, যথা:

```
Na—O\   //O              Na—O\   //O
     S          অথবা           S
Na—S/   \\O              Na—O/   \\S
```
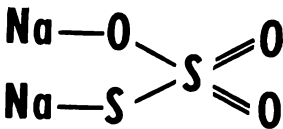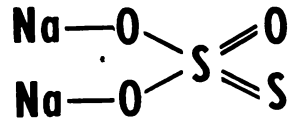
সরল, তাই না? কিন্তু কী অদ্ভুত পদার্থই না এই থিওসালফেট! এতে বিভিন্ন যোজ্যতার দু'টি গন্ধক পরমাণু বর্তমান; একটির আধান ৬+এবং অন্যটির ২−। এমন ঘটনা রাসায়নিকরা হামেশাই খুঁজে পান না।

সাধারণ জিনিসেও অনেক সময় কত অসাধারণই না লুকিয়ে থাকে।

হ্যামফ্রে ডেভির অজানা

প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাসায়নিক হার্মফ্রি ডেভির বৈজ্ঞানিক গবেষণার তালিকাটি বস্তুত অতি দীর্ঘ।

প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হিসেবেই শুধু নয় উদ্ভাবনী দক্ষতায়ও তিনি তুলনাহীন। কোন সমস্যা হাতে নিয়ে ডেভি প্রায় কখনই বিফল হন নি। তাঁর উদ্ভাবিত রাসায়নিক যৌগের সংখ্যা অল্প নয়। তা ছাড়া তিনি উল্লেখ্যসংখ্যক নতুন গবেষণা পদ্ধতিরও প্রবর্তক। ডেভি চারটি মৌলেরও আবিষ্কারক এবং এগুলি: পটাসিয়াম ও সোডিয়াম, ম্যাগ্নেশিয়াম ও বেরিয়াম।

তাঁর অন্যতম নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে ক্লোরিন হাইড্রেট প্রস্তুতির পদ্ধতি বিবৃত। এটি এক সরল রাসায়নিক যৌগ এবং এতে ক্লোরিন অণুর সঙ্গে জলের ছয়টি অণু যুক্ত: $Cl_2 \cdot 6H_2O$।

ডেভি পদার্থটির গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করলেও আসলে তিনি কী পেয়েছেন তা কোনদিন জানতে পারেন নি। যৌগটি ছিল একেবারে নতুন ধরনের। রাসায়নিক বন্ধবিহীন যৌগ।

রহস্যটি বিশশতকী বিজ্ঞানীরাই শুধু জানতে পেরেছিলেন। তাঁরা যোজ্যতার আধুনিক প্রত্যয় অনুসারেই ক্লোরিন হাইড্রেট বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হয় নি। দেখা গেল, ব্যাপারটি অত্যধিক জটিল।

তা ছাড়া এই জাতীয় বহু পদার্থও তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির নৈরাশ্যজনক নিষ্ক্রিয়তা এবং এদের বিক্রিয়ালিপ্ত করার সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু দশক ধরে চিন্তা করেছেন। আমরা এখন এর ইতিবৃত্ত জানি। সমস্যাটি অমীমাংসিত থাকাকালেই বিজ্ঞানীরা আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ও র‍্যাডনের কয়েক প্রকার হাইড্রেট তৈরি করেন।

হাইড্রেটগুলির বন্ধ মোটেই সাধারণ রাসায়নিক বন্ধ ছিল না। অথচ তাদের অনেকগুলিই তুলনামূলকভাবে সুস্থিত পদার্থ।

ইউরিয়া একটি সাধারণ জৈব পদার্থ। কিন্তু রাসায়নিকদের কাছে সেও ছিল আরও এক হেঁয়ালী। অনেক হাইড্রোকার্বন ও অ্যালকোহলের সঙ্গেই এর সহজ সমাবন্ধন ঘটে। আর এই অদ্ভুত 'মিতালী'ই বিস্ময়কর। কোন শক্তির বলে ইউরিয়া আর অ্যালকোহল পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট? রাসায়নিক শক্তি ছাড়া আর কিছু..!

প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। এই জাতীয় বন্ধবিহীন পদার্থের সংখ্যা ভয়াবহভাবে বেড়েই চলছিল।

কিন্তু দেখা গেল, এতে অতিপ্রাকৃত কিছুই নেই।

এখানে সংবন্দী অণু দু'টি অসমান। একটি 'গৃহকর্তা' এবং অন্যটি 'অতিথি'।

আশ্রয়দাতা অণুতে কেলাসের জাফরি তৈরি হয়। এই জাফরির কিছু ফাঁক পরমাণুশূন্য থাকে। 'অতিথি' অণু এতেই ঢুকে পড়ে। কিন্তু আতিথেয়তার ধরনটি একটু স্বকীয়। অতিথিটি গৃহকর্তার সঙ্গে অনেক দিন থাকে। কারণ, এর পক্ষে কেলাসী জাফরির ফাঁক থেকে বের হওয়া মোটেই সহজ নয়।

এভাবেই ক্লোরিন, আর্গন, ক্রিপ্টন ও অন্যান্য গ্যাসের অণু যেন জলের কেলাসী জাফরির ফাঁকেই আটকা পড়ে থাকে।

অণুর রাসায়নিক বন্ধবিহীন উপরোক্ত এবং অন্য একপ্রস্ত পদার্থকে বিজ্ঞানীরা এখন জাফরি-যৌগ (বা কোষীয় যৌগ) বলেন।

২৬, ২৮ অথবা বিস্ময়কর আরও কিছু

পদার্থগুলি ক্যাটেনেন নামেই পরিচিত। নামটির উৎস লেটিন শব্দ 'ক্যাটেনা' অর্থাৎ 'শৃঙ্খল'।

কিন্তু তাতেই-বা কী? শৃঙ্খল শব্দটি তেমন কিছু ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক নয়। জৈব রসায়নের শব্দতালিকায় অন্য বহু শব্দের চেয়ে এটিই বহুল ব্যবহৃত।

কিন্তু শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে তফাত আছে। আমরা অনেক সময় দেখেছি যে এগুলি রৈখিক, কিংবা শাখায়িত, কখনও-বা অত্যন্ত জটিল কোন বিন্যাসবর্তীও হয়।

কিন্তু ক্ষণিক থেমে একটু চিন্তা করুন: জৈব যৌগের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলের অর্থ যদিও সুস্পষ্ট, তবু এ নিয়ে খুব কড়াকড়ি নেই। দৈনন্দিন ব্যবহার্য শৃঙ্খল শব্দটি এখানে ভিন্নার্থে প্রযুক্ত। এর কড়াগুলিও যান্ত্রিকভাবে আটকানো নয়। এগুলি পরস্পরের মধ্য দিয়ে সহজেই গলিয়ে যেতে পারে।

জটিল যৌগের ক্ষেত্রে আবর্তগুলি, বলতে কি, পরস্পরের সঙ্গে 'ঝালাই করা'। দৃষ্টান্ত হিসেবে অ্যান্থ্রাসিনে বেঞ্জিনের আবর্ত তিনটি উল্লেখ্য। এটি আবর্তবন্দী শৃঙ্খলের মতোই অথচ ঠিক শৃঙ্খলও নয়।

সাধারণ শৃঙ্খলের কড়ার মতো আবর্তগুলি আলাদাভাবে যুক্ত হবে কি না, এ নিয়ে রাসায়নিকরা মুশকিলে পড়লেন। যেমন এই রকম:

সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁরা বৃত্তাকার অণুগুলিকে রাসায়নিক বন্ধ ব্যতিরেকে পুরো যান্ত্রিক কায়দায় যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

এই আকর্ষী প্রত্যয়টি বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের মনে পরিণতি লাভ করছিল। তত্ত্ব ছিল তাঁদেরই স্বপক্ষে। এমন এক সংশ্লেষে পৌঁছানোর পক্ষে কোন অনতিক্রম্য বাধা ছিল না। শৃঙ্খল তৈরিতে কার্বনের কোন আবর্তে কতটি পরমাণু প্রয়োজন, রাসায়নিকরা তারও তাত্ত্বিক হিসেব-নিকেশ জানতেন।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোনই সম্ভাবনা প্রকটিত হয় নি: প্রতিবারই কোন না কোন পর্যায়ে সংশ্লেষটি অচলাবস্থায় পৌঁছত। তাই রাসায়নিকরা হরেক রকম নতুন কৌশলের কথা ভাবছিলেন।

১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসের এক প্রসন্ন সকালে জন্ম নিল একটি নতুন পদার্থ। তাকে প্রাণদান করেছিলেন দু'জন জার্মান রাসায়নিক, লুট্রিংহাউজ ও শিল। এজন্য তাঁরা কুড়িটি অনুবর্তী রাসায়নিক পরীক্ষা, কুড়িটি পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন।

পদার্থটি শৃঙ্খলের কড়ার মতো আটকানো দু'টি বৃত্তাকার অণুতে গঠিত। এর কড়াদু'টিতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬ এবং ২৮। আর এজন্যই পদার্থটির গদ্যগন্ধী নামকরণ: ক্যাটেনেন ২৬, ২৮।

ক্যাটেনেন রসায়নে দুই আবর্তবন্দী অঙ্গুরি এখন অতীতের ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা আজ আরও জটিল অঙ্গুরি তৈরিতে ব্যাপৃত। যথা,

অথবা
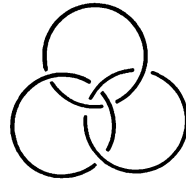
এগুলি তিনটি আবর্তের ক্যাটেনেন মডেল। বামদিকেরটিতে মাঝের কড়াটি ২৬টি ও বাহিরের কড়াদু'টির প্রত্যেকে ২০টি কার্বন পরমাণুতে তৈরি। ক্যাটেনেনের জটিলতর অঙ্গুরির (ডান দিকের ক্যাটেনেন) সমাবন্ধনে প্রতিটি কড়ার জন্য অন্যূন ৩০টি পরমাণু প্রয়োজন।

ক্যাটেনেন পরিবারের প্রথম নবজাতক ক্যাটেনেন ২৬, ২৮ নামের পদার্থটির বাহ্যিক চেহারা একেবারে আটপৌরে। সে সাদা, দানাদার এবং তার গলনাঙ্ক ১২৫ ডিগ্রি। প্রকৃতিতে কি ক্যাটেনেন পাওয়া যায়? প্রকৃতির সবকিছুই উদ্দেশ্যমুখীন। সে অপব্যয়অনীহ। প্রাকৃতিক ক্যাটেনেন থাকলে অবশ্যই তার বিশেষ কাজ রয়েছে।

বিজ্ঞানীরাই তা আবিষ্কার করুন।

কাদে-দ্রবের প্রশস্তি

অখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক কাদে নিজে অজান্তেই ১৭৬০ সালে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।

তাঁর গবেষণাগারে নিম্নোক্ত রাসায়নিক পরীক্ষাটি তিনি নিষ্পন্ন করেন (কিন্তু কেন, তার কারণ অজ্ঞাত)।

কাদে পটাসিয়াম অ্যাসিটেটকে আর্সেনিক অক্সাইড সহযোগে উত্তপ্ত করেন। এর ফলাফল তিনি কোনদিনই নির্ধারণ করেন নি। কারণ, তৈরি পদার্থটি ছিল সত্যিই নারকীয়।

ঘন, কালো রঙের এই বস্তুটি বাতাসের সংস্পর্শে ধূমায়িত হত এবং সহজেই জ্বলে উঠত। তা ছাড়া এর গন্ধ ছিল একেবারেই অসহ্য।

সত্তর বছর পরে কাদের এই 'পাঁচমিশালী' জিনিসটির বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয়। এর উপাদানে পাওয়া যায় অনন্য ধরনের কিছু আর্সেনিক যৌগ।

কিন্তু এই অনন্যতা বুঝতে হলে, জৈব যৌগের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য মনে রাখা দরকার। কার্বন অণুর রৈখিক, শাখায়িত অথবা বৃত্তাকার শৃঙ্খলে এদের ভিত্তি। অবশ্য, শৃঙ্খলে অন্যান্য মৌলের অণুও প্রবেশক্ষম। কিন্তু এমন মৌলের সংখ্যা খুবই সীমিত (এদের বলা হয় জৈবপদার্থজাত)। এরা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, গন্ধক এবং হয়ত-বা ফসফরাসও।

আর্সেনিক কোনক্রমেই এদের দলভুক্ত নয়।

কাদে-দ্রবে ডাইক্যাকোডিল (গ্রীক শব্দ 'কাকোডেস', অর্থাৎ দুর্গন্ধ, থেকে

উদ্ভূত) নামক একটি উপাদান ছিল। এর আশ্চর্য সংযুতিতে কার্বন পরমাণুর সঙ্গে আর্সেনিক পরমাণুরও নিবিড় সন্নিবেশ ঘটেছিল। যথা,

$$\begin{matrix} H_3C \\ H_3C \end{matrix} \!\!>\! As - As \!<\!\! \begin{matrix} CH_3 \\ CH_3 \end{matrix}$$
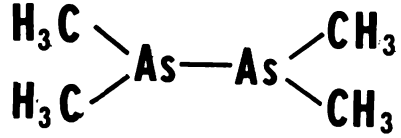
যে সকল জৈব যৌগের কার্বন শৃঙ্খলে অজৈব পদার্থজাত মৌলের (ধাতু ও অধাতু) পরমাণু থাকে সেগুলিকে এখন বিসম-জৈব যৌগ (মৌলটি ধাতু হলে জৈব-ধাতব) বলা হয়।

তাই কাদেই পৃথিবীর প্রথম বিষম-জৈব যৌগের সংশ্লেষক।

বর্তমানে আমরা ১৫ হাজারেরও বেশি এই জাতীয় পদার্থের কথা জানি। বিষম-জৈব, জৈব-ধাতব রসায়ন বর্তমানে রসায়নের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, স্বাধীন, বিশাল শাখাবিশেষ।

এই শাখাটি জৈব ও অজৈব রসায়নের সেতুবন্ধ এবং বর্তমানে বিজ্ঞানের শাখাবিভাজনের অশেষ কৃত্রিমতারই অন্যতম সাক্ষী।

যে রসায়নে জড় জগতের প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি — ধাতু যৌগ গবেষণারই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তা কী ধরনের জৈব রসায়ন?

আর পক্ষান্তরে যে রসায়নে গবেষণার অধিকাংশ উপকরণই জৈব পদার্থজাত, তাকে কি অজৈব রসায়ন বলা যায়?

জৈব-ধাতব যৌগাবলী বিজ্ঞানের অত্যাকর্ষী উপকরণ। ধাতব পরমাণুর সঙ্গে কার্বন পরমাণুর অপরিহার্য বন্ধ সৃষ্টিই এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জৈব-ধাতব যৌগে বড় বাড়ির প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধাতুরই উপস্থিতি সম্ভব। এই পদার্থসমূহের গুণাগুণ বহুবিচিত্র।

এদের অনেকগুলি হিমাঙ্কের নিম্ন তাপমাত্রায়ও প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। পক্ষান্তরে, অন্যগুলি প্রচণ্ড তাপসহিষ্ণু।

কোন কোনটি রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয়, অন্যগুলি বাহ্য প্রভাবে তেমন সুবেদী নয়।

কেবল জার্মেনিয়ামের জৈব-ধাতব যৌগগুলি ছাড়া এদের এক থেকে শেষাবধি সবগুলিই বিষাক্ত। কেন যে জার্মেনিয়াম যৌগ ক্ষতিকর নয়, সে ধাঁধাটি আজও অমীমাংসিত।

বিষম-জৈব যৌগের ব্যবহারিক প্রয়োগসীমা সুদূরপ্রসারী, বস্তুত অফুরাণ। প্লাস্টিক ও রবার, অর্ধপরিবাহী ও অতি শুদ্ধ ধাতু তৈরি, ঔষধ, কৃষির পতঙ্গনাশী পদার্থ, রকেট ও মোটরের জ্বালানী উপকরণসহ বহু ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহার্য। তা ছাড়া এই যৌগাবলী বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার সফল সংসাধনের অতি মূল্যবান রাসায়নিক বিকারক ও অনুঘটক।

সোভিয়েত দেশে বিষম-জৈব যৌগের বৃহত্তম বিশেষজ্ঞদল আছে। লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত আকাদেমিশিয়ান আলেকসান্দর নেস্‌মেয়ানভ এর প্রধান।

টি-ই-এল কাহিনী

'টি-ই-এল' শব্দটি সংক্ষিপ্ত। নামটি একটি যৌগের এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা মানুষের খুবই প্রয়োজনীয়। এতে পেট্রল বাঁচে। অদ্যাবধি টি-ই-এল ঠিক কত লিটার পেট্রল বাঁচিয়েছে, তা কেউ হিসেব করে দেখে নি। কিন্তু পরিমাণটি যে বিপুল, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

কী এই রহস্যজনক টি-ই-এল? রাসায়নিক বলবেন: এটি ধাতব সীসক আর হাইড্রোকার্বন ইথেনের একটি জৈব-ধাতব যৌগ। ইথেনের (C_2H_6) চার অণুর প্রত্যেকটি থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত করে অবশিষ্ট হাইড্রো-কার্বনগুলিতে (ইথাইল — C_2H_5) একটি করে সীসক পরমাণু যোগ করুন। যে পদার্থটি পাওয়া যাবে তার সংকেত যথেষ্ট সরল: $Pb(C_2H_5)_4$। এর নাম টেট্রাইথাইল্‌লেড, সংক্ষেপে টি-ই-এল।

টি-ই-এল একটি ভারি তরল, রঙ সবুজটে ধরনের এবং টাটকা ফলের মৃদু গন্ধে সুগন্ধিত। কিন্তু পদার্থটি মোটেই নিরাপদ নয়। এটি মারাত্মক বিষ। টি-ই-এল পদার্থ

হিসেবে কোন আকর্ষী বস্তু নয়। এটি অন্য দশটি রাসায়নিক পদার্থের মতোই। রাসায়নিকরা এর চেয়ে বহু কৌতূহলোদ্দীপক যৌগ জানেন। কিন্তু মোটরে পেট্রলের ট্যাঙ্কে ০·৫ শতাংশ টি-ই-এল যোগ করেই দেখুন না। আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে।

অন্তর্দাহী ইঞ্জিনই গাড়ি কিংবা বিমানের হৃৎপিন্ড। এর চালনপদ্ধতি সরল। পেট্রল ও বাতাসের মিশ্রণ একটি নলে সংনমিত অবস্থায় রেখে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে আগুন ধরানো হয়। ফলত, বিস্ফোরণ ও শক্তিক্ষরণ ঘটে এবং ইঞ্জিন চালু হয়।

প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা মিশ্রণ সংনমনের অনুপাতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। ইঞ্জিনের শক্তি এবং জ্বালানির সাশ্রয় পূর্বোক্ত অনুপাতের মাত্রাধিক্যের অনুসারী। এই তো গেল আদর্শ কথা। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মিশ্রণকে ইচ্ছামতো অত্যধিক সংনমিত করা যায় না। ফলে ইঞ্জিনে 'গন্ডগোল' দেখা দেয়। জ্বালানির অসম্পূর্ণ, অসমান দহনে ইঞ্জিন অত্যধিক উত্তপ্ত ও এর যন্ত্রপাতির দ্রুত ক্ষয় হয়। এবং বেকার বেজায় পেট্রল পোড়ে।

ইঞ্জিনের নির্মাণকৌশলের উন্নতি ও বিশুদ্ধতর পেট্রল ব্যবহারে 'গন্ডগোল' কিছুটা কমলেও তার পূর্ণ নিরসন ঘটে নি। মোটরে 'ঠকঠকানি' ও অত্যধিক তাপ অব্যাহত রইল; মিশ্রণের অসমঞ্জস বিস্ফোরণে (ডেটোনেশন) ইঞ্জিনের কর্মকাল কমে যাচ্ছিল।

অনেক চিন্তাভাবনার পর বিজ্ঞানীরা ডেটোনেশন বাদ দিয়ে মিশ্রণের সুসম দহনের জন্য কোনক্রমে জ্বালানির গুণগত পরিবর্তনের পক্ষেই মনস্থির করলেন।

কিন্তু কীভাবে?

মার্কিন ইঞ্জিনিয়র টমাস মিজ্‌লে প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলেন। তাঁর প্রথম সুপারিশে রীতিমতো বিস্ময় সৃষ্টি হল। তিনি দাবী করলেন যে, পেট্রলে লাল রঙ মিশালে এর তাপশোষণ ও উদ্বায়ু হবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং ফলত, জ্বালানি ও বাতাসের মিশ্রণকে অধিকতর সংনমিত করা যাবে।

মিজ্‌লে একটু আয়োডিন দিয়ে পেট্রল 'রঙ' করলেন। তিনি সানন্দে লক্ষ্য করলেন যে, পেট্রলে সত্যি কম বিস্ফোরণ ঘটছে। কিন্তু দেখা গেল আয়োডিনের বদলে সাধারণ রঙ ব্যবহার করলে, মোটরে আবার সেই পুরানো 'গন্ডগোল' দেখা দেয়।

অতঃপর এতে রঙের সম্ভাব্য ভূমিকার অসারতাই প্রমাণিত হল। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু মিজ্‌লে তাঁর সকল বিরক্তি কাটিয়ে উঠলেন। তাঁর মনে এক আশ্চর্য

প্রত্যয় দৃঢ়বদ্ধ হল: নিশ্চয়ই, এমন কোন পদার্থ আছে যার সামান্য পরিমাণ যোগ করলেই পেট্রলের উল্লেখযোগ্য গুণগত উন্নতি ঘটবে।

আয়োডিনের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, অবশ্য অতি অল্প পরিমাণে। অতএব অন্যান্য উপকরণ, সরল ও জটিল, সবই খুঁজে দেখা উচিত। বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ শুরু করলেন। শেষে বিজ্ঞানীরা এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেঁছিলেন: ভারি পারমাণবিক ওজনের মৌলের কোন যৌগেই বিস্ফোরণরোধী উপকরণটি খোঁজা উচিত। সীসকের যৌগ নিলেই তো হয়।

কিন্তু সীসককে কীভাবে পেট্রলে সংবন্দী করা সম্ভব? ধাতুটি নিজে কিংবা তার কোন লবণ পেট্রলে দ্রাব্য নয়। সীসকের কোন জৈব যৌগ ব্যবহারেই এর একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা নিহিত।

আর এই প্রথম উচ্চারিত হল 'টেট্রাইথাইল্‌লেড' টি-ই-এল শব্দটি। তখন ১৯২১ সাল।

পেট্রলে যোগ করলে অতি অল্প পরিমাণ টি-ই-এল ঠিক জাদুর মতোই কাজ

করে। এতে জ্বালানির গুণের দ্রুত উন্নতি ঘটে। এভাবে জ্বালানি ও বাতাসের মিশ্রণকে আগের তুলনায় দ্বিগুণ সংনমিত করা সম্ভব হল। এর অর্থ, গাড়ি সমান বেগে চালালেও এবার পেট্রল পোড়ে আগের অর্ধেক। অতঃপর গাড়ি ও বিমানের ইঞ্জিনে ‘গণ্ডগোল’ সমস্যাটি দূর হল।

এবার একটি অদ্ভুত অর্থনৈতিক হিসাব দেখুন: পৃথিবীতে টি-ই-এল’এর অত্যধিক উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক সীসকের ভাঁড়ার অচিরেই নিঃশেষ হবার আশঙ্কা রয়েছে।

আত্যন্তিক বিষাক্ততা টি-ই-এল’এর এক অস্বস্তিকর ধর্ম। নিশ্চয়ই আপনারা ট্যাঙ্কবাহী গাড়িতে লেখা দেখেছেন: ‘ইথাইল পেট্রল। বিষ!’ টি-ই-এল যুক্ত পেট্রল ব্যবহারে সতর্কতা অপরিহার্য।

বিস্ফোরণরোধী সামগ্রীর মধ্যে টি-ই-এল শুধু পূর্বগামীই নয়, শ্রেষ্ঠত্বে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবু বিজ্ঞানীরা সমগুণসম্পন্ন অথচ নিরাপদ এমন একটি পদার্থের সন্ধানে আজ সচেষ্ট।

এবং তার সন্ধানও মিলেছে। এর নাম সি-এম-টি। যদি এর অর্থ জানতে চান, তবে পরের গল্পটি পড়ুন।

অসাধারণ স্যাণ্ডউইচ

জ্ঞাত জৈব-ধাতব যৌগের সংখ্যা এখন বহু হাজারেরও বেশি। কিন্তু পনেরো বছর আগেও জৈব-ধাতব রসায়নে একটি বিরক্তিকর শূন্যতা প্রকটিত ছিল। রাসায়নিকরা তথাকথিত উৎক্রমণশীল ধাতুগুলিকে জৈব অণুতে সংযোজনে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। পর্যায়বৃত্ত সারণীর গৌণ উপদলের মৌলরাই উৎক্রমণশীল ধাতু। এদের সংখ্যা পঞ্চাশের একটু কম। শেষে যখন রাসায়নিকরা এই ধাতুযুক্ত জৈব যৌগ তৈরি করলেন, তখন দেখা গেল ওগুলি অতি অস্থায়ী — ‘জৈব-ধাতবের উদ্ভট ঘটনা’ বিশেষ।

১৯৫১ সালে, ঘটনাস্থলে মহামান্য দৈবের পুনরাবির্ভাব ঘটল। ব্রিটিশ রাসায়নিক পাউসন তাঁর ছাত্র কিলিকে একটি কাজের ভার দিলেন। কাজটিকে জটিল বলা যায় না — একটি হাইড্রোকার্বন তৈরি করা। নামটি এর বেজায় লম্বা: ডাইসাইক্লোপেণ্টা-ডাইএনিল। এজন্য ৫ সংখ্যার দু’টি কার্বন আবর্তের সংযোজন, অর্থাৎ C_5H_5 সঙ্কেতের দু’টি যৌগ থেকে $C_{10}H_8$ সংস্থিতির একটি পদার্থের সংশ্লেষ প্রয়োজন ছিল (মনে করা হয়েছিল যে, দু’টি হাইড্রোজেন বিচ্যুত হবে):
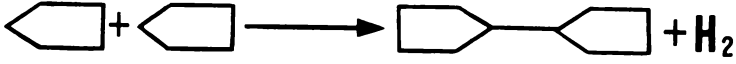
ডাইসাইক্লোপেণ্টাডাইএনিল

সাইক্লোপেণ্টাডাইএনিল

কিলি জানতেন যে, এমন বিক্রিয়া সঙ্ঘটন শুধুমাত্র কোন অনুঘটকের সান্নিধ্যেই সম্ভব। তিনি এজন্য ফেরাস ক্লোরাইডকেই নির্বাচন করলেন।

তার পর একদিন বিস্মিত পাউসন আর কিলি দেখলেন, তাঁদের কাঙ্ক্ষিত বিক্রিয়াজাত পদার্থটি বর্ণহীন দ্রব নয়, এক হলুদ কেলাস, আর তা অত্যন্ত সুস্থিত। পদার্থটি ৫০০ ডিগ্রি তাপমাত্রাও সইতে পারে; জৈব রসায়নে এমন ঘটনা অতি বিরল।

কিন্তু অধ্যাপক আর তাঁর ছাত্র রহস্যজনক কেলাসটির রাসায়নিক বিশ্লেষণে আরও অবাক হলেন, এবং তার সঙ্গত কারণও ছিল। কেলাসে কার্বন, হাইড্রোজেন আর... লৌহের সমাবন্ধন ঘটেছিল। যথার্থ উৎক্রমণশীল ধাতু — লৌহ যথার্থ জৈব পদার্থের সঙ্গেই 'ঘর করেছে'।

দেখা গেল, লৌহজৈব যৌগের সংকেতটিও অস্বাভাবিক:

উভয় অঙ্গুরিই (সাইক্লোপেণ্টাডাইএন) সমতল পঞ্চভুজ, অনেকটা দুই টুকরো রুটির মতো, যার মাঝখানে ভরণস্বরূপ একটি লৌহ অণু। এমন যৌগকে আজকাল 'স্যাণ্ডউইচ' বলা হয়।

ফেরোসিনই (লৌহজৈব যৌগটির এই নামকরণ হল) 'স্যাণ্ডউইচ' পরিবারের প্রথম সদস্য।

সহজ করার জন্য আমরা ফেরোসিনের সংযুতির নক্শাটি একই সমতলে দেখিয়েছি। আসলে এর অণুর গড়ন জটিলতর স্থানবিন্যাসে চিহ্নিত।

ফেরোসিন সংশ্লেষ আধুনিক রসায়নের এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ফলত, তত্ত্বীয় ও ফলিত রাসায়নিকরা জৈব-ধাতব রসায়নের যে সম্ভাবনা অব্যর্থ ভেবেছিলেন, সে সম্পর্কে নিজ নিজ চিন্তাধারা পুনর্বিবেচনায় তাঁরা বাধ্য হন।

ফেরোসিনের জন্ম ১৯৫১ সালে। আজ এই 'সিন'দের সংখ্যা শতাধিক। প্রায় সবক'টি উৎক্রমণশীল ধাতুরই 'স্যাণ্ডউইচ' যৌগ এখন তৈরি।

অদ্যাবধি এগুলি অবশ্য কেবল তত্ত্বীয় রাসায়নিকদেরই কৌতূহল নিবৃত্তি করছে। এগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের সম্ভাবনা এখনও কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। কিন্তু...

সি-এম-টি'এর সঙ্গে পরিচয়ের এবার সময় এসেছে। এর পুরো নাম অতি দীর্ঘ, কিন্তু ছন্দানুবর্তিতার জন্য তা মনে রাখা সহজ:

সাইক্লোপেণ্টাডাইএনিল —
ম্যাঙ্গানিজট্রাইকার্বনিল

অণুটির সংযুতি সঙ্কেতের লিখনও কঠিন নয়:
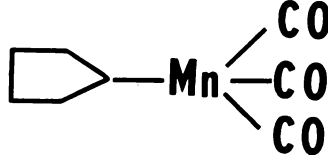
'রুটির অন্য টুকরোর' (সাইক্লোপেণ্টাডাইএনিল অঙ্গুরি) পরিবর্তে এর 'ভরণ'টি (ম্যাঙ্গানিজ পরমাণু) কার্বন মনোক্সাইডের তিনটি পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত।

বিস্ফোরণরোধক হিসেবে সি-এম-টি চমৎকার উপকরণ আর আমাদের পরিচিত টি-ই-এল অপেক্ষাও সে বেশি কার্যকরী। সি-এম-টি মোটেই বিপজ্জনক নয়। কার্যক্ষেত্রে এখন এর খুঁটিনাটির পরীক্ষা চলছে। 'সি-এম-টি' লেখা পেট্রল গাড়ি ইতিমধ্যে পথে চলতে শুরু করেছে।

অর্থনীতিবিদদের হিসাবমতো টি-ই-এল' এর বদলে সি-এম-টি ব্যবহারে বছরে ৩০০ কোটি রুবল সাশ্রয় হবে। কিন্তু এর সেরা সুবিধা, এতে আমাদের নগর ও শহরের বাতাস পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যপ্রদ থাকবে।

কার্বন মনোক্সাইডের বেখেয়ালীপনা

যৌগটিতে কোনই জটিলতার অবকাশ নেই। এটি একটি কার্বন অণু ও একটি অক্সিজেন অণুতে গঠিত। বিজ্ঞানে এরই নাম কার্বন মনোক্সাইড। যৌগটি অতি

বিষাক্ত এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণেও নিরুৎসাহী। সরল সঙ্কেতে চিহ্নিত CO যৌগটির সংক্ষিপ্ত গুণাবলী এই।

...শোনা যায় জার্মানির একটি রাসায়নিক কারখানায় ১৯১৬ সালে এক অনাকর্ষী ঘটনা ঘটেছিল। কে একজন ওখানে রাখা অনেক দিনের পুরানো একটি ইস্পাতের সিলিন্ডার (এতে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসদু'টির মিশ্রণ বিগত পাঁচ বছর থেকে চাপবন্দী ছিল) কাজে লাগানোর কথা ভেবেছিল। এটা খুলে, গ্যাসশূন্য করে এর নিচে হালকা বাদামী রঙের বিশ্রী 'ধুলো'গন্ধী কিছু দ্রব পাওয়া গেল।

দেখা গেল, যৌগটি জ্ঞাত হলেও এতে একটি লৌহ পরমাণু ও পাঁচটি কার্বন মনোক্সাইড অণুর অতি দুর্লভ সমাবন্ধন ঘটেছে। রাসায়নিক পুস্তিকায় এর নাম লৌহ পেণ্টাকার্বনিল, সঙ্কেত $Fe(CO)_5$।

(প্রসঙ্গত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিয়তি উল্লেখ্য। ১৮৯১ সালের ১৫ই জুন, ঠিক একই দিনে দু'জন বিজ্ঞানী লৌহ পেণ্টাকার্বনিল আবিষ্কার করেন: বার্থলো ফ্রান্সে আর মণ্ড ইংলণ্ডে। এমন সন্নিপাত সহজলভ্য নয়। তাই না?)

সিলিণ্ডারে পদার্থটির গঠনপদ্ধতি অনুসন্ধানে কিন্তু কোন অতিপ্রাকৃত ঘটনা আবিষ্কৃত হল না। দেখা গেল, হাইড্রোজেন লৌহ অক্সাইডকে নির্ভেজাল ধাতুতে বিজারিত করায় পাত্রের ভেতরের দেয়াল অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। চাপের ফলে কার্বন মনোক্সাইড লৌহের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়েছে। প্রক্রিয়াটি অনুসরণক্রমে কারখানাটির রাসায়নিকরা কয়েক কিলোগ্রাম পরিমাণে এই যৌগ উৎপাদনক্ষম একটি কল তৈরি করলেন।

বস্তুত, পেণ্টাকার্বনিলের ফলিত প্রয়োগও আবিষ্কৃত হল। দেখা গেল, বিস্ফোরণরোধী হিসেবে পদার্থটি বেশ ফলপ্রসূ (মনে হচ্ছে, এই জাতীয় রাশি রাশি পদার্থ আমাদের হাতে আসছে)। পেণ্টাকার্বনিলযুক্ত এক ধরনের বিশেষ জ্বালানি উদ্ভাবিত হল। এর নাম মোটালিন। কিন্তু মোটরগাড়িতে এটি বেশি দিন ব্যবহৃত হয় নি। পেণ্টাকার্বনিল সহজেই নিজ উপাদানে বিয়োজিত হত আর এর লৌহ গুঁড়িতে ইঞ্জিন পিস্টনের আঙটার ফাঁক ভরে যেত। আর তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল টি-ই-এল...

লৌহ পেণ্টাকার্বনিল অনায়াসে বিয়োজিত হয়, এ কথা মনে রেখে আমরা অন্য কয়েকটি পদার্থের দিকে বারেক চোখ ফেরাই।

আজ জ্ঞাত কার্বনিলের সংখ্যা অনেক। এগুলি ক্রোমিয়াম ও মোলিব্‌ডেনাম, টাংস্টেন ও ইউরেনিয়াম, কোবাল্ট ও নিকেল এবং ম্যাঙ্গানিজ ও রেনিয়ামজাত।

যৌগগুলির গুণাগুণও বিবিধ: কোনটি তরল, কোনটি কঠিন, কোনটি-বা বিয়োজনশীল, কোনটি সুস্থির।

কিন্তু এরা সকলই একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী: যোজ্যতার সাধারণ প্রত্যয় কার্বনিলে প্রযোজ্য নয়।

জটিল যৌগে ধাতব আয়নের সঙ্গে যে বিভিন্নসংখ্যক প্রশমিত অণুর সমাবন্ধন ঘটে, প্রসঙ্গত তা স্মরণীয়। তাই জটিল যৌগের রসায়নে যোজ্যতার পরিবর্তে সমন্বয় সংখ্যা ব্যবহার্য। কেন্দ্রীয় অণুর সঙ্গে কতটি অণু, পরমাণু অথবা জটিল আয়ন যুক্ত, সমন্বয় সংখ্যায় তাই প্রদর্শিত হয়।

কার্বনিলগুলি প্রকৃতির আশ্চর্যতর উদ্ভাবন। এখানে প্রশমিত অণুর সঙ্গে প্রশমিত পরমাণুর সমাবন্ধন ঘটে। এই যৌগগুলিতে ধাতুর যোজ্যতার মান অবশ্যই শূন্য ধর্তব্য! কারণ, কার্বন মনোক্সাইড প্রশমিত অণু।

এটি রসায়নের অন্যতর স্ববিরোধিতা আর বলতে কি, এর স্পষ্ট তত্ত্বীয় ব্যাখ্যাও অদ্যাবধি অনুপস্থিত।

তত্ত্বকথা এ পর্যন্তই থাক।

কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধাতব কার্বনিলের সদ্ব্যবহারের যথার্থ সুযোগ আবিষ্কৃত হল।

প্রথম, অনুঘটক হিসেবে।

অবশ্য, কার্বনিলের আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারও আছে।

এখানে সেই কারখানার কথা আবার স্মরণ করা যাক, যার গুদামঘরের এক সিলিন্ডারের তলানিতে পেণ্টাকার্বনিল নামক অদ্ভুত পদার্থটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, যেটি... যেটির উৎপাদন প্রায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শুরু হল। কিন্তু একদিন সংশ্লেষক যন্ত্রের চালক যখন দিবাস্বপ্নে মগ্ন, তখন পেণ্টাকার্বনিল চুইয়ে পড়তে শুরু করে। কাছের এক ইস্পাতের পাতে পদার্থটির বাষ্প ঘনীভূত হয়। চালক ছিদ্রটি খুঁজে পেয়ে তা বন্ধ করে, কিন্তু সে সময় ইস্পাতের পাতটি তার হাতে লেগে মঞ্চ থেকে নিচে মেঝেতে পড়ে যায়।

আর এতদিন রৌদ্রে পুড়ে পুড়েও যে পাতটির কিছুই হয় নি তাই মাটিতে পড়ে ফেটে যায়।

নিযুক্ত হল 'তদন্ত কমিশন'। কয়েকটি অধিবেশনের পরে কমিশন এই সিদ্ধান্তে পেঁৗছল যে, পাতটির উপর লৌহের অতি সূক্ষ্ম আস্তর জমেছিল এবং সেজন্যই তা 'ফেটে গেছে'। সূক্ষ্ম চূর্ণমাত্রেই বিস্ফোরণক্ষম: যথা, ময়দার ধুলো এবং চিনির গুঁড়োতেও বিস্ফোরণ ঘটা সম্ভব।

CO_2
Mg
O_2
Fe
Fe
Fe
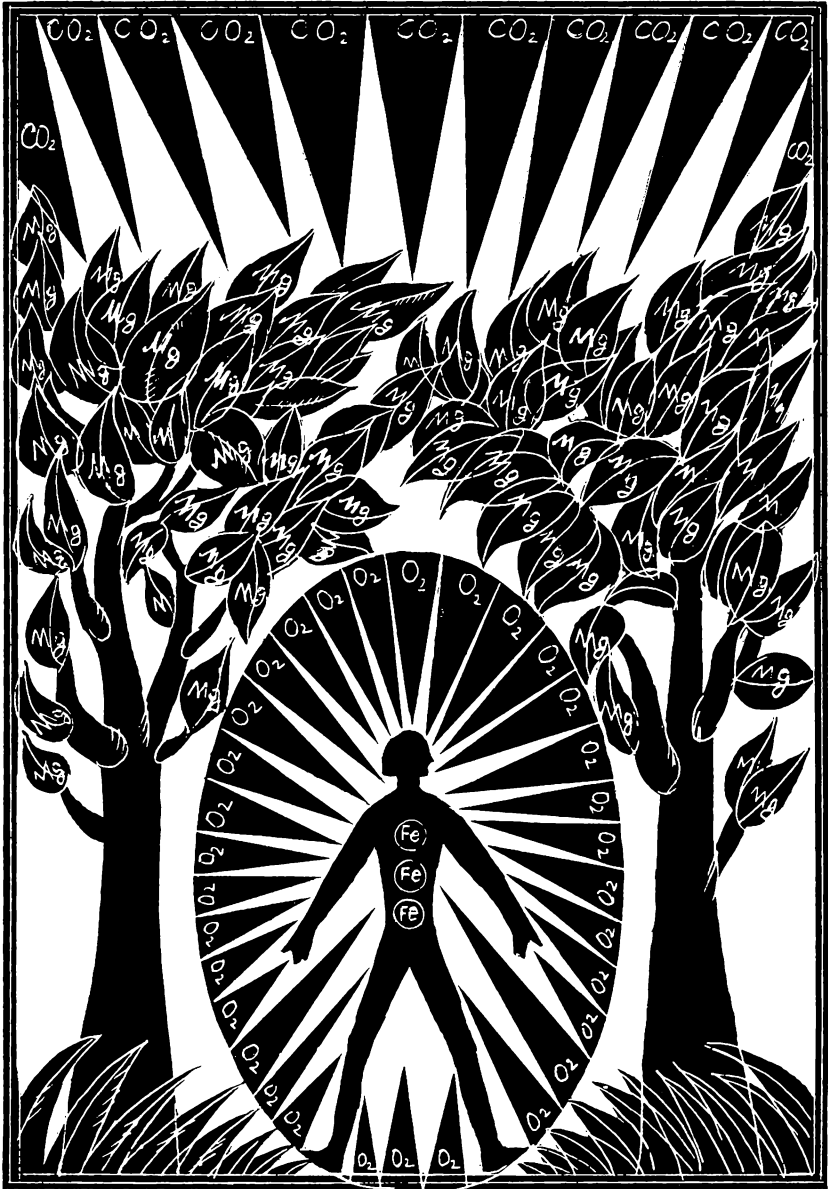
পেণ্টাকার্বনিলের বিয়োজনেই ইস্পাতের পাতটি লৌহচূর্ণের আস্তরে ঢাকা পড়েছিল।

ধাতব কার্বনিলের বিয়োজন মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম ধাতব চূর্ণ তৈরির সম্ভাবনার প্রতি প্রবলভাবে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল।

তাঁরা এই ধরনের চূর্ণের বিশেষ গুণাবলী আবিষ্কার করলেন। এর কণাগুলি অতি সূক্ষ্ম, আয়তনে এক মাইক্রোনের সামান্য বেশি। দৃঢ় শৃঙ্খলবন্দী লৌহচূর্ণের তাল পাকানো 'উল' তৈরি এভাবে সম্ভব।

তপ্ত পাতে জমা হলে কার্বনিল থেকে কঠিন ও পাতলা আস্তর উৎপন্ন হয়। এই চূর্ণ ও আস্তর মূল্যবান চুম্বকীয় ও বৈদ্যুতিক গুণসম্পন্ন এবং ইলেকট্রনিক্স ও রেডিও ইঞ্জিনিয়রিংয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহার্য।

কার্বনিল-চূর্ণ চূর্ণের ধাতুবিদ্যারও একটি আকর্ষী উপকরণ।

লাল ও সবুজ

জৈব পদার্থ হিসেবে উভয়ই অতি জটিল। এদের সংযুতি সঙ্কেত লিখতে আমাদের বইয়ের পুরো একটি পৃষ্ঠা প্রয়োজন। শুধু জটিলই নন, যৌগ হিসেবে এরা অস্বাভাবিকও। কয়েকটি আবর্তের জটিল কাঠামোর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এদের একমাত্র ধাতব পরমাণুটি ঠিক যেন হারিয়ে যায়। রাসায়নিকরা এদের কেলেইট যৌগ বলেন।

'এদের' বলতে আমরা হিমোগ্লোবিন আর ক্লোরোফিলের কথাই বলছি। এদের জন্যই রক্ত লাল আর গাছপালা সবুজ। পৃথিবীর জীবজগতের চাবিকাঠিটি এই পদার্থদুটিতেই নিহিত।

হিমোগ্লোবিনের 'দন্ড' লৌহের একটি অণু। প্রাণীবিশেষে হিমোগ্লোবিনের পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের মৌলিক সংযুতি অভিন্ন। মানুষের রক্তে এর পরিমাণ প্রায় ৭৫০ গ্রাম।

হিমোগ্লোবিন শ্বসনযন্ত্র থেকে জীবের দেহকোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

ক্লোরোফিলের সংযুতিও প্রায় অনুরূপ। পার্থক্য কিন্তু কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণুতে। এটি এখানে ম্যাগ্নেশিয়ামের। ক্লোরোফিলের মৌলিক কার্যাবলী একাধারে অতি জরুরি ও জটিল। উদ্ভিদ এরই সাহায্যে প্রাকৃতিক কার্বন ডাইঅক্সাইড আত্মীকৃত করে।

রাসায়নিকরা হিমোগ্লোবিন ও ক্লোরোফিলের কৃৎকৌশল সম্পর্কে সবেমাত্র জানতে শুরু করেছেন। বলা বাহুল্য, এদের কেন্দ্রীয় ধাতব পরমাণু — লৌহ ও ম্যাগ্নেশিয়ামের ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় প্রকৃতির কল্পনাশক্তি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পর্ফিনিক কাঠামোর (হিমোগ্লোবিন ও ক্লোরোফিলের অভিন্ন জৈব কাঠামোর নাম) ভেতরে শুধুমাত্র লৌহ আর ম্যাগ্নেশিয়ামই থাকে না। এই ধাতব 'দণ্ডের' ভূমিকায় তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ ও ভেনেডিয়াম থাকাও সম্ভব।

নীলরক্ত প্রাণীও পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য নয়। কিছু কম্বোজ প্রজাতি এদের অন্তর্ভুক্ত। এদের রক্তে লৌহ নেই, আছে তার বদলে তাম্র।

দেখুন, রসায়নের জাদুঘরে কত বিচিত্র নিদর্শনই না আছে!

একের মধ্যে সব

এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শুরুতে ভূ-রাসায়নিকরা একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রকল্প উপস্থাপিত করেন। তাঁরা বললেন, যেকোনো প্রাকৃতিক উপকরণ — হোক এক টুকরো পাথর কিংবা কাঠ, একমুঠো মাটি অথবা এক ফোঁটা জল, এতে পৃথিবীর সকল রাসায়নিক মৌলের সবক'টি পরমাণুই খুঁজে পাওয়া যাবে।

শুরুতে ধারণাটি উদ্ভট মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই বৈশ্লেষিক রসায়নের দৃষ্টিতে আরও তীক্ষ্নতা এল। বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নতির ফলে এক গ্রাম পদার্থের বহু লক্ষ কিংবা বহু কোটিভাগের এক ভগ্নাংশেরও পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব হল। আর শেষে দেখা গেল, ভূরাসায়নিকদের কথাটি ষোলো-আনা নির্ভুল না হলেও, তা অনেকটাই সত্যনিষ্ঠ ছিল।

নদীতীর থেকে কুড়িয়ে আনা যেকোনো পাথরেই সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম, পটাসিয়াম ও দস্তা, রৌপ্য ও ইউরেনিয়াম, তথা পর্যায়বৃত্তের প্রায় পুরো সারণীটিই খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও অধিকাংশ মৌলই এতে কয়েকটি পরমাণুতেই সীমিত থাকে। তথ্যটি তবু কৌতূহলোদ্দীপক বৈকি।

পাথরের সবক'টি মৌল একই যৌগে অবস্থিত ছিল, এমন চিন্তা নিঃসন্দেহে অতিসরলীকরণদুষ্ট। আসলে মোটেই তা নয়। পাথর বহু জটিল রাসায়নিক পদার্থের জটিলতর এক মিশ্রণ। এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান: সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম আর অক্সিজেন। বাদবাকী সকলেই নামমাত্র চিহ্নিতব্য।

এই তো গেল প্রকৃতির কথা। কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষাগার? মেন্দেলেয়েভ সারণীর সবক'টি মৌল দিয়ে কোন যৌগ তৈরি কি বিজ্ঞানীদের সাধ্যায়ত্ত?

রাসায়নিকরা এক ডজনেরও বেশি মৌলের অতি জটিল যৌগ সংশ্লেষ করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্তই, তার বেশি নয়। বড় বাড়ির সকল বাসিন্দাকে রাসায়নিক বন্ধে যুক্ত করে কোন অণু গঠনের চেষ্টা বিজ্ঞানীরা করেন নি। অবশ্য, সময়ের অভাব এর কারণ নয়। আসলে এমন পদার্থ ব্যবহারিক দিক থেকে তাৎপর্যহীন। আর এমন একটি দানবীয় অণু তৈরি দুঃসাধ্যও।

দুঃসাধ্য, তবু অবাস্তব নয়।

একটিমাত্র পদক্ষেপে, এক পর্যায়ের বিক্রিয়ায় এমন কোন যৌগ তৈরি সত্যিই বিরল ঘটনা। সকল মৌলসমন্বিত কোন অণুর সংশ্লেষে কয়েক ডজন, এমন কি কয়েক শ' পর্যায়ের বিক্রিয়া সংঘটন অপরিহার্য। কেবলমাত্র বিভিন্ন অংশের সংযোজনার মধ্যেই এমন একটি জটিল 'দালান' নির্মাণ সম্ভব।

কল্পিত 'সর্বমৌলধর' এই যৌগের সরলতম সংকেত লিখনের চেষ্টা থেকেও আমরা এখন বিরত থাকব। এর কারণ সহজবোধ্য। এর সম্ভাব্য গঠন পদ্ধতি নিয়ে অদ্যাবধি কেউই মাথা ঘামায় নি।

পরিকল্পনা, নকশা ছাড়া কোন কিছুই সঠিকভাবে অনুমান করা যায় না। কল্পনাই এখানে একমাত্র সহায়।

অনন্যতম পরমাণু, অনন্যতম রসায়ন ...

এই অনন্য অণুর সংকেত Ps। বলা বাহুল্য, মেন্দেলেয়েভ সারণীতে এর সন্ধান বৃথা। এটি কোন রাসায়নিক মৌলের পরমাণু নয়।

এর আয়ুকাল সেকেন্ডের এক কোটি ভাগের এক ভাগেরও কম। তবু পদার্থটিকে তেজস্ক্রিয় বলা যায় না।

Ps পোজিট্রনিয়ামের প্রতীক। এর সংযুতি খুবই সরল।

মৌলরাজ্যের সরলতম মৌল, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু নেয়া যাক। এর একক ইলেকট্রন একটিমাত্র প্রোটনের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান।

পোজিট্রন উদ্‌গীরক কোন কোন তেজস্ক্রিয় রূপান্তরণে পোজিট্রনিয়ামের পরমাণু দেখা যায়। ক্ষণকালের জন্য পোজিট্রন একক ইলেকট্রনসহ একটি সুস্থির প্রণালী সৃষ্টি করে।

পোজিট্রনিয়ামে পোজিট্রন নামক একটি মৌলিক কণা প্রোটনের স্থলবর্তী হয়। এটি ইলেকট্রনের প্রতিপাদ কণা। পোজিট্রন ভর ও আয়তনে ইলেকট্রন থেকে অভিন্ন, তফাৎ শুধু: এটি বিপরীত (ধনাত্মক) আধানের।

পোজিট্রন ও ইলেকট্রনের সংঘর্ষে উভয়েরই বিলুপ্তি ঘটে। পদার্থবিদদের ভাষায় এরা পরস্পরহন্তা। সংঘর্ষে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সঠিক বললে, এরা বিকিরণে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু নিশ্চিহ্ন হবার পূর্বমুহূর্তে এই আপোসহীন শত্রু-দু'টির পাশাপাশি অবস্থানকালে প্রেত-পরমাণু পোজিট্রনিয়ামের উদ্ভব ঘটে। এই পরমাণুটি নিউক্লিয়াসহীন। এখানে পোজিট্রন ও ইলেকট্রন উভয়টিই সাধারণ আকর্ষকেন্দ্রের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান।

আচ্ছা, পোজিট্রনিয়াম সম্পর্কে কে কৌতূহলী হবে? মনে হয় তত্ত্বীয় পদার্থবিদ কিংবা নক্ষত্রলোকযাত্রী মহাশূন্যযানের জ্বালানিসন্ধানী বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর কোন লেখক।

ষাটের দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পোজিট্রনিয়াম রসায়ন' নামে একটি স্থূল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি কোন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নয়। এর লেখক — নিবিষ্টমনা বিজ্ঞানীরা, এর বিষয়বস্তু: বিজ্ঞানীরা কীভাবে এই অনন্য পরমাণুর সদ্ব্যবহার করেন।

সংক্ষিপ্ত আয়ুকালেও পোজিট্রনিয়াম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় লিপ্ত হয়। যে সকল রাসায়নিক যৌগে মুক্ত যোজ্যতা-বন্ধ বর্তমান তাদের সঙ্গে সহজেই এর সমাবন্ধন ঘটে। অব্যবহৃত এই যোজ্যতাগুলি পোজিট্রনিয়াম পরমাণু দখল করে নেয়।

বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিশেষের অণুবন্দী পোজিট্রনিয়াম পরমাণুর অবক্ষয়ের প্রকৃতি নির্ধারণ করেন। এর অবক্ষয়মাত্রা বিভিন্ন এবং তা অণু সংযুতির উপর নির্ভরশীল। এরই মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অণুর জটিল নকশা পরীক্ষা করেন ও এমন বহু সূক্ষ্ম ও বিতর্কিত সমস্যার সমাধান করেন, যা অন্যথা অসম্ভব ছিল।

আবার হীরক প্রসঙ্গ

রসায়নের জাদুঘরে হীরক শ্রেষ্ঠতম দ্রষ্টব্য নয়। অনন্যতার পক্ষে এর গড়ন খুবই সরল। এর কার্বন কঙ্কালে আজ আর কেউই অবাক হয় না। সেই সপ্তদশ শতকে

রাসায়নিকরা মামুলী বিবর্ধক কাচের সাহায্যে সৌররশ্মি দিয়ে হীরক কেলাস ভস্ম করতেন।

বিজ্ঞানীরা মনে মনে বহুকাল অন্যতর একটি চিন্তা লালন করছিলেন। তাঁরা কৃষ্ণসীস থেকে হীরক তৈরির কথা ভাবতেন। এরা উভয়েই কার্বন এবং এখানে একমাত্র করণীয় কৃষ্ণসীসের কার্বন কাঠামোকে হীরকের কাঠামোয় পুনর্বিন্যস্ত করা। আর তা হলেই চিচিংফাঁক: কোন কিছু সরিয়ে বা যোগ না করেই, অতি কোমল একটি উপকরণ থেকে তৈরি হবে কঠিনতম পদার্থ।

শেষে, পথের সন্ধান মিলল। কাহিনীটি কৌতুকপ্রদ আর আমরা তা যথাস্থানে বলব। এখন শুধু এটুকুই স্মরণীয় যে, কৃত্রিম হীরক তৈরিতে প্রচন্ড চাপের প্রয়োজন হয়েছিল।

তাই চাপই এই গল্পটির নায়ক। আর চাপ এক, দুই কিংবা দশ বায়ুচাপ নয়। এটি অত্যুচ্চ চাপ, সেখানে সমতলের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে শত লক্ষ কিলোগ্রাম ওজন পড়ে।

অত্যুচ্চ চাপে বেশ কয়েকটি অজ্ঞাত পদার্থ তৈরি সম্ভব হয়েছে।

কিমিয়াবিদরা শুধু দুই ধরনের ফসফরাসই জানতেন — সাদা ও লাল। এখন ফসফরাসের আরও একটি প্রকার আমরা জানি। এটি কালো। কালো ফসফরাস সবচেয়ে ভারি, সবচেয়ে নিরেট আর ধাতুর মতোই বিদ্যুৎপরিবাহী। বিশিষ্ট অধাতু এই ফসফরাস অত্যুচ্চ চাপে ধাতুকল্প এক পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা সুস্থিতও।

ফসফরাসের উদাহরণ অনুসরণ করেছে আর্সেনিক এবং অতঃপর, আরও কয়েকটি অধাতু। বিজ্ঞানীরা প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদের ধর্মের চমকপ্রদ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। অত্যুচ্চ চাপের বলিষ্ঠ হাত চোখের সামনেই এই গুণগত রূপান্তরণ ঘটিয়েছে। পদার্থবিদ্যা অনুসারে ব্যাপারটি মোটেই অত্যাশ্চর্য কিছু নয়। অত্যুচ্চ চাপে শুধুমাত্র মৌল ও তাদের যৌগাবলীর কেলাস সংযুতির পুনর্বিন্যাস ঘটেছে এবং সেজন্যই এই বাড়তি ধাতব বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। গত ক'বছরে অত্যুচ্চ চাপে ধাতব কার্বন ও সিলিকন তৈরি সম্ভব হয়েছে। আর বিজ্ঞানীরা এখন ধাতব হাইড্রোজেনের কথা ভাবছেন!

এরই ফলশ্রুতি বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যাজাত শব্দ: 'চাপ-ধাতবীকরণ'।

মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে মানুষের পদার্পণের দিন আর দূরবর্তী নয়। তারপর দূরতর, আরও রহস্যঘন জগতের পালা। মানুষ বারবার কত যে অস্বাভাবিক, অভাবিত অজানার মুখোমুখি হবে!

কিন্তু বর্তমানে আমরা একটি বিষয়ের দিকেই বিশেষ আকৃষ্ট।

রাসায়নিক মৌলাবলী কি সর্বত্র অভিন্ন? পর্যায়বৃত্তের সূত্র ও মেন্দেলেয়েভ সারণীর পরাক্রম বিনা ব্যতিক্রমেই মহাবিশ্বের সর্বত্রই কি বিরাজমান? নাকি রুশ বিজ্ঞানীর এই প্রতিভাধর সৃষ্টি কেবল পৃথিবীতেই গ্রাহ্য?

আশা করি, পাঠকরা আমাদের অগণিত প্রশ্নে অস্বস্তি বোধ করছেন না। বলতে কি, উত্তর দেওয়া অপেক্ষা প্রশ্ন করা অনেক সহজ।

এ সম্পর্কে দার্শনিকদের উত্তর দ্ব্যর্থহীন। তাঁদের মতে পর্যায়বৃত্ত সূত্র ও পর্যায়বৃত্ত সারণী বিশ্বজগতের সর্বত্র অভিন্ন। এটাই এগুলির সর্বজনীনতার লক্ষণ। কিন্তু এই সর্বজনীনতা শর্তাধীন যে যেখানে প্রতিবেশ পৃথিবী অপেক্ষা তত বেশি পৃথক নয়, যেখানে তাপ ও চাপমাত্রা বহু সংখ্যায় চিহ্নিত নয়, শুধু সেখানেই তারা নির্বিশেষ সত্য।

আর এখানেই এর সীমাবদ্ধতা।

পায়ের তলায় কত অজানা

'আকাশের তারা গোনার আগে পায়ের তলা খুঁজে দেখ,' — প্রবচনটি প্রাচ্যদেশীয়।

আমরা কি আমাদের গ্রহটিকে ভালভাবে জানি? দুর্ভাগ্য, তেমন ভালভাবে জানি না। ভূগোলকের ভেতরের গড়ন আর এর গভীরতর অঞ্চলের পদার্থগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

এ ক্ষেত্রে অঢেল প্রকল্পের পুঁজিতে লেশমাত্র কমতি নেই, আর এর কোনটিই গ্রহণীয় নয়।

সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যেই সাত কিলোমিটার অবধি গভীরে তেলকূপ পৌঁছেছে! পনরো থেকে বিশ কিলোমিটার গভীর কূপ খননের দিনও আর দূরবর্তী নয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬,৩০০ কিলোমিটার।

'খোসা না ভেঙ্গে বাদাম খাওয়া যায় না,' — আরও একটি প্রাচ্য প্রবচন।

সাধারণভাবে পৃথিবীর গড়ন বাদামের অনুরূপ। এর বাইরের খোসা — ভূত্বক, ভেতরের সারবস্তু — পৃথিবীর অষ্ঠি। ভূত্বক ও অষ্ঠির মধ্যে মোটা একটি আচ্ছাদনী রয়েছে।

পৃথিবীর খোসায় কি কি আছে, আমরা তা এক-আধটু জানি। অবশ্য, খোসা বলা ঠিক নয়, সবুজ বাদামের মোলায়েম ত্বকের মতোই এটি অতি পাতলা একটি
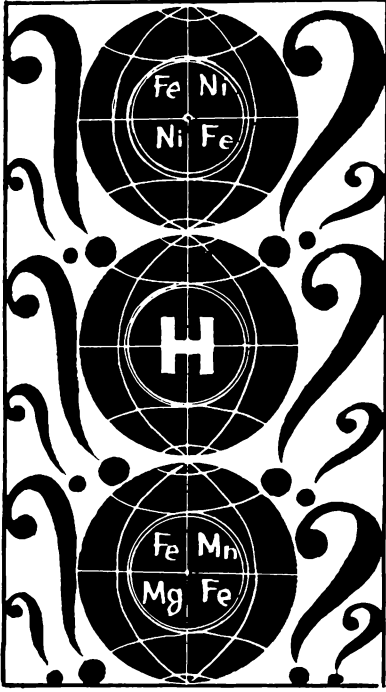
আন্তর মাত্র। অষ্ঠির কথা দূরে থাক, আচ্ছাদনীর গড়নটি কেমন, সে সমস্যা আজও প্রশ্নকণ্টকিত।

শুধুমাত্র একটি ব্যাপার সম্পর্কে কোন মতান্তর নেই: পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ সব স্তর নেহাৎ অনন্য উপাদানে গঠিত। পৃথিবীর কেন্দ্রমুখে উপরিস্থ স্তরের চাপ ক্রমান্বয়েই অধিকতর। এর অষ্ঠিস্থ চাপ জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কেই গণনীয় — পরিমাণটি ৩০ লক্ষ বায়ুচাপের সমান।

পৃথিবীর অষ্ঠির কথা: এর গঠন সংক্রান্ত বিতর্ক বহু শতাব্দী পুরানো। আর, এখানে যত মুনি, তত মত।

অনেকের মতে আমাদের গ্রহের অষ্ঠি লৌহ ও নিকেলে তৈরি। অন্যরা ভিন্নমত। তাঁদের মতে অষ্ঠির নির্মাণোপকরণ গোমেদ মণিক। সাধারণ অবস্থায় গোমেদ ম্যাগ্নেশিয়াম, লৌহ আর ম্যাঙ্গানিজ সিলিকেটগুলির মিশ্রণ। কিন্তু অষ্ঠির প্রচণ্ড ভয়াবহ চাপে গোমেদ এক রকম ধাতুকল্প ভৌত পদার্থে রূপান্তরিত হয়। কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী এক্ষেত্রে আরও অগ্রগামী। তাঁরা মনে করেন, পৃথিবীর অষ্ঠিকেন্দ্রটি চাপপিষ্ট কঠিন হয়ে ওঠা হাইড্রোজেনে তৈরি এবং সেজন্যই এর অস্বাভাবিক ধাতুকল্প বৈশিষ্ট্য। আবার কেউ কেউ...

আমাদের বরং এখানে থামাই উচিত। ‘খোসা না ভেঙ্গে বাদাম খাওয়া যায় না’। কিন্তু পৃথিবীর অষ্ঠি অবধি পেঁছতে এখনও যে অনেক দেরী।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংস্থিতির তুলনায় এই অষ্ঠির সংযুতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিততর। স্ববিরোধিতা, তাই না?

সত্যি, অজানা পায়ের তলায়ই আছে! রাসায়নিকের জন্য সত্যিকার বিস্ময়ের

ভাঁড়ার: অস্বাভাবিক কেলাসী অবস্থার মৌলাবলী, ধাতুতে রূপান্তরিত অধাতু, কল্পনাতীত ধর্মের নানা ধরনের অসংখ্য যৌগ।

গভীরতর স্তরের আশ্চর্য রসায়ন!

কিন্তু এখনকার রসায়ন খুবই 'ভাসাভাসা' ধরনের বিজ্ঞান। উক্তিটি রুশ বিজ্ঞানী আ. কাপুস্তিন্স্কির।

গভীরতম স্তরেও কি মৌলের পর্যায়বৃত্ত বিরাজমান? তাই বটে, তবে যতক্ষণ না অবধি পরমাণুর ইলেকট্রন সংযুতির পরিবর্তন ঘটেছে ও ইলেকট্রনগুলি নিজ নিজ খোলকে বিন্যস্ত থাকছে।

কিন্তু 'স্থিতাবস্থার' আয়ু চিরস্থায়ী নয়।

যখন সে আর সে নয়

না, অত্যুচ্চ চাপ প্রসঙ্গটি এখনও শেষ হয় নি। একটি নতুনতর বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষিত।

নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন বেষ্টনীটি সুদৃঢ় কাঠামো। কয়েকটি ইলেকট্রন হারালে, পরমাণুটি আয়নে রূপান্তরিত হয়। প্রক্রিয়াটি রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়ার এক সার্বক্ষণিক ঘটনা।

ইলেকট্রন হারিয়ে হারিয়ে এক পর্যায়ে পরমাণুটি কেবলমাত্র 'উদম' নিউক্লিয়াসে পর্যবসিত হয়। দশ লক্ষ ডিগ্রি তাপমাত্রায়ই এমনটি ঘটে। নক্ষত্ররাজ্যই এর দৃষ্টান্ত।

কিন্তু আরও একটি হেঁয়ালি রয়েছে। ধরা যাক, ইলেকট্রনের মোট সংখ্যা অটুট রইল, কিন্তু পরিবর্তন ঘটল ইলেকট্রন খোলকে এদের বিন্যাসে। বিন্যাস পরিবর্তনে পরমাণুর তথা মৌলের গুণগত পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী।

উক্ত সব কথা চিত্র-পরিচয়ের পাঠ। এবার খোদ চিত্রটি।

পটাসিয়াম পরমাণুর চিত্রাঙ্কনে কোন জটিলতা নেই। এর খোলক চারটি। নিউক্লিয়াসলগ্ন (K আর L) খোলক পরিপূর্ণ: প্রথমটিতে দুই আর দ্বিতীয়টিতে আটটি ইলেকট্রন বর্তমান। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে আর কোন ইলেকট্রন ভরণ সম্ভবপর নয়। কিন্তু অন্যতর খোলকদু'টি মোটেই সম্পূর্ণ নয়। M-খোলকের ইলেকট্রন সংখ্যা মাত্র ৮ (১৮টি থাকা উচিত) আর N-খোলকের সবেমাত্র শুরু (একটিই ইলেকট্রন) এবং তাও পূর্বতন খোলাকটি পুরো হবার আগেই।

সম্বন্ধহীন, পর্যায়ক্রমিক ইলেকট্রন খোলক গঠনের নজির আমরা প্রথমে পটাসিয়াম থেকেই জানি।

কিন্তু চতুর্থ খোলকে প্রবেশ করার বদলে 'পটাসিয়াম' ইলেকট্রনের পক্ষে তৃতীয় খোলকটি অব্যাহত রাখাই তো সঙ্গত ছিল (কারণ, ওখানে তখনও দশটি শূন্য স্থান পূর্ণ হয় নি)। তবে?

উদ্ভট! তাই, তবে সাধারণ অবস্থায়। কিন্তু অত্যুচ্চ চাপ বলবৎ হলে, অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব ঘটে।

এমতাবস্থায় নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রন বেষ্টনী অনেক সঙ্কুচিত হয় এবং প্রত্যন্ত ইলেকট্রনগুলি নিম্নস্থ অসম্পূর্ণ খোলকে 'পতিত' হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, পটাসিয়ামের চতুর্থ খোলকের একমাত্র ইলেকট্রনটি তৃতীয় খোলকে দিয়ে M-খোলকের ইলেকট্রন সংখ্যা ৯টি করা হল।

এর ফল কী হবে? পটাসিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা (১৯) আগের মতোই অপরিবর্তিত থাকবে এবং তার ইলেকট্রন সংখ্যাটিও। এখানে মৌলের রূপান্তর ঘটে নি।

কিন্তু আমাদের পরিচিত ক্ষারধাতু পটাসিয়াম আর আগের মতো আমাদের পরিচিত থাকবে না। চারটি খোলকের পরিবর্তে এর খোলক এখন তিনটি এবং প্রত্যন্ত খোলকে একের বদলে ইলেকট্রন আছে নয়টি। পরমাণুটিকে অপরিচিত ঠেকবে। তাই এই 'নবপটাসিয়াম'এর গুণাগুণ নতুন করে পরীক্ষা করা প্রয়োজন হবে।

এর গুণাগুণ সম্পর্কিত ধারণাবলী সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। 'নবপটাসিয়াম'এর কণামাত্রও কেউ কোনদিন দেখে নি।

আরও উচ্চতর চাপে পটাসিয়ামের পরবর্তী মৌলগুলিরও স্বাভাবিক আদল বদলে যাবে। ইলেকট্রনের খোলক ভরাটের এই ক্রমান্বিত প্রক্রিয়ায় মেন্দেলেয়েভ সারণীর নিয়মটি আর বলবৎ থাকবে না। যতক্ষণ একটি খোলক সম্পূর্ণ থাকছে, ততক্ষণ এর পরবর্তীটি শূন্য থাকবে।

...নতুন পর্যায়বৃত্তের অনুবর্তিতা এর পক্ষেও অনিবার্য, অবশ্য তা মেন্দেলেয়েভের নয়। এতে থাকবে অন্যান্য বাসিন্দা (প্রথম তিন পর্বের মৌলাবলী ব্যতিরেকে)। তাম্র ও প্রোমেথিয়াম হবে এর ক্ষারধাতু, এবং নিকেল ও নিয়োডিমিয়াম হবে এর বর-গ্যাস' আর এদের আনুষঙ্গিক প্রত্যন্ত খোলকগুলিও ইতিমধ্যেই ভরে উঠবে।

হয়ত এ-ই হবে ‘গভীর তলের’ রসায়ন। অসাধারণ যোজ্যতা, অদ্ভুত গুণাগুণ, বিস্ময়কর যৌগাবলী...

আকর্ষী? অবশ্যই! বাস্তব? কে জানে... এখানে সম্ভবত আবার প্রয়োজন সেই ‘মত্ত’ কল্পনার। আনকোরা পদার্থ সংশ্লেষের ব্যাপারটিই তো এর সঙ্গে জড়িত। যদি সত্যিই তা অত্যুচ্চ চাপে হয়ে থাকে, তবে সাধারণ চাপে আবার তারা পূর্বতন পদার্থে রূপান্তরিত হবে।

কীভাবে এই রূপান্তরণকে ‘সংহত’ করা সম্ভব, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন। যদি আমরা এই সমস্যার সমাধানে সফল হই, তবে নতুন এক রসায়নের জন্মদান করব। আর তা হবে ২ নম্বর রসায়ন।

তার
চোখের
আলোয়
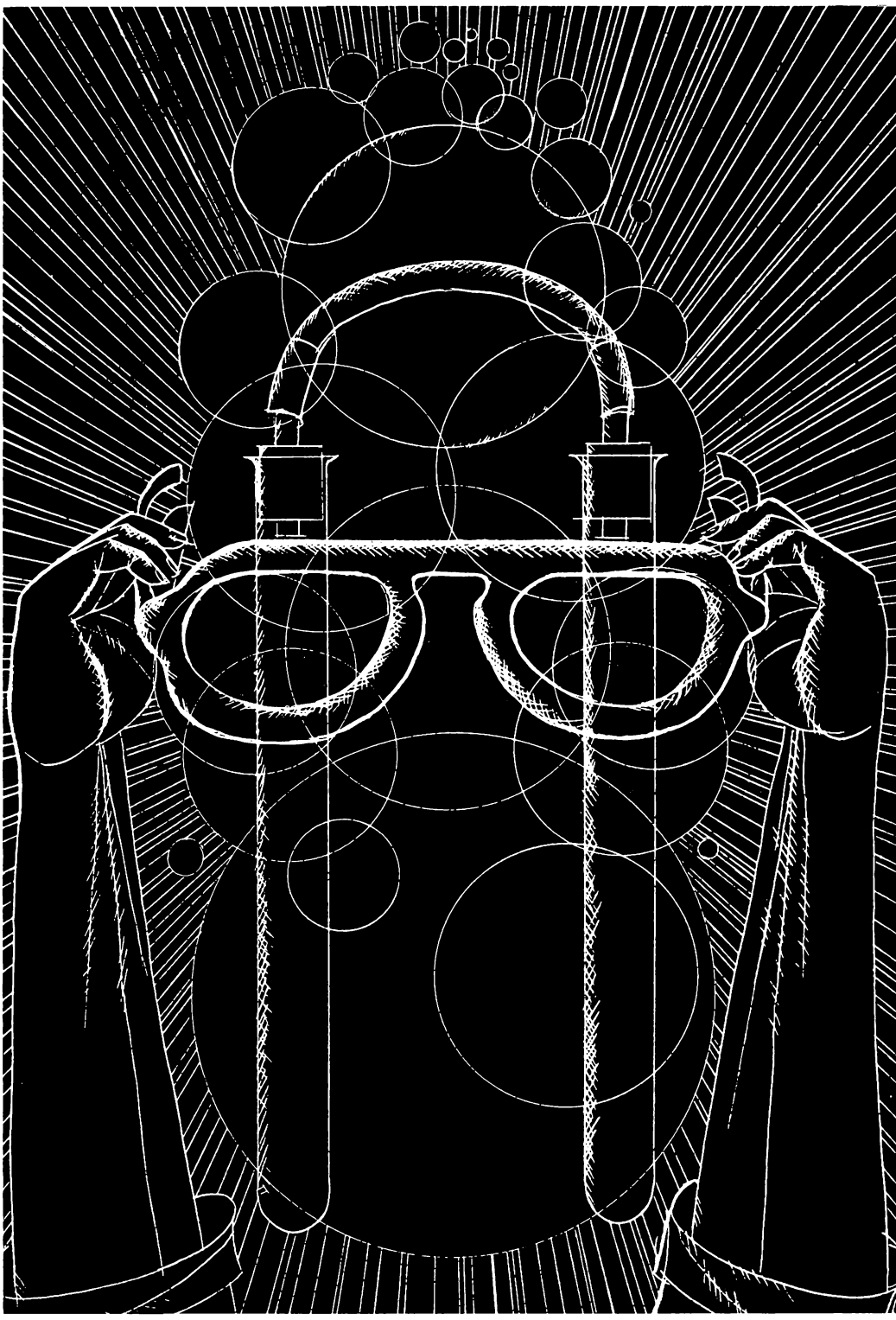
বিশ্লেষণ সম্পর্কে ক'টি কথা

মিখাইল লমোনসভ একদা বলেছিলেন: 'রসায়নের ভুজ সুদূরপ্রসারী। দুই শতাধিক বছর আগেই আশ্চর্য উদ্ভাবনী দক্ষতায় তিনি উত্তরসূরীদের জীবনে রসায়নের তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর অভ্রান্ততা বিংশ শতাব্দীতে নিখুঁতভাবেই প্রমাণিত। রসায়ন আজ 'বহুভুজ সত্তা'। বলামাত্র তার সবক'টি শাখা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেয়া সকল আকাদেমিশিয়ানেরও সাধ্য নয়। তা ছাড়া প্রায় প্রতি বছরই তো এর নতুন শাখা গজাচ্ছে।

কিন্তু এমন একটি ব্যাপার আছে যাকে বাদ দিলে রসায়নের কোন 'ভুজেরই' টিকে থাকা অসম্ভব।

এবং তা রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

এরই সাহায্যে রাসায়নিকরা পৃথিবীর বহুসংখ্যক মৌল আবিষ্কার করেছেন।

এরই সাহায্যে তাঁরা সরল থেকে জটিল, খাবার লবণ থেকে প্রোটিন অবধি হরেকরকম রাসায়নিক যৌগের উপাদান নির্ণয় করেছেন।

এরই মাধ্যমে মণিক ও খনিজের সংস্থিতি নির্ধারিত হয়েছে এবং ভূ-রাসায়নিকরা পৃথিবীর ভাঁড়ারে রাসায়নিক মৌলের সঠিক মজুদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিমাপ করেছেন।

বিশ্লেষণের কাছে রসায়ন সবিশেষ ঋণী। এরই বদৌলতে রসায়ন আজ যথার্থ বিজ্ঞান। মানুষের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রেও এটিই প্রথম সহায়। এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য।

মারুত চুল্লিতে আকরিক গলিয়ে লৌহ তৈরির কথাই ধরা যাক। উৎপন্ন ধাতুর গুণগত মান ধাতুভুক্ত কার্বনের মাত্রিক পার্থক্যের উপরই মূলত নির্ভরশীল। এতে কার্বনের পরিমাণ ১·৭ শতাংশের বেশি থাকলে ঢালাই লৌহ, ১·৭ থেকে ০·২ শতাংশের অন্তবর্তী সকল পর্যায়ে নানা ধরনের ইস্পাত, আর ০·২ শতাংশেরও কম থাকলে, কাঁচা লৌহ উৎপন্ন হয়।

লৌহ আর ইস্পাত, পিতল আর ব্রোঞ্জের মধ্যে পার্থক্য কী? তুঁতিয়ায় তাম্রের পরিমাণ কত? কার্নেলাইট নামক খনিজে পটাসিয়ামই-বা কত? কেবলমাত্র বিশ্লেষণেই এই এবং এ ধরনের প্রশ্নাবলীর জবাব মেলে৷ এর সামনে বরাবর দু'টি প্রধান প্রশ্ন থাকে: পরীক্ষণীয় পদার্থে কী কী মৌল আছে,

আর তাদের অনুপাত কত? এর প্রথমটি গুণীয় এবং দ্বিতীয়টি মাত্রিক বিশ্লেষণের আওতাধীন।

কিন্তু বিশ্লেষণ-পদ্ধতি কত প্রকার? এর উত্তর কেউ জানে না, এমন কি অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞও নিশ্চিত নন।

ভাল বারুদ তৈরির পদ্ধতি

বারুদের আবিষ্কারক কে? জনশ্রুতি অনুসারে তিনি জার্মান সন্ত বার্থহোল্ড স্ভার্ৎস... বারুদ তৈরি তেমন কিছু কঠিন কাজ নয়। গন্ধক, সোরা আর কাঠ-কয়লার মিহি গুড়ো সঠিক অনুপাতে মেশালেই কার্যোদ্ধার। কিন্তু উপাদানগুলো উচ্চ মানের হওয়া চাই।

কিন্তু তাদের গুণাগুণ যাচাই কীভাবে সম্ভব?

প্রাচীনকালে বারুদ প্রস্তুতকারীরা সোরা জিভে ঠেকিয়ে তা খাঁটি কি না পরীক্ষা করতেন।

মহাফেজখানার দলিল-দস্তাবেজে সোরা পরীক্ষার কৌতূহলী যে-বিবরণ পাওয়া গেছে তা এ রূপ: 'নোনতা কিংবা তিতা সোরা মাত্রেই বাজে। যে-সোরা জিভে কামড় দেয় আর স্বাদে মিষ্টি, তাই উত্তম।'

সুতরাং, বলা যায়, ভাল বারুদ প্রস্তুতকারী হতে অন্তত 'দশ সের সোরা খাওয়া প্রয়োজন' — নয় কি?

আর গন্ধক পরীক্ষার পদ্ধতি আরও বেড়ে বৈকি।

এক টুকরো গন্ধক জোরে মুঠোয় চেপে কানের কাছে নিলে যদি একটিও চিড় খাওয়ার শব্দ শোনা যায় তবেই তা খাঁটি। অন্যথা তা ভেজাল ও বর্জ্য।

কিন্তু খাঁটি গন্ধকে চিড় খাওয়ার শব্দ হয় কেন? এর তাপ পরিবাহিতা খুবই সীমিত। আঙ্গুলের তাপে গন্ধক টুকরোর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মাত্রায় উত্তপ্ত হয়। অতঃপর, এভাবে উৎপন্ন পীড়নে ভঙ্গুর বিধায় তা সশব্দে বহু খণ্ডে ভেঙ্গে পড়ে। ভেজাল গন্ধকের তাপ পরিবাহিতা অনেক বেশি এবং তা অপেক্ষাকৃত শক্ত। এই তো ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, কানে শোনার রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত করে বলা যায়, ইন্দ্রিয়ই সেকালের রাসায়নিকদের সেরা

বিশ্লেষক যন্ত্র ছিল। একাধিক সরল ও জটিল পদার্থের নামকরণে এই বাস্তবতা প্রতিফলিত। বেরিলিয়ামের পূর্বনাম গ্লুসিনিয়াম। এর লবণগুলির মিষ্ট স্বাদই এই শেষোক্ত নামের কারণ। লেটিন শব্দার্থ 'মিষ্টি' থেকেই গ্লিসারিন নামের উৎপত্তি। প্রাকৃতিক সোডিয়াম সালফেটের নাম মিরাবিলাইট, অর্থাৎ 'তিতা'।

জার্মেনিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী

১৮৮৬ সালের মার্চ মাসের শুরুতে দ. মেন্দেলেয়েভ একটি চিঠি পান। চিঠিটি:

'প্রিয় মহাশয়,

অত্র আমার নিবন্ধের এই প্রতিলিপিটি গ্রহণ করে আমাকে বাধিত করুন। আমার আবিষ্কৃত জার্মেনিয়াম নামের একটি নতুন মৌলের বিবরণী এতে বর্ণিত। প্রথমে মনে করেছিলাম মৌলটি আপনার বিস্ময়কর ও নির্ভুল পর্যায়বৃত্ত সারণীর অ্যান্টিমনি ও বিস্‌মাথের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানটি পূর্ণ করবে এবং আপনার ইকা-অ্যান্টিমনির সঙ্গে

তার সন্নিপাত ঘটবে। কিন্তু দেখলাম, বাস্তব অবস্থা অন্যতর এবং এটি ইকা-সিলিকনের ঘনিষ্ঠ।

'আশা করছি, অচিরেই এই আকর্ষী পদার্থটির খুঁটিনাটি তথ্যাদি আপনাকে জানাতে পারব। আজ আপনার অভ্রান্ত উদ্ভাবনী দক্ষতার আরও একটি নতুন বিজয়-সংবাদ জানাতে পেরে আমি খুশি। আমার গভীর শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

আপনার বিশ্বস্ত
ক্লিমেন্স উইংকলার

ফ্রাইবার্গ, স্যাক্সনি
২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬'

জার্মেনিয়ামের আবিষ্কারের প্রায় শতবর্ষ আগে হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ বৃথাই বলেন নি যে, 'সবকিছুই ওজন, সংখ্যা আর আয়তনে পরিমাপ্য'। স্যাক্সনি অঞ্চলে আর্গিরোডাইট নামক দুষ্প্রাপ্য খনিজ আবিষ্কারের অল্পকালের মধ্যেই ক্লিমেন্স উইংকলার তার বিশ্লেষণ শুরু করেন। তিনি এতে রৌপ্য, গন্ধক এবং অল্প পরিমাণ লৌহ, দস্তা ও পারদ খুঁজে পান। কিন্তু আর্গিরোডাইটের মৌলাবলীর শতকরা অনুপাতগুলি বার বার যোগ করেও যে অংকটি পাওয়া গেল তা ৯৩ এবং কোনক্রমেই ১০০ নয়। এখানেই নিহিত ছিল রহস্যের ইঙ্গিত।

এই ছলনাকারী ৭ শতাংশ তা হলে কি? সেকালে জ্ঞাত সবকটি মৌলের বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেও কোন ফল হল না। সকল বিশ্লেষণের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে অতঃপর উইংকলার এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। এই ৭ শতাংশ নতুন কোন মৌল হিসেবেই তাঁর কাছে প্রতীয়মান হল। তাঁর ধারণার অভ্রান্ত প্রমাণও মিলল। বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সামান্য বদলে তিনি এই ছলনাকারী ৭ শতাংশকে আলাদা
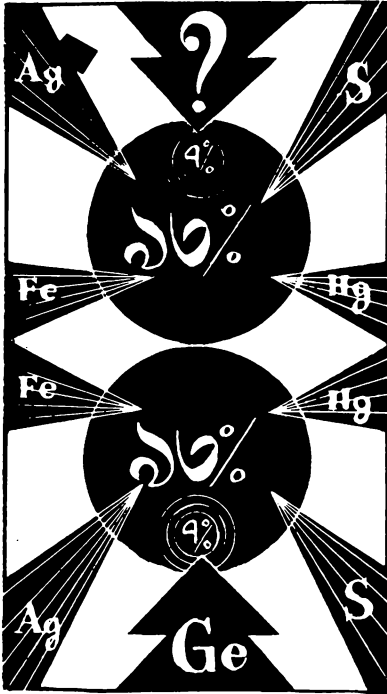
করলেন। প্রমাণিত হল পদার্থটি সেকালের অজ্ঞাত এক মৌল। স্বদেশের স্মরণে তিনি এর নাম রাখলেন জার্মেনিয়াম।

অন্য একটি নতুন মৌলের আবিষ্কারেও তৌলিক বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। মৌলটি মেন্দেলেয়েভ পর্যায়বৃত্ত সারণীর শূন্যদলের প্রতিনিধি — আর্গন।

বিগত শতাব্দীর নব্বুই দশকের প্রথম দিকে ব্রিটিশ পদার্থবিদ র‍্যালে গ্যাসের ঘনত্ব তথা পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের কাজ শুরু করেন। নাইট্রোজেনে পৌঁছবার পূর্বাবধি সবই ঠিক ছিল। কিন্তু এখান থেকেই অঘটন শুরু হল। দেখা গেল বাতাস থেকে পাওয়া এক লিটার নাইট্রোজেন রাসায়নিক যৌগ থেকে উৎপন্ন সমপরিমাণ নাইট্রোজেন অপেক্ষা ভরে ০·০০১৬ গ্রাম বেশি। হতভাগ্য সেই নাইট্রোজেন-লিটারটি অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট, নাইট্রাস বা নাইট্রিক অক্সাইড, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া অথবা অন্য যেকোন যৌগ থেকেই উৎপাদিত হোক, আবহ-নাইট্রোজেনের সমপরিমাণ থেকে তার ভর সব সময়ই কম।

এই অদ্ভুত বৈষম্যের কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ র‍্যালে অগত্যা তাঁর পরীক্ষার ফলাফলটি লণ্ডনের 'ন্যাচার' পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। অচিরেই রাম্‌জে সাড়া দিলেন এবং ধাঁধা সমাধানের লক্ষ্যে দুই বিজ্ঞানী নিজ নিজ প্রয়াস ঐক্যবদ্ধ করলেন। ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে র‍্যালের প্রাথমিক ব্যর্থতার কারণ অবিষ্কৃত হল। দেখা গেল, বাতাসে আরও একটি নতুন গ্যাস রয়েছে। সেটি আর্গন এবং তার পরিমাণ প্রায় এক শতাংশ।

সাধারণ তৌলিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা নতুন মৌলগুলি আবিষ্কার করলেন। বিশ্লেষণ বর্জন আজও কোন রাসায়নিক পরীক্ষাগারের পক্ষেই সম্ভব নয়। জটিল যৌগ ও খনিজে মৌলের অনুপাত নির্ণয়ে সাধারণ ওজনপদ্ধতি বিশেষ সহায়ক। অবশ্য এর আগে কষ্টকর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৌলগুলিকে পরস্পর থেকে আলাদা করা প্রয়োজন।

আলো আর রঙ

সোভিয়েত দেশের প্রধান প্রধান ছুটি উপলক্ষে নাগরিকরা নিশ্চয়ই বেতার ঘোষকের কণ্ঠে শুনেছেন: 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আদেশ... সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদের দেশের রাজধানী মস্কো, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির রাজধানী আর বীরনগরীসমূহে গুলি ছুড়ে অভিবাদন জানান হোক...'

অভিবাদনের সময় গোলার বজ্রগর্জনের তালে রাতের আকাশ হলুদ, সবুজ

আর লাল আলোর ঝর্ণাধারায় অপরূপ বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে। গোলা ও আতশবাজী ছুড়ে উৎসব উদ্‌যাপনের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। খ্রীঃ পূঃ ২,০০০ বছর আগেও আতশবাজী তৈরির কৌশল চীন দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণে বর্ণিল-শিখা ব্যবহারের পদ্ধতিটি বিজ্ঞানীরা জেনেছেন এ তুলনায় সম্প্রতিকালে।

বিভিন্ন ধাতুর লবণ যে বর্ণহীন গ্যাস-শিখাকে বিভিন্ন রঙে রঙিন করে এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেন জার্মান পদার্থবিদ কির্খহফ্। সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও বেরিয়াম লবণে আলোক-শিখা যথাক্রমে হলুদ, গাঢ় লাল আর সবুজ হয়ে ওঠে... ইত্যাদি।

বিভিন্ন পদার্থে মৌলাবলীর অস্তিত্ব আবিষ্কারের পদ্ধতিটি যে নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত ফলপ্রসূ, কির্খহফ্ তা অচিরেই উপলব্ধি করলেন। যা হোক তাঁর উল্লাস ছিল অকালপক্ক। দেখা গেল পদ্ধতিটি বিশুদ্ধ লবণের ক্ষেত্রে কার্যকরী, কিন্তু মিশ্র লবণে নয়। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের লবণ মিশ্রিত হলে বাতির উজ্জ্বল হলুদ শিখার (সোডিয়ামের জন্য) প্রেক্ষিতে পটাসিয়ামের বেগুনি রঙ প্রায় অদৃশ্য থাকে।
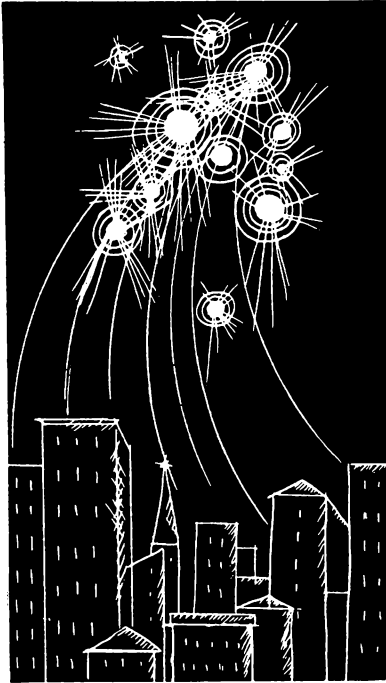
রাসায়নিক কির্খহফের সাহায্যে এগিয়ে এলেন পদার্থবিদ বুনসেন। তাঁর সুপারিশ মতো মিশ্র লবণ ব্যবহারকালে আলোক-শিখাটি বর্ণালীবীক্ষণ নামক একটি নতুন যন্ত্রে দেখার ব্যবস্থা হল। যন্ত্রটির মূল উপকরণ ছিল একটি প্রিজম, যা অন্তর্গামী সাদা আলোকে বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট করত অর্থাৎ আলোককে নিজ উপাদানে ভেঙ্গে ফেলত। 'বর্ণালীবীক্ষণ' অর্থ বর্ণালী দর্শন।

ধারণাটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হল। দেখা গেল, গ্যাস-বার্নারের শিখায় লবণ পোড়ে সেই আলো বর্ণালীবীক্ষণে ফেললে সাধারণ আলোর অবিচ্ছেদ্য

বর্ণালীর পরিবর্তে এতে রৈখিক বর্ণালী সৃষ্টি হয় এবং বর্ণালীর রেখাগুলি সর্বক্ষণ স্বস্থানে থাকে। সোডিয়াম লবণকে বার্নারের শিখায় পোড়ালে যে বর্ণালী পাওয়া যায় এতে পরস্পর ঘনিষ্ঠ দু'টি গাঢ় হলুদ রেখা থাকে। পটাসিয়ামে একটি লাল আর দু'টি বেগুনি রেখা দেখা দেয়।

কোন একটি রাসায়নিক মৌলের রেখাগুলি বর্ণালীতে যে সবসময়ই যথানির্দিষ্ট অবস্থানে প্রকটিত হয় তা কির্খহফ ও বুনসেন লক্ষ্য করেন। সোডিয়ামকে ক্লোরাইড, সালফেট, কার্বনেট অথবা নাইট্রেট ইত্যাকার যে-আকারেই আগুনে পুড়ান হোক, সোডিয়াম রেখার অবস্থান সর্বদাই অভিন্ন থাকে। এমন কি সোডিয়াম লবণকে যদি পটাসিয়াম, তাম্র, লৌহ, স্ট্রন্সিয়াম অথবা বেরিয়াম ইত্যাদির লবণের সঙ্গেও মেশান হয় তাতেও সোডিয়াম রেখার অবস্থানগত কোন পরিবর্তন ঘটে না।

নিজ আবিষ্কারে উৎসাহিত কির্খহফ্ ও বুনসেন অক্লান্তভাবে কাজ করে চললেন। তাঁরা অনেকক'টি মৌল আর যৌগকে 'আগুনে পুড়িয়ে' পরীক্ষা করলেন। কিছুকালের মধ্যেই বহু রাসায়নিক মৌলের বর্ণালীধৃত রেখার একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরি হল। এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা বহু জটিল মিশ্রণের নির্ভুল বিশ্লেষণে আজ সক্ষম হয়েছেন।

এভাবেই বর্ণালীগত বা বর্ণালী বিশ্লেষণের জন্ম। শুধু মিশ্রণস্থ জ্ঞাত রাসায়নিক মৌলের গুণীয় বিশ্লেষণের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হিসেবেই নয়, নতুন মৌল আবিষ্কারেও এর ভূমিকা উল্লেখ্য। এরই কল্যাণে আবিষ্কৃত হয়েছে রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ইণ্ডিয়াম এবং গ্যালিয়াম। বর্ণালীধৃত রেখাগুলির গভীরতা (উজ্জ্বলতা) যে মিশ্রণস্থ পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, এই তথ্য জানার পর বর্ণালী বিশ্লেষণ মাত্রিক পদ্ধতির ক্ষেত্রেও এক সম্মানিত আসনের অধিকার লাভ করল।

সূর্যের... রাসায়নিক বিশ্লেষণ

চিরাচরিত প্রথানুসারে ১৮৬৮ সালের সূর্যগ্রহণের আগেই জ্যোতির্বিদরা অঢেল যন্ত্রপাতি সাজিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এবারের তালিকায় বর্ণালীবীক্ষণও স্থান পেয়েছিল। অল্পকাল আগে একাধিক মৌল আবিষ্কারের সাফল্যে যন্ত্রটি সবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়েছে।

He

যথারীতি গ্রহণ শেষ হল। থিথিয়ে এল সবকিছু। কিন্তু সে বছরের ২৫শে জুলাই ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমিতে একই সঙ্গে দু'টি চিঠি পৌঁছল। একটি এল সুদূর ভারতবর্ষ থেকে, লেখক জনৈক ফরাসী, নাম জানসেন। অন্যটি ইংলন্ড থেকে, লিখেছেন লকিয়ার। দু'টি চিঠির বক্তব্যই প্রায় হুবহু এক: বর্ণালীগত বিশ্লেষণে তাঁরা সৌরলোকে পৃথিবীর অজ্ঞাত একটি মৌল আবিষ্কার করেছেন। এর অস্তিত্ব বর্ণালীতে সোডিয়ামের অনুরূপ একটি হলুদ রেখায় চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু রেখাটি মোটেই সোডিয়ামকল্প নয়।

সংবাদ শুনে শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞানীমণ্ডলী বিস্মিত। জানকেন ও লকিয়ার শুধু সূর্যই 'বিশ্লেষণ' করেন নি, তৎসঙ্গে একটি নতুন মৌলের আবিষ্কারও দাবি করছেন!

পৃথিবীতে হিলিয়ামের ('সৌর মৌল'কে দেয়া নাম) অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল এর ২৭ বছর পরে ১৮৯৫ সালে।

যে-পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে দূর মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের রহস্যোদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হল সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে ফরাসী আকাদেমি যন্ত্রটির একটি বিশেষ মডেল তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য পদ্ধতিটি নতুন মডেলের উপযোগী ছিল বই কি! অন্য যেকোন পদ্ধতিতে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য অন্তত কিছুটা পদার্থ অপরিহার্য বিবেচিত হয়। কিন্তু বর্ণালী বিশ্লেষণে তাও নিষ্প্রয়োজন। দূরত্ব এখানে কোন প্রতিবন্ধ নয়।

'সৌর মৌল' আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা একাধিকবার সূর্যের দিকে বর্ণালীলেখ (নিবেশনক্ষম বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র) তাক করিয়েছিলেন। যন্ত্রটি সূর্য সম্পর্কে তাঁদের যথাসাধ্য জানিয়েছিল।

তারপর এল দূরের ও কাছের নক্ষত্রদের পালা। তাদের আলো পৃথিবীর বর্ণালীবীক্ষণে ধরা পড়ল আর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারের নীরবতায় নিমগ্ন হলেন পুঞ্জিত বর্ণালীরেখার জটিলতার অর্থোদ্ধারে। পৃথিবীর সকল মৌলই পুনরাবিষ্কৃত হল মহাশূন্যের গ্রহে, নক্ষত্রে।

সৌর হিলিয়াম আবিষ্কারের ৮০ বছর পর সেই পুরানো বিস্ময়ের ধারা এসে ঠেকেছিল মেন্দেলেয়েভ সারণীর ৪৩ নং কক্ষবাসী মৌল টেক্‌নেসিয়াম-এ। অপার্থিব এই মৌলটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় কোন কোন নক্ষত্রের বর্ণালীতে এবং শেষে অতি সামান্য মাত্রায় পৃথিবীতে। কিন্তু নক্ষত্রলোকে টেক্‌নেসিয়াম মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়। পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে সেখানে তা সর্বদাই স্বতোৎসারী।

সূর্য এবং অন্যতর নক্ষত্রে অতঃপর আর কোন নতুন মৌল আবিষ্কৃত হয় নি। এবং, সম্ভবত হবেও না। বিশ্বলোক অভিন্নরূপ: পৃথিবী, সূর্য,

গ্রহ-নক্ষত্র এবং সকল মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জ, মূলত অভিন্ন রাসায়নিক মৌলাবলীর সৃষ্টি।

কিন্তু মহাজাগতিক রাসায়নিক মৌলের 'যোজ্যতা' পার্থিব মৌল থেকে স্বতন্ত্র এবং এটিই বিস্ময়কর। মহাশূন্যে অক্সিজেন কিংবা সিলিকনের প্রাধান্য নেই, হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামই সেখানে সর্বেসর্বা। পর্যায়বৃত্ত সারণীর এই প্রথম মৌলদ্বয়ের পরিমাণ সেখানে সমবেত অন্যতর সকল মৌলের চেয়েও অনেক বেশি। অতএব, নাক্ষত্রিক রসায়নের বিস্ময়ক বৈষাদৃশ্য অনুমেয়: আমাদের ছায়াপথে হাইড্রোজেনই সবার রাজা।

তরঙ্গমালা ও পদার্থ

প্রকৃতির রাজ্যে বর্ণবৈচিত্র্য অশেষ। রাসায়নিক তথা অন্য সকলেই তা জানেন। বর্ণলহরীর আশ্চর্য শোভায় তাঁদের পক্ষে হতবুদ্ধি হওয়া মোটেই কোন দুর্লভ ঘটনা নয়।

'নিয়োডিমিয়াম নাইট্রেট দ্রবের রঙ কী?'

'রক্তাভ,' রাসায়নিক উত্তর দেন।

'ত্রিযোজী লৌহের দ্রবে পটাসিয়াম থিয়োসায়ানেট যোগ করলে রঙটি কেমন হবে?'

'লাল।'

'আর ফিনলপ্থেলিনে ক্ষার-দ্রব যোগ করলে?'

'কালচে লাল।'

রঙের এই তালিকার কোন শেষ নেই। বহুসংখ্যক রাসায়নিক বিক্রিয়াই নির্দিষ্ট বর্ণাভাযুক্ত। আমরা যদি আরও এক ডজন রাসায়নিক যৌগের নাম করি যাদের দ্রব রক্তাভ, তাতে রীতিমতো বিভ্রম সৃষ্টি হবে। বলা হয় শিল্পী ও কাপড় কলের রঙকারীরা দু'ডজনের মতো লাল রঙ সনাক্ত করতে পারেন। চোখ এভাবেই রঙ চিনতে শিখে!

কিন্তু বর্ণ ও বর্ণাভা চেনার এই 'স্বজ্ঞাত' পদ্ধতি রাসায়নে অচলপ্রায়। ঘনত্বের তারতম্যে একই দ্রবে অসংখ্য বর্ণাভার উদ্ভব সম্ভব। এতো রঙ কীভাবে মনে রাখা যাবে?

পৃথিবীতে এমন লোকও আছে বাঁধা চোখে শুধু আঙ্গুলে ছুঁয়েই তারা রঙ চিনতে পারে। ডাক্তারদের মতে এদের চার্ম-দৃষ্টি অত্যুচ্চ। বিখ্যাত লেখক জোনাথান

সুইফ্‌ট তাই ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন যে, লাপুটীয় বিজ্ঞান আকাদেমিতে অন্ধরা তাদের পাঠ্য 'বিজ্ঞান' বিষয়গুলি আয়ত্ত করার জন্য নানা ধরনের রঙ মেশাত।

এই বিখ্যাত ব্রিটিশ ব্যঙ্গ্য লেখকের বক্রোক্তিটি আজ আর যথার্থ নয়। আজ রাসায়নিকরা দ্রব না দেখেই তার রঙ বলতে পারেন। বর্ণালী-দীপ্তিমিতি নামক যন্ত্রের সাহায্যে তা এখন সম্ভব। বিশ্লেষণের এই বিশিষ্ট পদ্ধতির নাম বর্ণালী-দীপ্তিমাপক যন্ত্র থেকে নেওয়া। এর সাহায্যে রাসায়নিক যৌগ বা এর দ্রবের বর্ণবিশ্লেষণ সহজ।

আইজাক নিউটন প্রিজমে আলোকরশ্মি নিক্ষেপক্রমে সাদা আলোর যৌগিক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেন। আমরা প্রায় সকলেই রামধনু দেখেছি। রামধনুর সকল রঙই সাদা আলোর উপাদান। প্রিজমে সূর্যালোক ফেলে নিউটন এ ধরনের রামধনুই দেখেছিলেন। রামধনুই বর্ণালী।

কিন্তু আলো কী? আলো তড়িৎ-চুম্বকীয় কম্পন বা তরঙ্গ। প্রতিটি তরঙ্গই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যচিহ্নিত (সাধারণত এজন্য গ্রীক বর্ণ 'ল্যাম্বদা' ব্যবহৃত)। নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য যেকোন বর্ণ বা বর্ণাভার বিশেষ ধর্ম। যেমন রাসায়নিকদের ভাষায়: '৬২০ মিলিমাইক্রন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল রঙ' বা '৬৩৭ মিলিমাইক্রন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লাল রঙ'। (১ মিলিমাইক্রন $\frac{১}{১,০০০}$ মাইক্রন বা $\frac{১}{১০,০০,০০০}$ মিলিমিটার)। ফলত, 'কালচে লাল', 'লাল', 'সিঁদুরে লাল', 'টকটকে লাল' ইত্যাকার বর্ণাভার ব্যবহার অতঃপর নিষ্প্রয়োজন। এজন্য কেবল তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করলেই উল্লিখিত বর্ণ ও বর্ণাভা দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন। প্রতিটি যৌগই এখন 'ল্যাম্বদা সমান এত' এমন একটি 'শংসাপত্র' পেয়েছে এবং তা তার বর্ণসূচিতে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বাস করুন দলিলটি খুবই নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু যা বলা হয়েছে তা এর অর্ধেকমাত্র। শোষিত ও বিকীর্ণ রশ্মি আর এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপরই যৌগবিশেষের বর্ণ নির্ভরশীল। ধরা যাক কোন নিকেল লবণের দ্রব সবুজ রঙের, এর অর্থ এতে কেবলমাত্র সবুজের প্রতিষঙ্গী ছাড়া আর সকল তরঙ্গদৈর্ঘ্যই শোষিত। পটাসিয়াম ক্রোমাইট দ্রবের হলুদ রঙ কেবলমাত্র হলুদ রশ্মির পক্ষেই ভেদ্য।

বর্ণালী-দীপ্তিমাপক যন্ত্রে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি উৎপাদন করে বিভিন্ন পদার্থে তাদের শোষণমাত্রার পরিমাপ নির্ণয় সম্ভবপর। বহুসংখ্যক জৈব ও অজৈব পদার্থ বর্ণালী-দীপ্তিমাপক যন্ত্রে পরীক্ষিত হয়েছে।

দৃশ্যমান আলো ছাড়া অদৃশ্য আলোও রয়েছে যা মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। দৃশ্যমান বর্ণালীর 'পরপারের' এই আলো অতিবেগুনী ও অবলোহিত নামে

চিহ্নিত। রাসায়নিকরা এদের ব্যবহারেও পারদর্শী। তাঁরা অতিবেগুনী ও অবলোহিত রশ্মিতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের বর্ণালী গ্রহণ করেন ও একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রক্রিয়ার সন্ধান পান। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, বর্ণালীতে প্রতিটি রাসায়নিক যৌগেরই (বা আয়নের) নিজস্ব বন্ধনী রয়েছে। প্রতিটি পদার্থই স্বীয় 'বর্ণ-শংসাপত্রধারী' (অবলোহিত অথবা অতিবেগুনী)।

কেবল গুণীয় বিশ্লেষণের জন্যই নয়, বিশোষণ-বর্ণালী মাত্রিক বিশ্লেষণেও ব্যবহার্য। এবং তা এজন্যই সম্ভব যেহেতু রাসায়নিক যৌগের ঘনত্বের উপরই অনেক ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ তথা দ্রবের বর্ণের গাঢ়ত্ব নির্ভরশীল। সুতরাং, কোন দ্রবের আলোক শোষণমাত্রা (কেউ কেউ 'আলোক ঘনত্বও' বলেন) নির্ণয় করে এতে নির্দিষ্ট মৌলের পরিমাণ নির্ণয় খুবই সহজ।

কেবল এক ফোঁটা পারদেই...

সুপ্রাচীন প্রবচন: 'প্রতিভার সকল অপূর্ব সৃষ্টিই সরল'।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের জন্য শুধু একবারই নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। ১৯২২ সালে প্রখ্যাত চেক বিজ্ঞানী ইয়ারোস্লাভ হেরোভ্স্কি এই আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন। আর তখন প্রাগ রাসায়নিকদের মক্কা হয়ে উঠেছিল। সবাই সেখানে তীর্থযাত্রা শুরু করলেন। উদ্দেশ্য: হেরোভ্স্কির নতুন পদ্ধতি পোলারোগ্রাফি শিক্ষা।

এখন পোলারোগ্রাফিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রতি বছর সহস্রাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

পদ্ধতিটির অ-আ, ক-খ এরূপ: কোন দ্রবে পদার্থবিশেষের ঘনত্ব জানার জন্য একটি পাত্রে সেই দ্রব নিয়ে তার তলায় পারদ রাখা হয়। পারদের আস্তর এখানে একটি তড়িদ্দ্বারের স্থলবর্তী। একটি কৈশিক নলিকা থেকে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পাত্রের উপর পতিত ফোঁটা ফোঁটা পারদ অন্য তড়িদ্দ্বারের কাজ করে।

তড়িদ্দ্বার দু'টিকে অতঃপর বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। এতে দ্রবের তড়িদ্বিশ্লেষ শুরু হবার কথা। কিন্তু দেখা যায়, তড়িদ্বিশ্লেষ পারদবিন্দুর পর্যাপ্ত

বিভবের উপর নির্ভরশীল। স্বল্পবিভবে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দ্রবের আয়নগুলির বিমুক্তি শুরু হয়। অতঃপর বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

দ্রবে বিভিন্ন মৌলের আয়ন থাকলে, নিজস্ব বিভবমাত্রানুসারেই প্রতি জাতের আয়নের বিমুক্তি ঘটে।

রাসায়নিক বিভবমাত্রাকে ভুজাক্ষে এবং বিদ্যুৎকে কোটিতে রেখে গ্রাফ আঁকেন। এর লব্ধ রেখাটি সিঁড়িসদৃশ, প্রতি ধাপ এক এক জাতের বিমুক্ত আয়নের প্রতিষঙ্গীস্বরূপ।

দ্রববিশেষে জ্ঞাত পদার্থের জ্ঞাত ঘনত্বের নিরিখে ইতিপূর্বে তৈরি প্রামাণ্য রেখার সঙ্গে অতঃপর লব্ধ সিঁড়ি-রেখাটি তুলনা করা হয়।

এভাবে একটি দ্রবের একই সঙ্গে মাত্রিক ও গুণীয় বিশ্লেষণ সম্ভব। বিশেষ পদ্ধতি মাধ্যমে বিশ্লেষণটিকে স্বয়ংক্রিয় করা যায়।

পোলারোগ্রাফির প্রশংসায় প্রথমেই 'চমৎকার' বিশেষণটি মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু চমকই এর সবকিছু নয়। পোলারোগ্রাফিক পদ্ধতি সরল, যথাযথ এবং দ্রুত কার্যকরী। তা ছাড়া গুণগত উৎকর্ষতায়ও এটি প্রচলিত সকল বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সেরা। দস্তার কথাই ধরা যাক। এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ দস্তাকে ক্লোরাইডের এক সি-সি দ্রব থেকেও পোলারোগ্রাফিমাধ্যমে সনাক্ত করা সম্ভব। আর এতে সময় লাগে দশ মিনিটেরও কম।

হেরোভ্‌স্কির মূল ধারণাটি এখন সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং এর বিবিধ প্রকারভেদও উদ্ভাবিত হয়েছে। বিশোষণ পোলারোগ্রাফিক বিশ্লেষণ এর অন্যতম এবং পদ্ধতিটি অতি সংবেদী। এর মাধ্যমে প্রতি সি-সি দ্রবে এক গ্রামের শত কোটিভাগের এক ভাগ পরিমাণ জৈব পদার্থের অস্তিত্ব সনাক্তকরণও সম্ভব।

পোলারোগ্রাফি কোথায় ব্যবহৃত? কেন, প্রায় সর্বত্রই: স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে, খনিজ ও মিশ্রধাতু বিশ্লেষণে। পোলারোগ্রাফির সাহায্যে জীবদেহে ভিটামিন, হোর্মোন ও বিষের উপাদান নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসকরা ক্যানসারের পূর্বাহ্ন সনাক্তীকরণেও পোলারোগ্রাফি ব্যবহারের কথা ভাবছেন।

রাসায়নিক প্রিজম

এই বিজ্ঞানীর নাম ও পেশা তাঁর আবিষ্কারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

তিনি উদ্ভিদবিদ, নাম মিখাইল স্‌ভেত।

তিনি ক্লোরোফিল সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে, ক্লোরোফিল পাতার সবুজ বর্ণকণিকা।

কিন্তু অধ্যাপক স্‌ভেত বিবিধ রাসায়নিক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে এমন পদার্থ বিশোষক সম্পর্কে জানতেন যা উপরিতলে বহু গ্যাস ও তরল বিশোষণে সক্ষম।

তিনি সবুজ পাতার মণ্ড তৈরি করে তা অ্যালকোহলে মেশালেন। মণ্ড বর্ণহীন হল। এর অর্থ মণ্ডের সকল বর্ণকণিকা আলকোহলে নিষ্কাশিত হয়েছে।

তারপর স্বল্প বেঞ্জিনে ভেজান খড়িমাটি দিয়ে একটি কাচের নল ভরাট করে তিনি এতে গলানো ক্লরোফিল ঢাললেন।

খড়িমাটির উপরের স্তর সবুজ হয়ে উঠল।

বিজ্ঞানী এই নল ফোঁটা ফোঁটা বেঞ্জিন দিয়ে ধুতে শুরু করলেন। সবুজ অঙ্গুরি নড়ে উঠে শেষে নিচে নামতে শুরু করল। এবং তার পর, কী আশ্চর্য! এটি কয়েকটি রঙিন ডোরায় পৃথকীভূত হল। দেখা গেল, হলুদ-সবুজ, সবুজ-নীল এবং তারপর বিভিন্ন আভার কয়েকটি হলুদ ডোরা। বিজ্ঞানী স্‌ভেত এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলেন। আর দৃশ্যটি রাসায়নিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার হিসেবে প্রকটিত হল।

ক্লোরোফিল যে, কয়েকটি যৌগের মিশ্রণ এবং এর উপাদানগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ হলেও আণবিক সংযুতি ও ধর্মে যে স্বতন্ত্র তা প্রমাণিত হল। যাকে এখন ক্লরোফিল বলা হয় সে তার অন্যতম মাত্র, যদিও গুরুত্বে সে সবার সেরা। এই উপাদানগুলিকে অতঃপর অতি সহজ পদ্ধতিতে পরস্পর থেকে আলাদা করা হল।

এরা সকলেই খড়িমাটিতে আটকা পড়েছিল, অবশ্য প্রত্যেকেই নিজস্ব পদ্ধতিতে। খড়িমাটি গুঁড়ার উপরিতলের শক্তির বিভিন্নতার নিরিখেই এতে বিভিন্ন উপাদান বিধৃত ছিল। নলে ঢালা বেঞ্জিনে (ধৌতকারী) এই উপাদানগুলি তাদের নির্দিষ্ট ক্রমন্বিত পর্যায়েই বাহিত হয়েছিল। যেগুলো আলতোভাবে আটকে ছিল তারাই প্রথমে এবং অতঃপর সংসক্তির মাত্রানুসারে অন্যরা। তাই পৃথকীভবন ঘটেছিল।

প্রিজম যেমন সূর্যালোককে বর্ণালীতে বিশ্লিষ্ট করে তেমনি শোষক স্তম্ভটিও ('রাসায়নিক প্রিজম') এখানে একটি জটিল মিশ্রণকে স্বীয় বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করেছে। স্ভেত ১৯০৩ সালে আবিষ্কৃত তাঁর এই নতুন বিশ্লেষণ-পদ্ধতির নামকরণ করলেন: বর্ণচিত্রণ (ক্রমেটোগ্রাফি)। পরিভাষাটি গ্রীক শব্দার্থ 'বর্ণলেখ'-উদ্ভূত।

বর্তমানে এই রাসায়নিক বিশ্লেষণের 'বর্ণলেখ' পদ্ধতি দুনিয়াজোড়া সকল বিশ্লেষ-পরীক্ষাগারের একটি প্রধান হাতিয়ার।

বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভবিতব্যই দুর্জ্ঞেয়। এদের অনেকগুলিই আবিষ্কারের পর বিস্মৃতির অতলে দ্রুত বিলীন হয় এবং শেষে পুনরাবিষ্কৃত হয়ে বিজ্ঞানাকাশে উজ্জ্বলতম তারকার অক্ষয় দীপ্তি লাভ করে। ক্রমেটোগ্রাফির ভাগ্যেও তাই ঘটেছিল। চল্লিশ দশকেই তা পুনঃস্মরিত হয়েছিল এবং সেজন্য দুঃখ প্রকাশের কোন অবকাশ ছিল না।

প্রোমেথিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী

সঠিকভাবে বললে ৬১ পারমাণবিক সংখ্যার এই মৌলটি বহুবারই আবিষ্কৃত হয়েছে, আর প্রতিবারই তার আলাদা আলাদা নাম জুটেছে: ইলিনিয়াম, ফ্লোরেনিয়াম, সাইক্লোনিয়াম। কিন্তু এর কোনটিই সত্যায়িত হয় নি। এই মৃতজাতদের নামগুলি এখন শুধু ইতিহাসেই আছে।

তারপর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করলেন যে, ৬১ নং মৌল বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। প্রকৃতির কোন খেয়ালের বশে পর্যায়বৃত্ত সারণী মৌলটির কোন প্রতিনিধি ধারণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। এর কারণ ৬১ নং মৌলের সকল আইসোটোপই তেজস্ক্রিয়, অতি অস্থায়ী। অনেক আগেই তারা প্রতিবেশী মৌলের আইসোটোপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

শেষে ১৯৪৫ সালে, পারমাণবিক রিয়েক্টর চালনাকালে মৌলটি কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত হয়। ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস — রিয়েক্টরের 'জ্বালানি' বিভাজনে নিউক্লিয়াসের বহুসংখ্যক খণ্ডাংশ থেকে জন্মাত লঘুভার মৌলের নিউক্লিয়াস। প্রোমেথিয়াম ছিল এদেরই একটি (ছলনাকারী মৌলের এটিই সঠিক নাম)।

বহুক্ষণ চিন্তা করে তত্ত্বীয় পদার্থবিদরা রিপোর্টটিতে সায় দিলেন। কিন্তু

রাসায়নিকরা সহজে ভুলার পাত্র নন। তাঁরা প্রোমেথিয়ামকে নিজ হাতে বারেক 'ছুঁতে' আর সামান্য হলেও নবজাত মৌল অথবা তার কোন যৌগকে এক নজর দেখতে চান।

কিন্তু বিধ্বস্ত ইউরেনিয়ামের এই খণ্ডাংশের মিশ্রণ থেকে ৬১ নং মৌলের অতি সামান্য পরিমাণও (এক গ্রামের শত বা হাজার ভাগের একভাগ) পৃথকীকরণ সহজ ছিল না।

খুব সামান্য? না, রাসায়নিকরা ইতিপূর্বে এর চেয়েও অনেক কম পরিমাণ পদার্থ নিয়েও কাজ করেছেন, সফল হয়েছেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে জটিলতার প্রকৃতি অন্যতর ছিল। প্রোমেথিয়াম বিরলমৃত্তিক মৌলের অন্তর্গত এবং ইতিপূর্বে এই পরিবারের সাদৃশ্যের কথা আমরা বলেছি। সুতরাং, নিউক্লীয় খণ্ডাংশের মিশ্রণে প্রোমেথিয়ামের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী — নিয়োডিমিয়াম এবং স্যামেরিয়ামও প্রচুর পরিমাণে থাকত।

প্রথমত, এদের মধ্য থেকে প্রোমেথিয়ামকে আলাদা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ নয়! আজীবন বিরলমৃত্তিকায় গবেষণানিবিষ্ট বিজ্ঞানীরা সত্যিকার বৈজ্ঞানিক বাহাদুরি দেখালেন। অভিজ্ঞতাটি যন্ত্রণাকর। এর অন্যতর অভিব্যক্তি আমার জানা নেই। একে একে চৌদ্দটি যমজকে পৃথক ও এদের প্রত্যেককে সংগ্রহ করা মুখের কথা নয়।

(ফরাসী রসায়নিক শ. উরবেইন বিশুদ্ধ থুলিয়াম তৈরির চেষ্টা করেন ও সফল হন। এতে সময় লেগেছিল পাঁচ বছর আর অনুষ্ঠিত রাসায়নিক পরীক্ষার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পনেরো হাজারের বেশি। পরীক্ষাগুলি ছিল একঘেয়ে তথা অসম্ভব ক্লান্তিকর।)

অবশ্য, বিশুদ্ধ প্রোমেথিয়াম পৃথকীকরণ তুলনামূলকভাবে সহজতর ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মৌলটি তেজস্ক্রিয় এবং দ্রুত ক্ষীয়মাণ। সুতরাং, আলাদা করার পরপরই মৌলটির পক্ষে পুরোপুরি উধাও হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

তাই, ল্যান্থেনাইডদের পৃথকীকরণের দ্রুততর পদ্ধতির উদ্ভাবন অপরিহার্য ছিল, যাতে বছর, মাস এমন কি সপ্তাহও ব্যয়িত না হয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এখানে কার্যসিদ্ধি প্রয়োজন। অথচ এমন কোন পদ্ধতিই রসায়নে জানা ছিল না।

আর তখনই মনে পড়ল ক্রমেটোগ্রাফির কথা।

স্ভেত-এর পৃথকীকরণ নলিকা (বর্তমানে এর ভারিক্কি নাম 'ক্রমেটোগ্রাফিক

কলাম') শোষক পদার্থে (আগের মতো খড়িমাটি নয়, আয়ন-বিনিময়কারী বিশেষ ধরনের রজন) পূর্ণ করা হয়। বিরলমৃত্তিক মৌলজাত লবণের একটি দ্রবকে রজনের স্তর অতিক্রম করানো গেল। নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কিন্তু ল্যান্থেনাইডগুলি সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। তারা প্রত্যেকে রজনের সঙ্গে এক-একটি জটিল যৌগ তৈরি করল।

মৌলগুলির স্থায়িত্বকাল পরস্পরভিন্ন এবং এগুলি ক্রমবিন্যস্ত। গোত্রের প্রথমতম ল্যান্থেনামই দৃঢ়তম যৌগের উৎপাদক, আর শেষতম লুটিসিয়াম-এর যৌগটিই দুর্বলতম।

তারপর রজনকে বিশেষ দ্রবে ধৌত করা হয়। দ্রবের প্রতিটি বিন্দু রজনকণাকে বেষ্টনক্রমে বিরলমৃত্তিকায় মৌলাবলীর আয়নকে পূর্বতন বিন্যাস অনুসারে বিধৌত করে।

স্তম্ভ থেকে বিশুদ্ধ বিরলমৃত্তিক মৌল লবণের দ্রব ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে: প্রথমে, লুটিসিয়াম লবণ এবং শেষে, ল্যান্থেনাম লবণ।

এই পদ্ধতি অনুসারেই মার্কিন বিজ্ঞানী জ. মারিন্স্কি, ল. গ্লেনডেনিন ও স. কোরিয়েল নিয়োডিমিয়াম ও স্যামেরিয়াম থেকে প্রোমেথিয়াম আলাদা করেছিলেন। এজন্য সময় লেগেছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

বুনো স্ট্রবেরির গন্ধ

...পাইন বনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। জুলাই মাসের কোন উত্তপ্ত দিন। অজস্র উচ্ছ্রিত স্ট্রবেরি, পাকা, অমসৃণ, টকটকে লাল, কী সুস্বাদ, মুখে গলে গলে যাচ্ছে।

কিন্তু স্ট্রবেরি-গন্ধের উৎস কী? নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন, এ নিয়ে কখনও ভাবেন নি। পাইন বনের গন্ধ, সূর্যালোকিত বনতলের সুবাসেই তুষ্ট ছিলেন।

গন্ধ-প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। এ সম্পর্কে পুরো একটি বিজ্ঞানই গড়ে উঠেছে। কেন পদার্থবিশেষ উগ্রগন্ধী এবং অন্যরা নির্গন্ধ, কেউ সুগন্ধী, কেউ-বা দুর্গন্ধী কেন, এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজও অভিন্নমত নন। বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

পদার্থবিশেষের গন্ধ সন্দেহাতীতভাবে তার অণু-সংযুতির সঙ্গেই অন্বিত।

কিন্তু কীভাবে? ঠিক এ সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিত নই। গন্ধের নির্দিষ্ট ভৌত তত্ত্ব আজও উপস্থাপিত হয় নি।

অবশ্য রাসায়নিকরা বিষয়টি নিয়ে এত উতলা নন। বিভিন্ন গন্ধের জন্য 'দায়ী' অণুকে তাঁরা নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করে থাকেন। জিজ্ঞেস করুন, স্ট্রবেরি-গন্ধের কারণ, তাঁরা আপনাকে ঠিক বলে দেবেন।

স্ট্রবেরি-গন্ধ ছিয়ানব্বুইটি গন্ধের এক জটিল মিশ্রণ এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্যের মাত্রা দূরবিস্তৃত। প্রকৃতিজাত এই আশ্চর্য 'স্ট্রবেরি' সুরভির জন্য শ্রেষ্ঠতম সুগন্ধি প্রস্তুতকারকও প্রকৃতির প্রতি ঈর্ষিত।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের পক্ষে 'স্ট্রবেরি' সুরভির 'ব্যবচ্ছেদ' কীভাবে সম্ভব হল?

তরল-গ্যাসীয় ক্রমেটোগ্রাফির সাহায্যে।

এখানে বিশোষক হিসেবে অনুদ্বায়ী তরলসিঞ্চিত সিলিকন ডাইঅক্সাইড, SiO_2, বিশেষ অনুকূল। আর সচল মাধ্যম এখানে বর-গ্যাসবর্গের অন্যতম — আর্গন। এবং এই সব।

পক্ষান্তরে, একটি কাচের নলকে কেবল অনুদ্বায়ী তরলে ভেজানোই যথেষ্ট। আর নলটি যথেষ্ট লম্বা হওয়াও দরকার। তাজা স্ট্রবেরির পুরো গন্ধ 'ধরতে' গবেষকরা যে-নল ব্যবহার করেন তা ১২০ মিটার দীর্ঘ।

অবশ্য, নলটি কুণ্ডলিত এবং থার্মোস্টাট নামক একটি বিশেষ যন্ত্রে স্থাপিত। এই শেষোক্ত যন্ত্রটির সাহায্যে ধীরে ও সমভাবে তাপমাত্রা বাড়ান যায়। স্ট্রবেরি-গন্ধগুলির উদ্বায়িতার পার্থক্যের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাটি অপরিহার্য। এদের কোনটির উদ্বায়িতা ক্ষিপ্র, কোনটি বা মন্থর। উপাদানগুলি নলে সুনির্দিষ্টভাবে ক্রমবিন্যস্ত থাকে। তারপর নলে আর্গন চালিয়ে তাদের টেনে বের করা হয়। নলমুখে স্থাপিত একটি জটিল যন্ত্রে নির্গত উপাদানগুলি ধরা পড়ে। দেখা গেছে স্ট্রবেরির গন্ধকণিকার সংখ্যা ৯৬, অথচ তাদের মোট ওজন $১০^{-১২}$ গ্রাম মাত্র!

এই পদ্ধতিতে রাসায়নিকরা অত্যন্ত জটিল অনেকগুলি প্রাকৃতিক পদার্থ পরীক্ষা করেছেন। বলুন তো, পেট্রোলিয়ামের উপাদান ক'টি? দু'শ ত্রিশের কম নয়! আর শুধু সংখ্যা গনাই নয়, তাদের প্রত্যেকটিই এখন সনাক্তীকৃত।

নেপোলিয়নের মৃত্যু:
জনশ্রুতি ও বাস্তবতা

সরকারী বক্তব্যানুসারে ১ম নেপোলিয়ন বোনাপার্ত ১৮২১ সালের ৫ই মে সেণ্ট হেলেন দ্বীপে মারা যান। রোগ — পাকস্থলীর ক্যানসার এবং এরই প্রকোপে অর্ধবছরেরও কম সময়ে অর্ধপৃথিবীর প্রাক্তন অবিশ্বরের জীবনান্ত ঘটল। আশুমৃতপরীক্ষকের বিবৃতিতে সই করেছিলেন ডাঃ আন্তমার্কি।

বক্তব্যটি সুপ্রতিষ্ঠ হলেও অতি অল্প লোকই তা বিশ্বাস করত এবং তা নেহাৎ অকারণে নয়।

সম্রাটের বহু অনুগামীই জীবনের শেষদিন অবধি দৃঢ় মত ব্যক্ত করে গেছেন যে, নেপোলিয়নের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে ঘটে নি, তাঁকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল।

আর মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে উইল লিখানোর সময় বোনাপার্ত নিজে বলেছিলেন: 'ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্র এবং তাদের গুপ্তঘাতকদের হাতেই আমি নিহত হচ্ছি।'

কিন্তু নেপোলিয়নকে কী ধরনের বিষ দেয়া হয়েছিল? গত শতকে জ্ঞাত বিষের সংখ্যা কিছু কম ছিল না। কিন্তু অজ্ঞাত হত্যাকারীটি এর কোনটিই সম্রাটের উপর প্রয়োগ করে নি।

শিকারটিকে নিঃসন্দেহ রাখার জন্য এখানে প্রয়োজন ছিল এমন একটি স্বাদহীন দুর্বল বিষের যা দেহে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় ও মৃত্যু ঘটায়। আর্সেনিক এ ধরনেরই বিষ।

তাই অন্যতর একটি বক্তব্যও শোনা যায়: বোনাপার্তকে আর্সেনিক দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু এর প্রমাণ? সন্দেহ নেই, তা নিয়ে হরেক রকম অনুমানই সম্ভব। কিন্তু আসলে প্রয়োজন অকাট্য প্রমাণের। অথচ কোন সাক্ষীই নেই। কবর খুঁড়ে সম্রাটের দেহাবশেষ পরীক্ষাও আচারবিরুদ্ধ ব্যাপার।

তাসত্ত্বেও ১৪০ বছর পর স্কটল্যান্ডের গ্লাস্‌গো শহরে নেপোলিয়নের অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে একটি অদ্ভুত তদন্ত শুরু হয়। এর পরিচালক ছিলেন দুজন চিকিৎসক — ডাঃ স্মিথ ও ডাঃ ফাস্‌র্ফ্‌উড।

তাঁরা পৃথিবীর নামকরা সব জাদুঘরে একটি অদ্ভুত আবেদন পাঠালেন। তাঁদের জিজ্ঞাস্য: কোন সংগ্রহে... এই প্রখ্যাত ফারাসী সম্রাটের এক গুচ্ছ চুল আছে কি না? ভাগ্য প্রসন্ন হবার আগে বহু বছর কেটে গেল। শেষে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে কাটা সম্রাটের কয়েকটি চুল তাঁদের হস্তগত হল।

মানুষ আর্সেনিক খেলে বিষটি যে চুলে ক্রমাগত সঞ্চিত হয়, চিকিৎসক দুজন তা জানতেন। যদি তা বোনাপার্তের চুলে খুঁজে পাওয়া যায়!..

কিন্তু কথার চেয়ে কাজ অনেক কঠিন। এভাবে অতি অল্প আর্সেনিকই চুলে সঞ্চিত থাকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ এখানে প্রযোজ্য হলেও দোষত্রুটি কাটিয়ে সঠিক ফলাফল লাভের পক্ষে তা মোটেই তেমন সুবেদী নয়। নির্বিশেষ শুদ্ধতা এখানে অপরিহার্য।

শেষে, সুইডিশ পদার্থবিদ ওয়াসেন তদন্তে যোগ দিলেন।

মহামূল্য চুলগুলি একটি অ্যালুমিনিয়াম মোড়কে ঢেকে কিছুক্ষণ ইউরেনিয়াম রিয়েক্টরে রাখা হল।

অতঃপর, বিশেষ ব্যবস্থানুযায়ী উদ্ধার করা চুলগুলি পরীক্ষিত হলে দেখা গেল সত্যিই আর্সেনিক প্রয়োগে নেপোলিয়নকে খুন করা হয়েছিল। তাঁর চুলে আর্সেনিকের পরিমাণ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে তের গুণ বেশি। তা ছাড়া আর্সেনিক তাঁর উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল ক্রমাগত এবং অল্প মাত্রায়।

কীভাবে বিজ্ঞানীরা নেপোলিয়নের মৃত্যুরহস্যটি সঠিকভাবে উদ্ধার করলেন? কোন রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যতিরেকেই কেমন করে আর্সেনিক সনাক্ত হল?

As
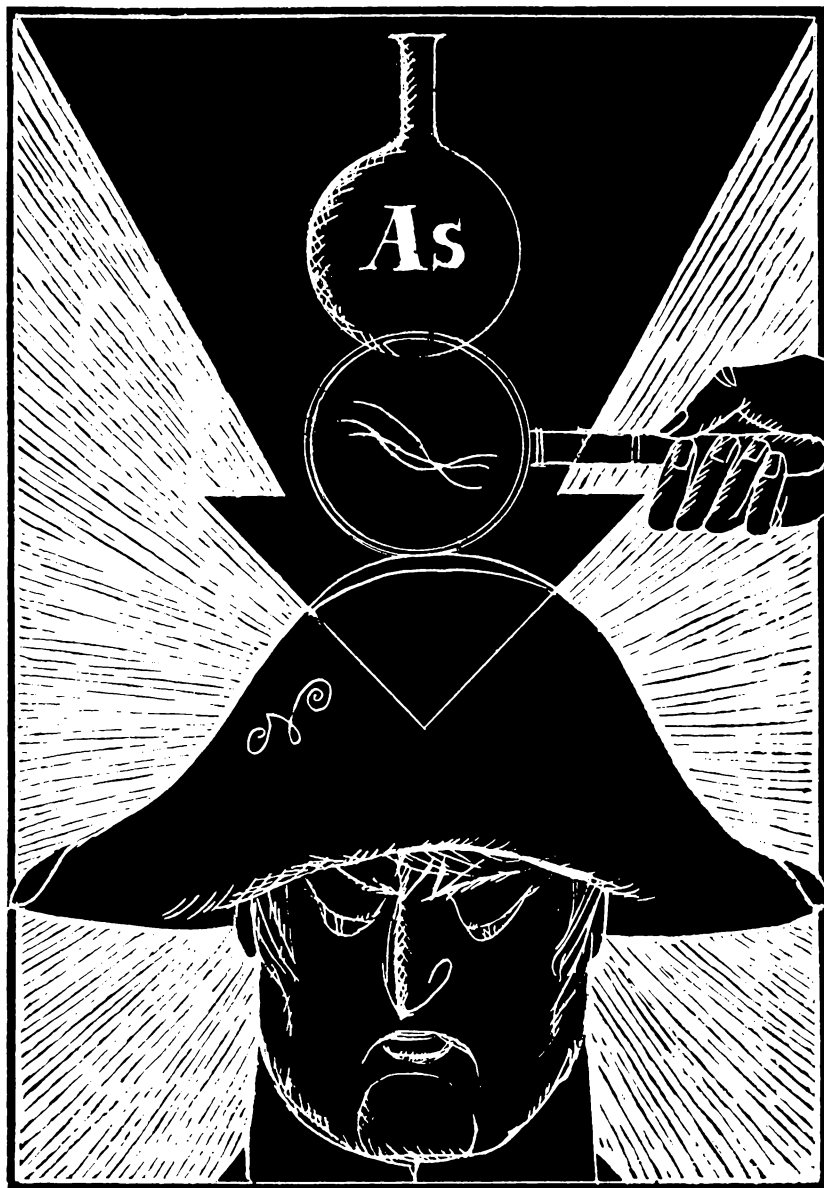
বিকারক বিশ্লেষণ

প্রাকৃতিক আর্সেনিক অত্যন্ত সুস্থিত মৌল। এতে কোন বিজ্ঞানীই তেজস্ক্রিয়তার কণামাত্রও খুঁজে পান নি।

আর্সেনিকের অন্যতর একটি উদ্ভট বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। একে 'নিঃসঙ্গ' বলাই সঙ্গত। কারণ, অন্য সকল মৌলই দুই, তিন অথবা ততোধিক আইসোটোপের মিশ্রণ। যেমন টিনের কথাই ধরা যাক। তার দশ-দশটি পরমাণুবিন্যাস আছে এবং সবক'টিই প্রকৃতিতে লভ্য।

কিন্তু আর্সেনিক একেবারেই একা। তার নিউক্লিয়াসটি ৩৩ প্রোটন আর ৪২ নিউট্রনে তৈরি আর এই সমাবন্ধন অতীব সুস্থিত।

কিন্তু তার নিউক্লিয়াসে কোনক্রমে একটি বাড়তি নিউট্রন ঢুকালেই সকল সুস্থিতির সমাপ্তি। তখনই আর্সেনিকের অন্য একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ জন্মে, যা রাসায়নিক পদ্ধতি ছাড়াই সনাক্ত করা যায়। আর তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক বিশেষ একটি যন্ত্রই এজন্য যথেষ্ট। সক্রিয় আর্সেনিকের পরিমাণ যত বেশি হবে, বিকিরণের তীব্রতাও সে অনুপাতেই বৃদ্ধি পাবে।

এ-ই বিকারক বিশ্লেষণের মৌল নীতি: সরল কিন্তু সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর সাহায্যে সামান্যতম পদার্থ, এমন কি দশমিক বিন্দুর পর ১০ বা ১২ শূন্যযুক্ত এক গ্রামের ভগ্নাংশ অবধিও সনাক্ত করা সম্ভব। পরীক্ষণীয় পদার্থকে এজন্য নিউট্রন-জ্যোতিরেখায় তেজাহত করাই যথেষ্ট। অতঃপর, উৎপন্ন আইসোটোপের বিকিরণ-তীব্রতা মাপলেই কার্যোদ্ধার।

ঐতিহাসিকরা এভাবেই নেপোলিয়নের মৃত্যুরহস্যের যবনিকা উন্মোচিত করেছিলেন। যথার্থ বিজ্ঞানসমূহের সহায়তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত, তাই না?

আধুনিক বিশ্লেষকদের কাছে বিকারক বিশ্লেষণ এক সর্বদর্শী অক্ষিবিশেষ। অন্য বিশ্লেষণের অসাধ্যপ্রায় সমস্যাবলী তার পক্ষে অতি সহজসাধ্য।

বিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম সাধারণত চমৎকার অর্ধপরিবাহী। কিন্তু এতে অণুমাত্র ভেজাল থাকলেই বিপদ। অ্যান্টিমনির কথাই ধরা যাক। যদি কোটি কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুতে একটিমাত্রও অ্যান্টিমনি পরমাণু থাকে, তাহলেই এর অর্ধপরিবাহিতার সমাপ্তি ঘটে।

তাই, জার্মেনিয়ামের ভেজাল নির্ণয়ে আত্যন্তিক সতর্কতা অপরিহার্য, আর তা কেবল বিকারক বিশ্লেষণের পক্ষেই সম্ভব।

এবং জার্মেনিয়ামের পাতে নিউট্রন বর্ষিত হল। রাসায়নিকরা জানেন এতে কিছু অ্যাণ্টিমনি থাকা সম্ভব। হয়ত, পরিমাণটি খুবই সামান্য ও পরিহার্য কিংবা অনেক এবং তা 'বিশুদ্ধ' ধাতুটিকে অব্যবহার্য করার পক্ষে যথেষ্ট।

নিউট্রন সম্পর্কে জার্মেনিয়াম ও অ্যাণ্টিমনির বিক্রিয়া-প্রকৃতি ভিন্ন। নিরাসক্তি বিধায় প্রথমটি নিউট্রনকে বিন্দুমাত্রও প্রতিহত করে না। কিন্তু দ্বিতীয়টি তাকে গিলে খায় গোগ্রাসে। ফলত, কেবলমাত্র অ্যাণ্টিমনিরই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন হয়। বাকী সবই বিকিরণমাপক যন্ত্রের হাতে। অতঃপর, জার্মেনিয়ামে অ্যাণ্টিমনির পরিমাণ কম না বেশি তা বলা সহজ।

ওজনহীনের ওজন

৫00 মাইক্রোগ্রাম কি যথেষ্ট? দেখাই যাক। এক মাইক্রোগ্রাম এক মিলিগ্রামের হাজার ভাগ, আর এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ। সুতরাং, ৫00 মাইক্রোগ্রাম — এক গ্রামের ২ হাজার ভাগের একভাগ — অর্থাৎ অর্ধেক মিলিগ্রাম। যদি জল নেওয়া হয়, তবে ৫00 মাইক্রোগ্রাম এক ঘন মিলিলিটারের অর্ধেক তথা আলপিনের মাথার ঘনমানের এক-তৃতীয়াংশ হবে। কিন্তু যদি পদার্থটি দশগুণ বেশি ভারি হয়? তাহলে এর ঘনমান দশগুণ কম হবে। এমন কোন পদার্থ দেখতে পাওয়াই তো কঠিন। একে নিয়ে কী করা যাবে? কী আর করা, অণুবীক্ষণে পরীক্ষা ছাড়া নান্য পন্থা।

তবু, ১৯৪২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীদের হাতে কেবলমাত্র ২0 মাইক্রোগ্রাম প্লুটোনিয়ামই ছিল, অর্থাৎ ৫00 মাইক্রোগ্রাম পরিমাণের ২৫ ভাগের কম, এর এক কণাও বেশি নয়। তবু সত্যিকার পরিমাপ-অসাধ্য এই পদার্থটুকুতেই তাঁরা এর মৌল ধর্মাবলী খুঁজে পান। তা ছাড়া তাঁরা একে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই পরীক্ষা করেছিলেন যে, এক বছর পরই এক বিরাট প্লুটোনিয়াম কারখানা নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু সবরকম রাসায়নিক পরীক্ষায়ই রাসায়নিককে বারবার ওজন করতে হয়...

কিন্তু তৌলে এমন কী জটিলতা থাকা সম্ভব? তৌল তো তৌলই। এমন কি যে-বিশ্লেষণী পরাণুতৌলে মিলিগ্রামের শতাংশও ওজন করা হয়, তার গড়নও যথেষ্ট সরল। কিন্তু এমন যাথার্থ্যে তুষ্ট হবার দিন বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই পার হয়েছেন।

তাই, এ শতকের শুরুতেই এমন এক তৌল তৈরি হল, যা দিয়ে মিলিগ্রামের ১০ হাজার ভাগের একভাগও ওজন করা যায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়ম র‍্যাম্‌জে ০·১৬ সি-সি র‍্যাডন মাপতে এমন একটি তৌলই ব্যবহার করেছিলেন এবং এভাবে তিনি রাদারফোর্ডের রেডিয়ামের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের কর্ম-প্রকরণ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রমাণ করেন।

কিন্তু, এমন কি এই তৌলও যথেষ্ট বিবেচিত হল না। কিছুদিন পরই সুইডিশ রাসায়নিক হানস্‌ প্যাটারসন একটি তৌল তৈরি করলেন যা দিয়ে মাইক্রোগ্রামের ১০ হাজার ভাগের ছয়ভাগ অর্থাৎ ৬×১০^{১০} গ্রামও ওজন করা যায়! এই সূক্ষ্মতা কল্পনাতীত। আধুনিক পরাণুতৌলের সূক্ষ্মতা এমন যে তা দিয়ে কোন কিছুর ২০ লক্ষ ভাগের একভাগও ওজন করা সম্ভব।

পরাণুবিশ্লেষণ একটি নতুন বিজ্ঞানশাখা। অতি সূক্ষ্ম ওজন, ওজনহীনের ওজন পরিমাপই এর সাফল্য। তা ছাড়া গর্ব করার মতো এর অন্যতর সাফল্যও কিছু কম নয়।

বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার এমন সব পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে অত্যল্প পদার্থ থেকে শুরু করে ১০ হাজার মিলিলিটারের (সি-সি) একাংশ নিয়েও কাজ করা সম্ভব, যে-সূক্ষ্মতা ক্ষেত্রবিশেষে এক মাইক্রোলিটারের প্রায় ১০ হাজার ভাগের একভাগ (১×১০^{-১০} লিটার)।

কেবল জীববিদ্যা ও জৈব রসায়নের গবেষণায়ই নয়, পরাণুবিশ্লেষণ কৃত্রিম ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলের পরীক্ষায়ও সবিশেষ ব্যবহার্য।

একক পরমাণুর রসায়ন

এককালে মিলিগ্রাম পরিমিত নতুন মৌলের গুণাগুণ নির্ধারণে ব্যর্থ রাসায়নিকের পক্ষে বিলাপ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তারপর 'মাত্রিক সামান্যতার মান' একাধিকবার পুনর্বিবেচিত হয়েছে। ১৯৩৭ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী পেরিয়ে ও সেগ্রে কৃত্রিমভাবে সবেমাত্র পাওয়া ৪৩ নং মৌল টেক্নেসিয়ামের গুণাগুণ যথাযথভাবেই নির্ধারণ করেছিলেন, যদিও তাদের হাতে মেন্দেলেয়েভ সারণীর এই নতুন প্রতিনিধিটির পরিমাণ ছিল মাত্র এক গ্রামের এক হাজার কোটিভাগের একভাগ।

তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্যদের সহায়ক হয়েছিল। ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌল নিয়ে পরীক্ষাকালে রাসায়নিকদের গ্রাম, মিলিগ্রাম এমন কি মাইক্রোগ্রাম জাতীয় ওজন-এককগুলিকে বেমালুম ভুলে যেতে হয়। ট্রান্সইউরেনিয়াম গবেষণা-নিবন্ধের পৃষ্ঠাগুলি 'ওজনহীন, অদৃশ্য পরিমাণ' ইত্যাদি শব্দাবলীতে কণ্টকিত। পর্যায়বৃত্ত সারণীর এই অঞ্চলের যত গভীরে বিজ্ঞানীরা প্রবেশ করেছেন, ততই তাঁরা অধিকতর জটিলতার মুখোমুখি হয়েছেন।

শেষে এল ১০১ নং মৌলের পালা, নাম মেন্দেলেভিয়াম, প্রখ্যাত রুশ রাসায়নিকের স্মরণিকা।

নতুন এই ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলটির নামকরণের পরই শুধু বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস হল যে এটি সত্যি সত্যিই পাওয়া গেছে।

যে শর্তাধীনে ১০১ নং মৌলটির সংশ্লেষ সম্ভব তার হিসেব-নিকেশ তুলনামূলকভাবে কিছুটা সহজ। এর প্রতিষঙ্গী পারমাণবিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখা তেমন কঠিন নয়। এই নতুন ট্রান্সইউরেনিয়াম মৌলটির কোন আইসোটোপ গঠিত হবে, তাও আগে থেকে জানা সম্ভব।

এই হল তত্ত্ব। কিন্তু কার্যত যা পাওয়া যায়, তার সত্যায়ন প্রয়োজন। আইসোটোপটি যে সত্যি ১০১ নং মৌলের, অন্য কারও নয়, এবং পরমাণবিক প্রক্রিয়াজাত, তার প্রমাণ দরকার।

পরে যা পাওয়া গেল তা উদ্ভট। '১০১ নং মৌল সংশ্লেষের একটি পরীক্ষায় এর একাধিক পরমাণুর বেশি কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা কম,' — এই হল পদার্থবিদ্যা ও গণিতের যথাযথ বিচারবিশ্লেষণান্তিক অভিমত। এবং তাই সত্য হয়ে উঠল। কেবল একটিমাত্র পরমাণু, একটি অজ্ঞাত পরমাণুই এর জন্ম ঘোষণা করল। কিন্তু এটি কি ১০১ নং মৌলের পরমাণু?

সুবেদী রেডিওমেট্রিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পরমাণুর অর্ধায়ু পরিমাণ করা যায়, কিন্তু রাসায়নিক গুণাগুণ নয়।

এবং, সাধারণত একটিমাত্র পরমাণুরও প্রধান প্রধান রাসায়নিক গুণাগুণগুলি নির্ধারণ করা কি সম্ভব?

ক্রমেটোগ্রাফিতে এর সমাধান মিলল।

আমাদের যুক্তিবিন্যাস সতর্কভাবে লক্ষ্য করুন। ১০১ নং মৌল নিশ্চিতভাবে অ্যাক্টিনাইড গোত্রের অন্তগর্ত। অ্যাক্টিনাইডগুলি অন্যতর একটি আত্মীয়গোত্র — ল্যান্থেনাইড মৌলদের বহু চারিত্র্যের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আয়ন-বিনিময় ক্রমেটোগ্রাফির সাহায্যে ল্যান্থেনাইডগুলি পৃথক করা যায়, এরা মিশ্রণ থেকে প্রত্যেকে সঠিক ক্রমানুসারে পৃথকীভূত হয় — প্রথমে ভারি এবং পরে হালকাগুলি।

অ্যাক্টিনাইড লহরিতে ১০১ নং মৌলের অবস্থান আইনস্টাইনিয়াম (৯৯ নং) এবং ফার্মিয়ামের (১০০ নং) পরবর্তী। আমরা যদি ক্রমেটোগ্রাফি মাধ্যমে আইনস্টাইনিয়াম, ফার্মিয়াম আর ১০১ নং মৌলকে পৃথক করতে চাই, তাহলে ক্রমেটোগ্রাফি স্তম্ভ থেকে নিঃসৃত দ্রবের প্রথম বিন্দুগুলিতেই শেষোক্ত মৌল — মেন্দেলেভিয়াম দৃষ্টি-গোচর হওয়ার কথা।

বিজ্ঞানীরা মেন্দেলেভিয়াম সংশ্লেষের পরীক্ষাটি সতের বার পুনরাবৃত্তি করলেন। মানুষসৃষ্ট নবজাত পরমাণুটির রাসায়নিক চারিত্র্য নির্ধারণে তাঁরা সতের বার আয়ন-বিনিময় ক্রমেটোগ্রাফি ব্যবহার করলেন। এবং প্রতিবারই তত্ত্বানুযায়ী যে-বিন্দুতে মেন্দেলেভিয়াম পরমাণুটি থাকার কথা ঠিক সেখানেই তা দেখা গেল। আগে কেবল এমন বিন্দুতে ফার্মিয়াম আর আইনস্টাইনিয়ামই ধরা পড়ত।

সুতরাং, মেন্দেলেভিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ১০১ এবং এর গুণাগুণ পুরোপুরিই অ্যাক্টিনাইড-অনুগ।

সীমার মাঝে অসীম?

পৃথিবীতে সবকিছুরই শেষ আছে, নেই শুধু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের। এর আদি নেই, অন্ত নেই। সাধারণ অর্থে বিশ্লেষণেরও যে একটা সীমানা আছে এতে আর সন্দেহ নেই। আমরা যদি মৌলের পৃথক পৃথক পরমাণু অথবা রাসায়নিক পদার্থের অণুর রাসায়নিক চারিত্র্য নির্ধারণ করতে পারি, তাহলেই বলব আমরা সেই সীমানায় পৌঁছেছি।

আমরা যা বলতে চেয়েছি তা এ নয়। আমাদের শতকে চল্লিশের দশকের গোড়ায়, প্রায় পঁচিশ বছর আগে রাসায়নিকরা মূল পদার্থে ০·০১—০·০০১ শতাংশ অবধি অপবস্তুর অধিকাংশই বিশ্লেষণ করতে পারতেন এবং তাতে সবাই মোটামুটি তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির গতিবেগ আজ এতই প্রচণ্ড যে, ষাটের দশকের শুরুতেই এক লক্ষ কোটি ভাগের একভাগ ($১০^{-১২}$) অপবস্তুর অস্তিত্ব নির্ধারণও জরুরী হয়ে উঠেছিল। তখন একক মৌল সনাক্তকরণের উপযোগী সেই সূক্ষ্মতার লক্ষ্যে আমরা শুধু এগুতে শুরু করেছি। আমরা এখন মুখ্যত বিকারক বিশ্লেষণ, গ্যাস ক্রমেটোগ্রাফি, ভর-বর্ণালীমিতি প্রক্রিয়ার কল্যাণে কয়েকটি মৌল ও তাদের যৌগাবলীর পূর্বোক্ত পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারি। এই 'অকিঞ্চিৎকর' মাত্রা নির্ণয় আজ বিজ্ঞানীদের সাধ্যায়ত্ত।

অপবস্তু বিশ্লেষণে দাবি কেবল বেড়েই চলবে। প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ান ই. আলিমারিনের মতে পদার্থবিশেষের অপবস্তু নির্ণয়ের মাত্রা এমন পর্যায়ে পেঁছবে যখন অপবস্তুর একটিমাত্র পরমাণু অর্থাৎ গ্রামের হিসাবে $১০^{-২৩}$ পরিমাণ নির্ধারণও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। পদার্থবিদ ও রাসায়নিকদের একযোগে সমস্যাটি মোকাবিলা করতে হবে। অদ্যাবধি কেবল তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ক্ষেত্রেই সমস্যাটির সমাধান সম্ভবপর হয়েছে। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় একক পরমাণুও আমরা এখনই সনাক্ত করতে পারি। কিন্তু সুস্থিত পরমাণু এবং তাদের যৌগাবলীর ক্ষেত্রে এমন সূক্ষ্মতা অর্জন থেকে আজও আমরা অনেক দূরে। যারা এই 'শূন্যস্থানগুলি', 'পূর্ণ করবে' তাদের জন্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি এখন অপেক্ষমাণ।

একটি বিস্ময়কর সংখ্যা

অংক কষার সময় বিজ্ঞানীরা প্রায়ই ধ্রুবক ব্যবহার করেন, যাতে কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যে সংখ্যাসূচক মান বিধৃত থাকে। এদেরই একটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এর নাম অ্যাভোগেড্রো সংখ্যা। বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী অ্যাভোগেড্রো ব্যবহৃত এই ধ্রুবকটি তাঁরই নামাঙ্কিত। অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা যেকোন মৌলের গ্রাম-পরমাণুর অন্তর্গত পরমাণুসংখ্যা।

স্মর্তব্য, গ্রাম-পরমাণু মৌলবিশেষের পরিমাণ, গ্রামসংখ্যায় যা তার পারমাণবিক ভরের সমান। দৃষ্টান্ত: কার্বনের গ্রাম-পরমাণু (মোটামুটি) ১২ গ্রাঃ, লৌহের ৫৬ গ্রাঃ এবং ইউরেনিয়ামের ২৩৮ গ্রাঃ।

উপরোক্ত পরিমাণগুলির প্রত্যেকটিতে যে-পরমাণু সংখ্যা আছে তা পুরোপুরি অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার সমান।

কাগজে কলমে 'এক'-এর পর তেইশটি শূন্য বসিয়ে মোটামুটিভাবে কিংবা $৬\cdot০২৫ \times ১০^{২৩}$-এর মাধ্যমে সঠিকতরভাবে এটি দেখান যায়।

আর এভাবেই জানা যায় ১২ গ্রাম কার্বন, ৫৬ গ্রাম লৌহ অথবা ২৩৮ গ্রাম ইউরেনিয়ামে কতটি পরমাণু রয়েছে।

অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যাটি এত অস্বাভাবিক রকমের বড় যে, এটি কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য। তবু দেখা যাক।

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৩০০ কোটি। ধরা যাক পৃথিবীর সবাই কোন মৌলের গ্রাম-পরমাণুর পরমাণুসংখ্যা গুনতে চাইল। মনে করুন, প্রত্যেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করছে আর প্রতি সেকেণ্ডে একটি করে সংখ্যা গুনছে।

পৃথিবীর সবকটি মানুষের পক্ষে $৬\cdot০২৫\times ১০^{২৩}$ সময় লাগবে?

হিসাবটি খুবই সোজা। আপনি নিজে নিজেই তা করতে পারেন। এতে সময় লাগবে প্রায় ২ কোটি বছর। কৌতুকপ্রদ, তাই না?

অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যাটির বিপুলায়তন রাসায়নিক পদার্থের সর্বত্রগামিতার যুক্তিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। অতঃপর, যেকোন পদার্থের অন্তত কিছুসংখ্যক পরমাণু যেকোন জায়গায়ই খুঁজে পাবার কথা।

অ্যাভোগেড্রো সংখ্যাটির বিপুলতাই পুরোপুরি অপবস্তুবর্জিত চূড়ান্ত বিশুদ্ধ কোন পদার্থের অস্তিত্বকে অসম্ভব করে তুলেছে। নতুন কোন অপবস্তু যোগ না করে

কোন প্রক্রিয়ায়ই $১০^{২৩}$ পরমাণুর মধ্যে অপবস্তুর একটিমাত্র পরমাণুকে চিহ্নিত করা অসম্ভব।

বস্তুত, এক গ্রাম লৌহের পরমাণুসংখ্যা প্রায় $১০^{২২}$। এতে যদি অপবস্তু হিসাবে এক শতাংশও (১০ মিলিগ্রাম) তাম্রের পরমাণু থাকে তাতেও পরমাণুসংখ্যা $১০^{২০}$ -এর কম দাঁড়াবে না। যদি অপবস্তুর মাত্রা এক শতাংশের দশ হাজার ভাগের একভাগেও কমিয়ে আনা হয়, তবু মূল পদার্থের $১০^{২৩}$ সংখ্যক পরমাণুতে অপবস্তু পরমাণু থাকবে $১০^{১৬}$ টি। পর্যায়বৃত্ত সারণীর সকল মৌলই যদি অপবস্তুভুক্ত হয়, তবে তাদের মৌলপ্রতি পরমাণুসংখ্যার গড় দাঁড়াবে $১০^{১৪}$ অর্থাৎ কোটি কোটি পরমাণু।

রসায়ন : নবদিগন্ত

হীরা প্রসঙ্গ, পুনর্বার

কাঠিন্যে আকাটা কাঁচা হীরা 'ধাতু কিংবা যেকোন পদার্থের' মধ্যেই তুলনাহীন। হীরা না থাকলে আধুনিক ইঞ্জিনিয়রিং বেজায় বিপদগ্রস্ত হত।

কাটা ও মসৃণ হীরা উজ্জ্বলতায় মণিরাজ্যে অতুল্য।

ধূসর-নীল হীরা জহুরিদের কাছে লোভনীয়। এগুলি দুষ্প্রাপ্য আর দামেও মহার্ঘতম।

তাসত্ত্বেও মণি-হীরা খুব কিছু দরকারী জিনিস নয়। যদি সাধারণ হীরা সবসময় যথেষ্ট পাওয়া যেত, এর ক্ষুদে দানাগুলি নিয়ে আমাদের ভাবতে হত না!

দুর্ভাগ্য, পৃথিবীতে হীরাখনি খুবই কম আর সেগুলির অধিকাংশই তেমন কিছু সমৃদ্ধ নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া সারা দুনিয়ার নব্বুই শতাংশ হীরাই দক্ষিণ আফ্রিকার একটি হীরাখনির উৎপাদ। প্রায় কুড়ি বছর আগে সোভিয়েত দেশের ইয়াকুতিয়ায় হীরাসমৃদ্ধ এক অতি বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। এখন সেখানে শিল্পপণ্য হিসাবে হীরা উৎপন্ন হচ্ছে।

প্রাকৃতিক হীরা তৈরি অস্বাভাবিক শর্তনির্ভর। এজন্য প্রয়োজন অত্যুচ্চ তাপ ও চাপ। ভূত্বকের গভীরতম অঞ্চলই হীরার জন্মভূমি। কোন কোন স্থানে হীরা গলিত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূত্বকের উপরে ওঠে আসে এবং জমে যায়। কিন্তু এমনটি দৈবাৎই ঘটে।

কিন্তু এখানে প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া কি আমরা নিরুপায়? মানুষ কি নিজে হীরা তৈরি করতে পারে না?

কৃত্রিম হীরা তৈরির চেষ্টার বহু ঘটনা বিজ্ঞানেতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম মুক্ত ফ্লোরিন পৃথককারী আঁরি ময়ুসাঁ এই প্রথম 'ভাগ্যান্বেষীদের' অন্যতম।) এঁদের কেউই সফল হন নি। হয় তাঁদের পদ্ধতিতেই মৌলিক ভুল ছিল কিংবা অপরিহার্য অত্যুচ্চ তাপ ও চাপমাত্রা সমন্বয়কারী কোন যন্ত্রপাতি তাঁদের ছিল না।

কেবল এই শতকের পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি আধুনিক ইঞ্জিনিয়রিংয়েই শেষাবধি কৃত্রিম হীরা তৈরির চাবিকাঠি মিলল। যেমনটি আশা করা গিয়েছিল ঠিক তেমনি কৃষ্ণসীসই এর কাঁচামাল হল। বিজ্ঞানীরা একে একই সঙ্গে লক্ষ বায়ুচাপ ও প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখলেন। আজকাল পৃথিবীর বহু দেশেই হীরা তৈরি হচ্ছে।

এখানে অবশ্য রাসায়নিকরা অন্য অনেকের সঙ্গে এই কৃতিত্বের ভাগীদার। তাদের অবদান এখানে গৌণ, এই সাফল্যের অধিকাংশই পদার্থবিদদের পাওনা।

তাসত্ত্বেও অন্য আর এক দিকে রাসায়নিকদের সাফল্যও উল্লেখ্য। হীরাকে পূর্ণাঙ্গকরণে তাঁদের প্রভূত সাহায্য অনস্বীকার্য।

হীরা পূর্ণাঙ্গকরণ? হীরার চেয়ে আদর্শতর আর কী আছে? কেলাসজগতে এর কেলাস-সংযুতি শ্রেষ্ঠতম। হীরক কেলাসে কার্বন পরমাণুর আদর্শ জ্যামিতিক বিন্যাসই এর আত্যন্তিক কাঠিন্যের হেতু।

হীরাকে আরও কঠিন করা সম্ভব নয়, কিন্তু হীরার চেয়ে কঠিনতর পদার্থ তৈরি সম্ভব। এমন পদার্থ তৈরির কাঁচামাল রাসায়নিকরা সৃষ্টি করেছেন।

বোরন ও নাইট্রোজেনের একটি যৌগ আছে। এর নাম বোরন নাইট্রাইড। এতে দেখার মতো কিছুই নেই। কিন্তু অবিকল কৃষ্ণসীসের মতো এর কেলাস-সংযুতিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এজন্য বহু আগে থেকেই বোরন নাইট্রাইড 'শ্বেতসীস' নামে জ্ঞাত। অবশ্য কেউ কোনদিন এদিয়ে পেন্সিল তৈরির চেষ্টা করে নি।

রাসায়নিকরা বোরন নাইট্রাইড সংশ্লেষের এক সস্তা পথ খুঁজে পেলেন। পদার্থবিদরা একে লক্ষ লক্ষ বায়ুচাপ ও হাজার হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখলেন। তাদের যুক্তিটি ছিল খুবই সরল। যদি 'কৃষ্ণ'সীসকে হীরায় রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে এর 'সাদা' প্রতিরূপ থেকে হীরাকল্প কিছু পাওয়া যাবে না কেন?

ফল ফলল। পাওয়া গেল বোরাজন, হীরার চেয়েও কঠিন পদার্থ। এতে মসৃণ হীরায়ও আঁচড় কাটা যায় আর এর তাপসহিষ্ণুতাও বেশি। বোরাজন পোড়ানো মোটেই সহজ নয়।

এখনও বোরাজন মহার্ঘ। একে সস্তা করার অবকাশ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। মানুষ আর একবার প্রকৃতির উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

অনন্ত অণু

রবার কী, তা সকলেরই জানা। এতে বল, তুষার হকির চাকতি আর সার্জনের দস্তানা তৈরি হয়। তা ছাড়া গাড়ির টায়ার, গরম জলের ব্যাগ, রেনকোট আর জলের পাইপও।

শত শত কলকারখানায় এখন রবার আর রবার-সামগ্রী তৈরি হচ্ছে। মাত্র কয়েক

দশক আগেও সারা বিশ্বে সকল রবার-সামগ্রীই প্রাকৃতিক কাওচুক দিয়েই তৈরি হত। 'কাওচুক' শব্দটি রেড ইন্ডিয়ান ভাষার 'কাও চাও' শব্দ থেকে উৎপন্ন: অর্থ 'হ্যাভিয়ার অশ্রু'। হ্যাভিয়া একটি গাছ। এ গাছের কষ থেকে বিশেষ পদ্ধতিতে রবার তৈরি হয়।

অঢেল দরকারী জিনিসপত্রই তো রবারের। কিন্তু আপসোস, এর উৎপাদন শ্রমসাধ্য আর হ্যাভিয়া জন্মেও শুধু উষ্ণমন্ডলে। তাই, এই প্রাকৃতিক সম্পদে শিল্পের চাহিদা পূরণ অসম্ভব ছিল।

এখানেও সেই রসায়নই মুশকিলআসান। প্রথমে, বিজ্ঞানীরা রবারের অত্যধিক স্থিতিস্থাপকতার কারণ জানার চেষ্টা করলেন। বহুদিন 'হ্যাভিয়ার অশ্রু' পরীক্ষার পর এর উত্তর মিলল। দেখা গেল, রবার অণুর সংযুতি খুবই অদ্ভুত ধরনের। এগুলি সদৃশ এককের পৌনঃপুন্যে তৈরি অসম্ভব দীর্ঘ শৃঙ্খলবিশেষ। অবশ্য, প্রায় পনেরো হাজার এককপুঞ্জিত এই অণুটি সর্বদিকেই কুণ্ঠনক্ষম, আর এজন্যই স্থিতিস্থাপক। দেখা গেল, শৃঙ্খলটি হাইড্রোকার্বন আইসোপ্রেন অণু C_5H_8-এ তৈরি। এর সংযুতি-সংকেত নিম্নরূপ:

```
      H           H     H
      |           |     |
H — C ═ C — C ═ C — H
            |
       H — C — H
            |
            H
```
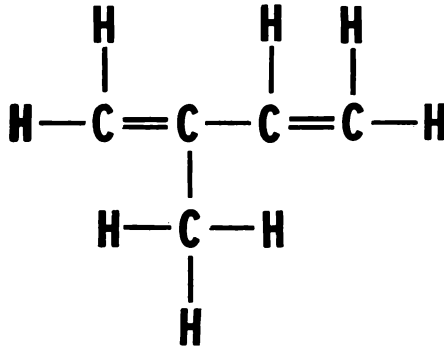
আইসোপ্রেনকে এক ধরনের প্রাথমিক প্রাকৃতিক মনোমার বলাই শুদ্ধতর। পলিমারীকরণের সময় আইসোপ্রেন অণুর সামান্য পরিবর্তন ঘটে। এতে কার্বন পরমাণুর দ্বৈত বন্ধগুলি খুলে যায় আর মুক্তবন্ধে আটকে পড়া এককে তৈরি হয় বিশাল রবার অণু।

বহুকাল আগেই কৃত্রিম রবার তৈরির সমস্যার দিকে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ররা আকৃষ্ট হন।

প্রথম দৃষ্টিতে এটি তেমন কিছু জটিল মনে হয় না। প্রথমে, আইসোপ্রেন উৎপাদন আর পরে এর পলিমারীকরণ অর্থাৎ আইসোপ্রেন এককগুলিকে কৃত্রিম রবারের নম্য দীর্ঘ শৃঙ্খলে বন্দী করা।

কিন্তু ফলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কষ্টেসৃষ্টে যদিও বা রাসায়নিকরা আইসোপ্রেন সংশ্লেষ করলেন, কিন্তু পলিমারীকরণের সময় আর রবার তৈরি হল না। এককগুলি পরস্পরযুক্ত হয়েছিল, তবে অবিন্যস্তভাবে, আর সেজন্য কৃত্রিম উৎপাদটি কিছুটা রাবারের মতো দেখালেও আসলে তা ছিল রবার থেকে বহু গুণে আলাদা।

সুতরাং, আইসোপ্রেন এককগুলি যাতে সঠিকভাবে শৃঙ্খলিত হয় তার পথ খোঁজা রাসায়নিকদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

সোভিয়েত ইউনিয়নেই শেষে পৃথিবীর প্রথম শিল্পজাত কৃত্রিম রবার উৎপন্ন হল। আকাদেমিশিয়ান স. লেবেদেভ শৃঙ্খলের একক হিসাবে আলাদা একটি পদার্থ ব্যবহার করলেন। এটি বিউটাডিন:

```
    H           H
    |           |
H — C = C — C = C — H
        |   |
        H   H
```
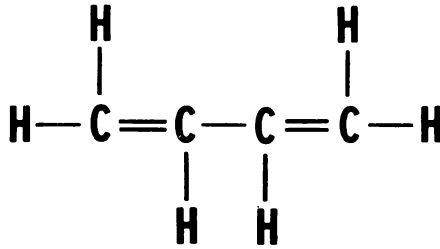
সংস্থিতি ও সংযুতিতে এটি আইসোপ্রেনের সদৃশ, কিন্তু একে পলিমারীকরণ সহজতর ছিল।

এখন সংশ্লেষিত রবারের সংখ্যা বহু (প্রাকৃতিক রবার থেকে আলাদা করার জন্য এদের ইলাস্টোমার বলা হয়)।

প্রাকৃতিক রবার এবং এর জিনিসপত্র বহুলাংশে ত্রুটিদুষ্ট, যথা: তৈল ও চর্বিতে তা অসম্ভব ফুলে ওঠে, তা অনেক জারক, বিশেষত ওজোনরোধী নয়, অথচ আবহাওয়ায় সবসময়ই ওজোন থাকে। প্রাকৃতিক রাবারকে গন্ধক সহ উচ্চ তাপে তাতানই নিয়ম। এভাবেই কাঁচা রবারকে পাকা রবার বা এবোনাইটে রূপান্তরিত করা হয়। ব্যবহারকালে প্রাকৃতিক রবারের জিনিসে (যথা গাড়ির টায়ার) প্রচুর তাপোৎপাদন ঘটে এবং এজন্য তা পুরানো ও দ্রুত ক্ষয় হয়।

তাই, উচ্চমানের কৃত্রিম রবার তৈরি বিজ্ঞানীদের পক্ষে জরুরী ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে, 'বুনা' নামের একটি পুরো রবার গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ্য। নামটি এসেছে দু'টি শব্দের প্রথম অক্ষর থেকে: 'বিউটাডিন' এবং 'নাট্রিয়াম' ('সোডিয়াম'-এর লেটিন); পলিমারীকরণে সোডিয়াম এখানে অনুঘটক। এই গোষ্ঠীর অনেকগুলি ইলাস্টোমারই চমৎকার এবং প্রধানত গাড়ির টায়ার তৈরিতেই ব্যবহার্য।

আইসোবিউটেন ও আইসোপ্রেনের পলিমারীকরণে তৈরি বিউটাইল রবারের গুরুত্বই সর্বাধিক। প্রথমত, এটি সবচেয়ে সস্তা। দ্বিতীয়ত, ওজোনে এর কোন ক্ষতি হয় না। ঘনীকৃত প্রাকৃতিক রবারে তৈরি টায়ার-টিউব অপেক্ষা ঘনীকৃত বিউটাইল রবারের এ সকল সামগ্রী বাতাসের পক্ষে অন্ততপক্ষে দশগুণ বেশি অভেদ্য।

পলিয়ুরেথিন রবার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এটি উচ্চ প্রসার্য শক্তিধর এবং প্রায় অক্ষয়। এই রবার গদির ফোম তৈরিতে ব্যবহার্য।

ইদানিংকালে যে সব রবার উৎপন্ন হয়েছে, অতীতে তা বিজ্ঞানীদের কল্পনাতীত ছিল। এগুলি অঙ্গারক সিলিকন ও ফ্লোরোকার্বন যৌগের প্রাথমিক ইলাস্টোমার। এরা প্রাকৃতিক রবারের দ্বিগুণ তাপসহিষ্ণু এবং ওজোনরোধী। ফ্লোরোকার্বন যৌগের রবার ধূমায়মান সালফিউরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডেও অনাক্রম্য।

কিন্তু এ-ই সবকিছু নয়। এর শেষতম অবদান কার্বক্সিলযুক্ত রবার। এটি বিউটাডিন ও জৈবাম্লের সহ-পলিমার। এদের প্রসার্য শক্তি অত্যধিক।

মানুষের তৈরি সামগ্রীর উচ্চমানের কাছে এখানেও প্রকৃতির হার হল।

দুর্ভেদ্য মর্ম, গণ্ডার চর্ম

জৈবরসায়নে হাইড্রোকার্বন নামের এক দঙ্গল যৌগ আছে। এগুলি আক্ষরিকভাবেই নামের অনুবর্তী, কারণ তাদের অণুতে হাইড্রোজেন আর কার্বন পরমাণু ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এগুলির সর্বজনজ্ঞাত, বিশিষ্টতম প্রতিনিধি মিথেন (প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রায় ৯৫ শতাংশ) এবং পেট্রোলিয়াম, যা থেকে নানা ধরনের পেট্রোল, ল্যুব্রিকেণ্ট এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মূল্যবান উৎপাদ তৈরি হয়।

সরলতম হাইড্রোকার্বন মিথেন CH_4-এর কথাই ধরা যাক। কিন্তু এর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি অক্সিজেনে প্রতিস্থাপিত হলে কী হবে? হবে কার্বন ডাইঅক্সাইড, CO_2। আর গন্ধক পরমাণু এগুলির স্থলবর্তী হলে? এবার মিলবে একটি বিষাক্ত উদ্বায়ী তরল: কার্বন ডাইসালফাইড, CS_2। আর যদি সবক'টি হাইড্রোজেন ক্লোরিন পরমাণুতে প্রতিস্থাপিত হয়, পাওয়া যাবে সবার চেনা কার্বন টেট্রাক্লোরাইড। কিন্তু ক্লোরিনের জায়গায় ফ্লোরিন নিলে?

তিন দশক আগেও কেউ এর সঠিক উত্তর জানত না। কিন্তু আমাদের কালে ফ্লোরোকার্বন রসায়নের একটি স্বতন্ত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত শাখা।

ভৌত চারিত্র্যে ফ্লোরোকার্বন হাইড্রোকার্বনের সদৃশপ্রায় উদাহরণ। কিন্তু এ কেবল তাদের সাধারণ গুণাগুণের ক্ষেত্রেই। হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে ফ্লোরোকার্বনের প্রকট বৈপরিত্য শেষোক্তের বিক্রিয়াবিমুখিনতায় চিহ্নিত। তা ছাড়া এগুলি অত্যন্ত তাপসহিষ্ণু। আর এজন্য এরা 'দুর্ভেদ্য মর্ম, গণ্ডার চর্ম' জাতীয় পদার্থের দলভুক্ত।

হাইড্রোকার্বনের (এবং অন্যান্য শ্রেণীর জৈব পদার্থেরও) তুলনায় এদের অধিকতর স্থৈর্যের রাসায়নিক ব্যাখ্যা সহজসাধ্য। ফ্লোরিন পরমাণুগুলি হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে অনেক বড় আর সেজন্য কার্বন পরমাণুর চারিদিকে তাদের তৈরি বেষ্টনী অন্য আগ্রাসী পরমাণুর পক্ষে অভেদ্য হয়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে, ফ্লোরিন পরমাণু আয়নে রূপান্তরিত হলে ইলেকট্রন-বিয়োগে খুবই গড়িমসি করে। তা ছাড়া অন্য পরমাণুর সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হতেও তাদের বেজায় 'আপত্তি'। আমরা জানি ফ্লোরিন অধাতুদের মধ্যে সক্রিয়তম। বস্তুত এমন কোন অধাতু নেই, যে তার আয়ন জারণে সক্ষম (অর্থাৎ নিজের জন্য কোন ইলেকট্রন অপসারণ করতে পারে)। তা ছাড়া কার্বন — কার্বন বন্ধও অতি সুস্থিত (হীরক স্মরণীয়)।

নিষ্ক্রিয়তার জন্যই ফ্লোরোকার্বন বহুল ব্যবহৃত। দৃষ্টান্ত হিসেবে ফ্লোরোকার্বনের টেফ্লোন নামক রজন উল্লেখ্য। এর পক্ষে ৩০০ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহনীয় এবং
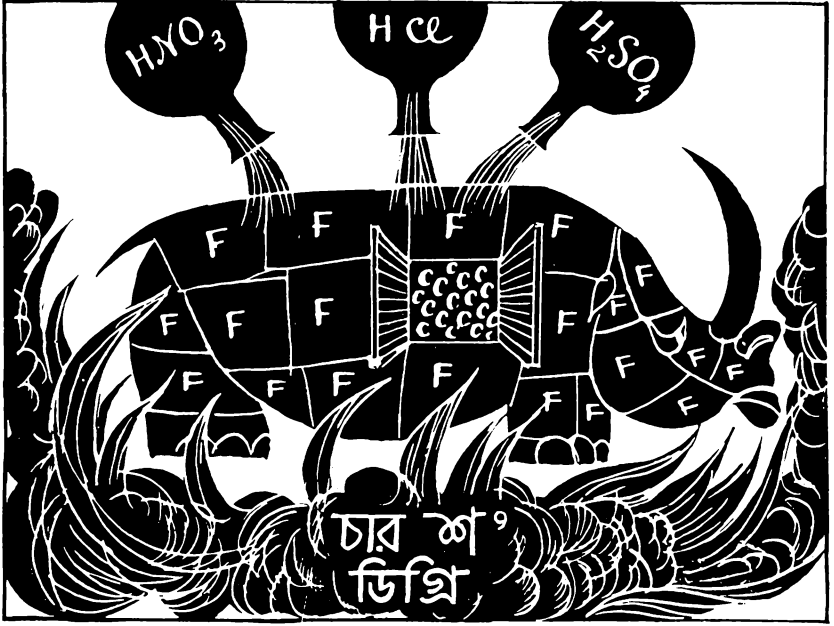
সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক ও অন্যান্য অ্যাসিডেও তা অনাক্রম্য। ফুটন্ত ক্ষার প্রতিহত করা সহ এটি জ্ঞাত সকল জৈব ও অজৈব দ্রাবকে অদ্রাব্য।

ফ্লোরোপ্লাস্টিককে বৃথাই 'জৈব প্ল্যাটিনাম' বলা হয় না। রাসায়নিক পরীক্ষাগারের জিনিসপত্র, শিল্পের বিবিধ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি এবং নানাভাবে ব্যবহৃত নল তৈরির পক্ষে উপাদানটি চমৎকার। বিশ্বাস করুন, প্ল্যাটিনাম এত মহার্ঘ না হলে দুনিয়ায় হরেক রকম জিনিসই এতে তৈরি হত। সে তুলনায় ফ্লোরোপ্লাস্টিক অনেকটা সস্তা বৈকি।

ফ্লোরোপ্লাস্টিক পৃথিবীর পিচ্ছিলতম বস্তু। টেবিলে ফ্লোরোপ্লাস্টিকের পর্দা ছুড়ে ফেললে সত্যিকার অর্থেই এটি 'স্রোতের মতো' মেঝেতে 'গড়িয়ে পড়বে'। ফ্লোরোপ্লাস্টিকে তৈরি বিয়ারিং-এ বস্তুত কোন পিচ্ছিলক ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। সবশেষে, এটি বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসেবে চমৎকার এবং আত্যন্তিক তাপসহিষ্ণুও। এর অন্তরক ৪০০ ডিগ্রি অবধি তাপ সহ্য করতে পারে, যা সীসার গলনাঙ্কের চেয়েও বেশি!

এই হল ফ্লোরোপ্লাস্টিক, মানুষের বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্যতম।

তরল ফ্লোরোকার্বন দাহ্য নয় এবং তা হিমাঙ্কের অনেক নিচেই শুধু ঘনীভূত হয়।

কার্বন ও সিলিকনের সমাবন্ধন

প্রকৃতির রাজ্যে বিশেষ মর্যাদার দাবীদার দুটি পদার্থ আছে। এগুলির প্রথমটি কার্বন। জীব মাত্রেরই এটি মৌলিক উপাদান। এর দাবী যথার্থ, কারণ কার্বন পরমাণুগুলি পারস্পরিক দৃঢ়বন্ধনে শৃঙ্খলানুগ যৌগ তৈরি করে:
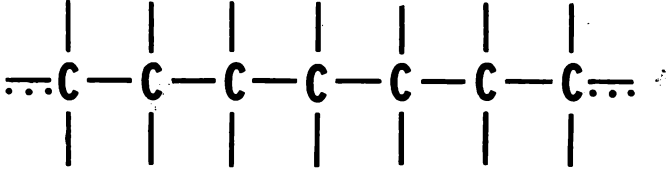
আর দ্বিতীয়টি সিলিকন। সে সকল অজৈব পদার্থের ভিত্তি। কিন্তু কার্বন পরমাণুর মতো সিলিকন এত দীর্ঘ শৃঙ্খল তৈরিতে সমর্থ নয়। তা ছাড়া কার্বন যৌগের তুলনায় সিলিকন যৌগের সংখ্যাও কম। অবশ্য, অন্য রাসায়নিক মৌলের তুলনায় এর যৌগসংখ্যা অনেক বেশি।

বিজ্ঞানীরা সিলিকনের এই সীমাবদ্ধতা 'সংশোধনে' তৎপর হলেন। বস্তুত, সিলিকন কার্বনের মতোই চতুর্যোজী। সন্দেহ নেই, সিলিকন পরমাণুর তুলনায় কার্বন পরমাণুর সংসক্তি অনেক বেশি। কিন্তু সিলিকনের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা এই ঘাটতি পূরণ করে।

আমরা যদি অতঃপর জৈব যৌগের মতো যৌগ পাই, যেখানে সিলিকন কার্বনের স্থলবর্তী, তাহলে এগুলিতে কী কী সব বিস্ময়কর গুণাগুণই না বিধৃত হবে!

শুরুতে বিজ্ঞানীদের ভাগ্য প্রসন্ন হয় নি। অবশ্য, তাঁরা প্রমাণ করেন যে, নিজ পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুর একান্তর সমাবন্ধনে সিলিকন বিশেষ যৌগ তৈরিতে সক্ষম:

...Si—O—Si—O—Si—O—Si—O...
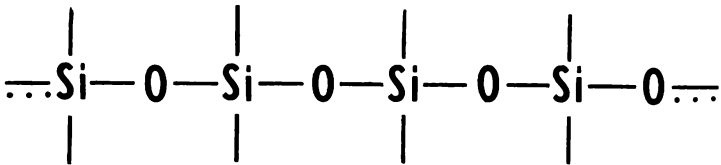
কিন্তু যৌগগুলি সুস্থিত হয় নি।

যখন তাঁরা সিলিকনের সঙ্গে কার্বন পরমাণু সমাবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিলেন, সাফল্য এল তখনই। অঙ্গারক সিলিকন যৌগ বা সিলিকোন্‌স নামে পরিচিত এসব যৌগাবলী বহু অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। সিলিকোন্‌স থেকে নানা ধরনের রজন তৈরি হয়েছে। আর এ থেকে উচ্চ তাপসহিষ্ণু প্লাস্টিক উৎপাদন সম্ভব বলেও অনুমিত হচ্ছে।

অঙ্গারক সিলিকনের পলিমারভিত্তিক ইলাস্টোমার্‌স যে-সকল মূল্যবান গুণের অধিকারী তাপসহিষ্ণুতা তাদের অন্যতম। কোন কোন সিলিকোন রবার ৩৫০ ডিগ্রি অবধি সুস্থিত থাকে। এখন এই রবারের একটি টায়ার ঢাকনির কথা ভাবুন।

সিলিকোন রবার জৈব দ্রাবকে একটুও ফুলে ওঠে না। জ্বালানি সরবরাহের নানা ধরনের নলে এখন এগুলি সদ্ব্যবহৃত।

তাপমাত্রার বিস্তৃত পরিসরেও কোন কোন তরল সিলিকোন্‌স এবং রজনের সান্দ্রতা বদলায় না। এই গুণের জন্য এগুলি পিচ্ছিলক হিসেবে আদর্শ। নিম্ন উদ্বায়িতা এবং উচ্চ স্ফুটনাঙ্কের জন্য তরল সিলিকোন উচ্চ ভ্যাকুম পাম্পে বহুল ব্যবহৃত।

অঙ্গারক সিলিকনযৌগগুলি জল-তাড়ক এবং এই মূল্যবান বৈশিষ্ট্যটি জল-তাড়ক বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার্য। কথিত, জলে পাথরও ক্ষয় হয়। গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ-প্রকল্পের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, নির্মাণোপকরণে নানা ধরনের তরল অঙ্গারক সিলিকোন ব্যবহার লাভজনক।

সিলিকোনভিত্তিক অত্যুচ্চ তাপসহিষ্ণু এনামেল ইদানিং উদ্ভাবিত হয়েছে। এই এনামেল-আবৃত তাম্র বা লৌহের পাত অনেকক্ষণ অবধি ৮০০ ডিগ্রি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে।

বলা বাহুল্য, কার্বন আর সিলিকনের অদ্ভুত সমাবন্ধনের এই তো শুরু। কিন্তু এই 'দ্বৈত' সমাবন্ধনে রাসায়নিকরা আর তুষ্ট নন। তাঁরা অঙ্গারক সিলিকন যৌগের অণুর মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, টিটানিয়াম অথবা বোরন ইত্যাকার মৌলসংযোগে সচেষ্ট। সমস্যাটির সফল সমাপ্তি ঘটেছে। অতঃপর সম্পূর্ণ নতুন জাতের যে পদার্থ পাওয়া গেছে তাদের নাম: পলিঅর্গানোমেটেলোসিলোক্সেইন। এসব পলিমার-শৃঙ্খলে নানা ধরনের আঙ্‌টা থাকা সম্ভব: সিলিকন-অক্সিজেন-অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন-অক্সিজেন-টিটানিয়াম, সিলিকন-অক্সিজেন-বোরন ইত্যাদি। এই পদার্থগুলির গলনাঙ্ক ৫০০-৬০০ ডিগ্রি। এই গুণে এগুলি বহু ধাতু ও সংকর ধাতুর প্রতিদ্বন্দ্বী।

অল্প কিছুদিন আগে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল যে, জাপানী বিজ্ঞানীরা এমন এক

পলিমার উৎপন্ন করেছেন, যা ২,০০০ ডিগ্রি অবধি তাপ সহ্য করতে পারে। যদি সংবাদটি মিথ্যাও হয়, তবু তাতে তেমন কিছু যায় আসে না। বাস্তব সত্য এর নিকটবর্তী। আধুনিক ইঞ্জিনিয়রিং সামগ্রীর দীর্ঘ তালিকায় অচিরেই 'তাপরোধী পলিমার' শব্দটি যুক্ত হবে।

বিস্ময়কর ছাঁকনি

ছাঁকনিগুলির গড়ন অনন্য। এগুলি কৌতুকপ্রদ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সব বিশাল জৈবাণু।

প্রথমত, এগুলি অন্যান্য প্লাস্টিকের মতো জল ও জৈব দ্রাবকে দ্রাব্য নয়। দ্বিতীয়ত, এগুলি অজৈব বর্গের অন্তর্গত, যে বর্গ কোন দ্রাবকে (বিশেষত জল) নানা ধরনের আয়ন উৎপাদন করে। তাই, যৌগগুলি তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তিযোগ্য।

আয়ন-বিনিময় পদ্ধতিতে এগুলির হাইড্রোজেন আয়নকে কোন ধাতু-আয়নে প্রতিস্থাপিত করা সম্ভব।

তদনুসারে এই অনন্য যৌগাবলী আয়ন পরিবর্তক হিসেবে চিহ্নিত। যেগুলি ধনায়নের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হতে সক্ষম, সেগুলি ধনায়ন পরিবর্তক এবং যেগুলি ঋণায়নের সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত হয়, সেগুলি ঋণায়ন পরিবর্তক। জৈব আয়ন পরিবর্তক এই শতকের ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি প্রথম সংশ্লেষিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আয়ন পরিবর্তকের সাহায্যে খরজলকে মৃদুজলে এবং লোনা জলকে আলোনা জলে রূপান্তরিত করা যায়।

দু'টি স্তম্ভ কল্পনা করুন: এদের একটি ধনায়ন আর অন্যটি ঋণায়ন বোঝাই। ধরা যাক আমরা সাধারণ লোনা জল বিশুদ্ধ করতে চাই। প্রথমে আমরা ধনায়ন পরিবর্তকের মধ্য দিয়ে জলকে চালিত করব। অতঃপর, এর সকল সোডিয়াম আয়ন হাইড্রোজেন আয়নে প্রতিস্থাপিত এবং ফলত, জলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্থলবর্তী হবে। তারপর জল ঋণায়ন পরিবর্তকের মধ্য দিয়ে চালিত করা হল। যদি এটি হাইড্রোক্সিল আকারে (এর অন্তর্ভুক্ত বিনিময়ক্ষম ঋণায়নগুলি হাইড্রোক্সিল আয়ন) থাকে, তাহলে দ্রাবকের সকল ক্লোরাইড আয়ন হাইড্রোক্সিল আয়নে প্রতিস্থাপিত হবে। আর হাইড্রোক্সিল্ আয়নগুলি অচিরেই মুক্ত হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে মিশে জলে রূপান্তরিত হবে। যে জলে শুরুতে সোডিয়াম ক্লোরাইড

ছিল, আয়ন পরিবর্তক স্তম্ভের মধ্য দিয়ে পরিস্রাবিত হলে তা পুরোপুরি খনিজমুক্ত হয়। এই জল প্রথম শ্রেণীর পরিস্রুত জল অপেক্ষা মোটেই নিম্নমানের নয়।

কিন্তু কেবলমাত্র জলের খনিজমুক্তিই আয়ন পরিবর্তকের ব্যাপক খ্যাতির কারণ নয়। দেখা গেল, আয়ন পরিবর্তক বিভিন্ন আয়নকে বিভিন্ন মাত্রায় ধারণ করে। হাইড্রোজেন আয়ন থেকে লিথিয়াম, সোডিয়াম থেকে পটাসিয়াম, পটাসিয়াম থেকে রুবিডিয়াম আয়ন দৃঢ়তরভাবে ধৃত হয়। আয়ন বিনিময় থেকে নানা রকম ধাতু পৃথকীকরণের সহজ পথ খুলে গেল। বর্তমানে শিল্পের নানা শাখায় আয়ন পরিবর্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন। যেমন বহুকাল ফটোগ্রাফী কারখানার বর্জ্য থেকে মূল্যবান রৌপ্য সংগ্রহের কোন পদ্ধতি জানা ছিল না। আয়ন পরিবর্তক ফিলটারের সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছে।

সাগর-জল থেকে মূল্যবান খনিজ আহরণে কি আয়ন বিনিময় পদ্ধতির ব্যবহার কোনদিন সম্ভবপর হবে? এর উত্তর ইতিবাচক। যদিও সাগর-জলে বিভিন্ন ধরনের লবণের সংখ্যা বিপুল, তবু তা থেকে বরধাতুগুলি নিষ্কাশন আর দূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নয়।

এখনকার সমস্যা: ধনায়ন পরিবর্তকের মধ্যে সাগর-জল চালিত হলে এর লবণগুলি এই পরিবর্তকে অতি সামান্য পরিমাণ মূল্যবান ধাতুর পরিন্যাসও প্রহত করে। তাসত্ত্বেও সম্প্রতি ইলেকট্রন-পরিবর্তক রজন নামের একটি নতুন ধরনের রজন সংশ্লেষিত হয়েছে। এগুলি দ্রব-অন্তর্গত ধাতু আয়নের সঙ্গে শুধু নিজ আয়ন বিনিময়ই করে না, ইলেকট্রন যোগক্রমে এগুলিকে বিজারিতও করে। বর্তমান পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রৌপ্যপৃক্ত কোন দ্রব এই রজনে পরিস্রাবিত হলে রৌপ্য আয়ন নয়, একেবারে রৌপ্য ধাতু অচিরেই রজনে পরিন্যস্ত হয় এবং রজনের সক্রিয়তাও বেশ কিছুকাল অব্যাহত থাকে। অতএব, যদি লবণের মিশ্রণ আয়ন-পরিবর্তকের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয় তাহলে সর্বাধিক সহজে বিজারিত আয়নই প্রথম বিশুদ্ধ ধাতুর পরমাণুতে রূপান্তরিত হবে।

রাসায়নিক সাঁড়াশি

একটি পুরানো চুটকি: মরুভূমিতে সিংহ ধরার চেয়ে সোজা আর কিছু নেই। যেহেতু মরুভূমিতে কেবল বালু আর সিংহই আছে, তাই প্রয়োজন শুধু একটি ছাঁকনির। বালু এর ছিদ্র গলিয়ে নিচে পড়ে যাবে আর ছাঁকনির উপরে আটকে থাকবে সিংহরা।

কিন্তু বিপুল পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে যদি একটি মূল্যবান রাসায়নিক মৌল মিশে থাকে, তাহলে করণীয় কী? কিংবা যদি কোন কিছুতে সামান্য পরিমাণ বর্জ্য থাকে আর তা অপসারিত করতে হয়?

সমস্যাটি তেমনি কিছু বিরল নয়। নিউক্লীয় রিয়েক্টর তৈরিতে ব্যবহার্য জির্কোনিয়ামে যে-পরিমাণ হ্যাফ্‌নিয়াম আছে তা কোনক্রমেই শতাংশের দশ হাজার ভাগের একাংশের বেশি হতে পারে না। অথচ সাধারণ জির্কোনিয়ামে এর পরিমাণ শতাংশের দশ ভাগের দুভাগ।

হ্যাফ্‌নিয়াম ও জির্কোনিয়াম রাসায়নিক গুণাগুণে যমজ এবং এজন্য সাধারণ কৌশল এখানে অচল। এমন কি ইতিপূর্বে উল্লিখিত অনন্য রাসায়নিক ছাঁকনিও এখানে শক্তিহীন। তবু শুদ্ধতম জির্কোনিয়াম আমাদের চাইই চাই।

বহুকাল থেকেই রাসায়নিকরা একটি সূত্রের অনুসারী: 'সমান সমানেই বিগলিত হয়।' অজৈব ও জৈব পদার্থ যথাক্রমে অজৈব ও জৈব দ্রাবকে সহজেই গলে। ধাতবাম্লের বহু লবণ জল, অনার্দ্র ফ্লোরিক অ্যাসিড, তরল হাইড্রোসায়ানিক (প্রুসিক) অ্যাসিডে গলে থাকে। বহু জৈব পদার্থই বেঞ্জিন, অ্যাসিটোন, ক্লোরোফর্ম, কার্বন ডাইসালফাইড এবং অন্যান্য বহু জৈব দ্রাবকে সহজদ্রাব্য।

কিন্তু জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যবর্তীদের ব্যাপারটি? বিজ্ঞানীরা অল্পবিস্তর এ ধরনের পদার্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্লোরোফিল (সবুজ পাতার বর্ণকণিকা) উল্লেখ্য। এটি ম্যাগ্নেসিয়াম পরমাণুযুক্ত একটি জৈব যৌগ যা বহু জৈব দ্রাবকেই যথাযথভাবে বিগলিত হয়। প্রকৃতির রাজ্যে অজ্ঞাত বহু জৈব-ধাতব যৌগই কৃত্রিমভাবে সংশ্লেষিত হয়েছে। এদের অনেকগুলিই জৈব দ্রাবকে দ্রাব্য। এগুলির দ্রাব্যতা তাদের অন্তর্গত ধাতুর উপর নির্ভরশীল।

রাসায়নিকরা এই সুযোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

কার্যরত নিউক্লীয় রিয়েক্টরের জীর্ণ ইউরেনিয়াম ধাতুপিন্ড মাঝে মাঝে বদল করা হয়, যদিও এর অন্তর্গত অপবস্তুর (বিভক্ত ইউরেনিয়াম কণিকা) পরিমাণ সাধারণত শতাংশের এক হাজার ভাগের বেশি নয়। ধাতুপিন্ডগুলিকে প্রথমে নাইট্রিক অ্যাসিডে গলান হয়। নিউক্লীয় রূপান্তরণকালে উদ্ভূত সকল ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য ধাতুবর্গ অতঃপর নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়। কোন কোন অপবস্তু, যেমন জেনন, আয়োডিন স্বয়ংচলভাবেই গ্যাসীয় আকারে বেরিয়ে আসে। আর টিন সহ অন্যগুলি পঙ্কে আটকা পড়ে।

তখনও উৎপন্ন দ্রবে ইউরেনিয়াম ছাড়াও বহুসংখ্যক অপবস্তু থাকে যথা, প্লুটোনিয়াম, নেপ্‌চুনিয়াম, বিরলমৃত্তিক ধাতুবর্গ, টেক্‌নেসিয়াম ও অন্যান্য। এখানেই

জৈব পদার্থের প্রয়োজন। ইউরেনিয়ামের বিমিশ্র নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবকে ট্রাইবুটাইল ফসফেট নামক একটি জৈব পদার্থের দ্রবের সঙ্গে মেশান হয়। বস্তুত, পুরো ইউরেনিয়ামেরই অতঃপর জৈব পর্যায়ে রূপান্তরণ ঘটে এবং অপবস্তুগুলি নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবে আটকা পড়ে থাকে।

প্রক্রিয়াটির নাম নিষ্কাশন। দুবার নিষ্কাশনের পর ইউরেনিয়াম প্রায় সম্পূর্ণ অপবস্তুমুক্ত হয়ে ওঠে এবং পুনরায় ধাতুপিন্ডে ব্যবহৃত হতে পারে। এভাবে নিষ্কাশিত অপবস্তুর সর্বাধিক মূল্যবান অংশ, বিশেষভাবে প্লুটোনিয়াম ও অন্যান্য কয়েকটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে পৃথকীকরণ ও পুনরুদ্ধার করা হয়।

জির্কোনিয়াম ও হ্যাফ্‌নিয়ামকে এভাবেই পৃথক করা সম্ভব।

নিষ্কাশন এখন ইঞ্জিনিয়রিংয়ে ব্যাপক ব্যবহৃত। কেবল অজৈব যৌগই নয় বহু জৈব যৌগ যথা, ভিটামিন, চর্বি ও উপক্ষার শোধনে এটি প্রযুক্ত।

সাদা আঙরাখার রসায়ন

যোহান বম্বাস্টাস থিয়োফ্রেস্টাস পারাসেলসাস ফন হোয়েনহাইম তাঁর পোশাকী নাম। পারাসেলসাস তাঁর পদবি নয়, উপনাম, অর্থ — 'সেলসাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর'। চমৎকার রাসায়নিক এই পারাসেলসাস ছিলেন ধন্বন্তরিও। কেবল রাসায়নিক নয়, চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর নাম ছিল।

মধ্যযুগেই রসায়ন আর চিকিৎসাবিদ্যার মজবুত সমাবন্ধন ঘটে। রসায়ন তখনও বিজ্ঞান হয়ে ওঠে নি। তার মতামত তখন অস্পষ্ট আর চেষ্টা কুখ্যাত পরশ পাথর সন্ধানে অপব্যয়িত।

অতীন্দ্রিয়বাদে নিমজ্জমান এসব রাসায়নিকরা দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের শিক্ষালাভ করেছিলেন। এভাবেই চিকিৎসা-রসায়নের জন্ম। ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতকে অনেক রাসায়নিককেই ঔষধ-প্রস্তুতিবিদ বলা হত যদিও তাঁদের ঔষধ তৈরি বিশুদ্ধ রসায়ন চর্চা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সন্দেহ নেই তাঁরা মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন পদ্ধতিতে এগুলি প্রস্তুত করেছিলেন, আর তাঁদের 'ঔষধগুলি' অনেক সময়ই রোগীর কোন উপকারে আসত না।

পারাসেলসাস এসব 'ঔষধ-প্রস্তুতিবিদদের' শ্রেষ্ঠতমদের একজন ছিলেন। পারদ ও গন্ধক মলম (আজও চর্মরোগে ব্যবহার্য), লৌহ ও অ্যাণ্টিমনি লবণ এবং বিভিন্ন গাছগাছড়ার রস তাঁর উদ্ভাবিত ঔষধ-তালিকার অন্তর্গত।

শুরুতে চিকিৎসকদের রসায়ন কেবল প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীই সরবরাহ করতে

পারত, আর সেগুলির সংখ্যা ছিল খুবই কম। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা এতেই তুষ্ট থাকে নি।

আজ আধুনিক ঔষধপত্রের পুস্তিকার দিকে বারেক তাকালেই দেখা যাবে যে, এর ঔষধের মাত্র ২৫ শতাংশ প্রকৃতিদত্ত। বিবিধ গাছগাছড়ার নির্যাস, সালসা ও আরক ছাড়া এর বাকী সবই প্রকৃতির অজ্ঞাত সংশ্লেষিত ঔষধ যা রসায়নেরই একক সৃষ্টি।

প্রথম সংশ্লেষিত ঔষধটি প্রায় এক'শ বছরের পুরানো। সেলিসিলিক অ্যাসিড যে বাতে উপকারী তা বহুকাল আগেই অনেকে জানত। কিন্তু উদ্ভিজ্জ কাঁচামাল থেকে এটি তৈরি করা যেমন কঠিন তেমন ব্যয়বহুল ছিল। কেবল ১৮৭৪ সালেই ফিনল থেকে সেলিসিলিক অ্যাসিড তৈরির একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হল।

এ দিয়ে আজকাল অনেক ঔষধই তৈরি হচ্ছে, আর অ্যাস্পিরিনের নাম তো সকলেরই জানা। নিয়মানুসারে ঔষধের 'জীবনকাল' নাতিদীর্ঘ: পুরানো ঔষধ নতুনতর, রোগ-সারানোর পক্ষে আরও ভাল, আরও উন্নত ঔষধে প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু অ্যাস্পিরিন এর অনন্য ব্যতিক্রম। প্রতি বছরই এর নতুন, পূর্ব-অজ্ঞাত, বিস্ময়কর গুণাবলী আবিষ্কৃত হচ্ছে। অ্যাস্পিরিন এখন কেবল জ্বর ও বেদননাশীই নয়, এর প্রয়োগ-পরিধি বহুব্যাপ্ত।

পিরামিডন আরও একটি সর্বজনজ্ঞাত পুরানো ঔষধ। এর জন্মসাল ১৮৯৬।

আজকাল রাসায়নিকদের হাতে হররোজই কয়েকটি করে নতুন ঔষধ সংশ্লেষিত হচ্ছে, যেগুলি সর্বরোগহর গুণে গুণী। বেদনানাশ থেকে মানসিক রোগনিরাময় অবধি এদের কার্যকারিতার সীমানা প্রসারিত।

মানুষকে রোগমুক্ত করার চেয়ে মহত্তর কাজ রাসায়নিকের পক্ষে আর কী হতে পারে! কিন্তু কাজটি মোটেই সহজ নয়।

জার্মান রাসায়নিক পল এরলিখ 'স্লিপিং সিকনেস'-এর একটি ঔষধ সংশ্লেষের চেষ্টা করে করে বছরের পর বছর কেবলই হয়রান হচ্ছিলেন। প্রতিবারই কিছু কিছু ফল ফলছিল, কিন্তু এরলিখের তা মনঃপুত হয় নি। ৬০৬তম চেষ্টায় তিনি এর নিদান আবিষ্কারে সফল হলেন। তিনি এর নাম দিলেন সালভারসান। এর কল্যাণে লক্ষ লক্ষ লোক শুধু 'স্লিপিং সিকনেস' থেকেই নয়, সিফিলিসের মতো ধোঁকাবাজ রোগ থেকেও রেহাই পেল। এরলিখ ৯১৪তম চেষ্টায় আরও শক্তিশালী একটি ঔষধ আবিষ্কার করলেন, নাম: নিয়োসালভারসান।

রাসায়নিকের ফ্লাস্ক থেকে ঔষধালয়ের ডেস্ক অবধি পেঁছিতে একটি ঔষধকে দীর্ঘ পথ পার হতে হয়। যে-ঔষধ সর্বতোভাবে পরীক্ষিত, পুনঃপরীক্ষিত হয় নি, তার ব্যবস্থাপত্রভুক্তি চিকিৎসাশাস্ত্রের রীতিবিরুদ্ধ। এই নিয়ম খেলাপে করুণ বিপর্যয় ঘটতে পারে। খুব বেশি দিনের কথা নয়, পশ্চিম জার্মানির ঔষধ-প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান একটি নিদ্রাকর্ষী ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচার করে। এর নাম থেলিডোমাইড। এর একটি ছোট বড়িতে স্থায়ী নিদ্রাহীনতার রোগীও গভীর ঘুমে ঢলে পড়ত। থেলিডোমাইডের প্রশংসা আকাশসমান উঁচু হয়ে উঠল। কিন্তু শেষে দেখা গেল, ঔষধটি অজাত শিশুদের মারাত্মক শত্রু। লক্ষ লক্ষ বিকলাঙ্গ শিশু — যথাযথ সতর্কভাবে পরীক্ষা না করে ঔষধ ব্যবহারের এই তো ফল।

তাই, কোন ঔষধে কোন রোগ নিরাময় হয়, শুধুমাত্র এটুকু জানাই রাসায়নিক ও চিকিৎসকের পক্ষে যথেষ্ট নয়, এটি কীভাবে কাজ করে, রোগের সঙ্গে সংগ্রামে এর রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধরন কী, তা জানাও তাঁদের জন্য অপরিহার্য।

এখানে একটি ছোট দৃষ্টান্ত উল্লিখিত। বার্বিচুরিক অ্যাসিডের উৎপাদগুলি বর্তমানে নিদ্রাকর্ষী ঔষধে ব্যবহৃত। অ্যাসিডটি কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর যোগ। তা ছাড়াও এর একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে দু'টি আলকাইল দল যুক্ত; এগুলি হাইড্রোকার্বন অণু, যেগুলি একটি করে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বঞ্চিত। রাসায়নিকরা এখন জানেন যে, আলকাইল দলে অন্যূন চারটি কার্বন পরমাণু থাকলেই বার্বিচুরিক অ্যাসিড নিদ্রাকর্ষী, আর কার্বন পরমাণুর সংখ্যা যত বেশি ঔষধটির প্রতিক্রিয়াও তত দ্রুত আর দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বিজ্ঞানীরা রোগের যত গভীরে প্রবেশ করেন, রাসায়নিকরাও গবেষণার তত বেশি সুযোগ পান। বিবিধ ঔষধ তৈরি এবং নানা রোগনিরাময়ে তার সুপারিশই একদা যে ঔষধ-প্রস্তুতিবিদ্যার প্রধান কাজ ছিল, আজ তা ক্রমেই যথার্থ বিজ্ঞানে

রূপান্তরিত হচ্ছে। আধুনিক ঔষধ-প্রস্তুতিবিদের একাধারে রাসায়নিক, জীববিদ, চিকিৎসক ও জৈবরাসায়নিক হওয়া উচিত, যাতে থেলিডোমাইড ট্রাজেডির আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ঔষধ সংশ্লেষ রাসায়নিকদের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব, তাঁরা নতুন প্রকৃতির স্রষ্টা।

...আমাদের শতাব্দীর শুরুতে নতুন রঙ তৈরিতেই রাসায়নিকরা অধিকতর নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁরা এক্ষেত্রে সালফানিলিক অ্যাসিডকেই কাঁচমাল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এর অণু অত্যন্ত নম্য অর্থাৎ বিবিধ পর্যায়ে পুনর্বিন্যাসক্ষম। রাসায়নিকদের ভাবনা, যদি তাই হয়, তবে বিশেষ অবস্থায় সালফানিলিক অ্যাসিডের অণুকে মূল্যবান রঙের অণুতে রূপান্তরিত করা যাবে না কেন?

আর ঠিক তাই ঘটল। কিন্তু সংশ্লেষিত সালফানিলিক রঙ যে একই সঙ্গে একটি সম্ভাবনাশীল ঔষধও তা ১৯৩৫ সালের আগে মোটেই কারও মনে আসে নি। শেষে রঙ-সন্ধানের সেই প্রেক্ষাপট অস্পষ্ট হয়ে এল আর রাসায়নিকরা এ থেকে নতুন এক ঔষধের উৎস খুঁজে পেলেন। এর সাধারণ নাম সালফোনিলামাইড। এদের মধ্যে উল্লেখ্য: সালফাপাইরিডিন, স্ট্রেপটোসিড, সালফামিথাইলথিয়াজোল ও সালফামেজাথিন। জীবাণুনাশী রাসায়নিক যৌগাবলীর মধ্যে সালফোনিলামাইড অন্যতম উল্লেখ্য নাম।

...দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা এক ধরনের মারাত্মক বিষ — কুচিলা, তীরে ব্যবহার করত। স্ট্রিকন্যাস টক্সিফেরা নামের একটি বড় লতার রস থেকে বিষটি তৈরি হত। এতে ডুবানো তীর শত্রুকে আঘাত করা মাত্র তার মৃত্যু ঘটত।

কেন? এর উত্তর দিতে রাসায়নিকদের বিষরহস্য সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে হয়েছে।

তাঁরা দেখলেন টিউবোকিউরারিন নামক উপক্ষারই এই বিষের প্রধান বিকারক। এটি দেহে ঢুকলেই পেশীগুলি সংকোচন-ক্ষমতা হারিয়ে অনড় হয়ে পড়ে। এরই ফলে শ্বসন ক্রিয়া প্রহত হয় ও মৃত্যু ঘটে।

তাসত্ত্বেও দেখা গেল, ক্ষেত্রবিশেষে বিষটিতে উপকার পাওয়াও সম্ভব। কোন কোন জটিল অস্ত্রোপচারে তা সার্জনদের সহায়ক। হৃৎপিন্ড অস্ত্রোপচারে কৃত্রিম শ্বাস চালু করার সময় শ্বসন-পেশীগুলি শ্লথ করার জন্য আজ তা ব্যবহৃত। জীবান্তক শত্রুটি এখন বন্ধু। নিদানিক চিকিৎসায় টিউবোকিউরারিনের ব্যবহারও আসন্ন।

কিন্তু তা আজও মহার্ঘ। এর চেয়ে সস্তা, সহজলভ্য কিছু প্রয়োজন।

এবারও রাসায়নিকরা এগিয়ে এলেন। তাঁরা টিউবোকিউরারিন অণুকে সর্বতোভাবে পরীক্ষা করলেন, একে নানাদিক থেকে ভাঙলেন এবং পাওয়া

'টুকরোগুলি' পরীক্ষা করলেন। ধীরে ধীরে এর রাসায়নিক সংস্থিতি আর শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়ার পারম্পর্য স্পষ্টতর হল। তাঁরা দেখলেন এর কার্যকারিতা ধনাত্মক আধানযুক্ত নাইট্রোজেন পরমাণুধারী কয়েকটি পুঞ্জের উপর নির্ভরশীল এবং এ সকল পুঞ্জের সুনির্দিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান থাকা খুবই প্রয়োজনীয়।

এবার রাসায়নিকরা প্রকৃতির অনুকরণ করা ও তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কাজে নামলেন। শুরুতে তাঁরা এমন একটি উপকরণ হাতে নিলেন যা টিউবোকিউরারিনের চেয়ে কিছুমাত্র কম সক্রিয় নয়। অতঃপর, তাঁরা একে উন্নততর করার চেষ্টা শুরু করলেন। ফল ফলল। এল টিউবোকিউরারিনের দ্বিগুণ সক্রিয় সিনকিউরিন।

ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও এরই হুবহু পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। প্রাকৃতিক উপক্ষার কুইনিন এর ঔষধ। কিন্তু রাসায়নিকরা কুইনিনের চেয়ে ষাটগুণ সক্রিয়তর একটি উপকরণ তৈরিতে সমর্থ হন। এর নাম পামাকুইন, কখনও বলা হয় প্লাজমোকুইন।

বর্তমান ঔষধভাণ্ডার ঔষধে ঔষধে বোঝাই। সকল অবস্থায়, জ্ঞাত প্রায় সকল রোগের নিদানই এতে মিলবে।

সবচেয়ে খিটমিটে স্বভাবের লোকটির স্নায়ুতন্ত্রী প্রশমনের শক্তিশালী ঔষধও আছে। আছে ভয়নাশী ঔষধ। অবশ্য কোন ছাত্রের পরীক্ষাভীতি দূরীকরণে এটি নিষ্ফল প্রমাণিত হবে।

বিরক্তিনাশী পুরো এক প্রস্ত ঔষধেরই একটি অ্যামিনাজিন। একদা এটি এক ধরনের মানসিক বৈকল্যে (সিজোফ্রেনিয়া) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। মানসিক বৈকল্যে রাসায়নিক চিকিৎসা আজ অপরিহার্য নিদান।

কিন্তু চিকিৎসা-রসায়নে সব সময়ই যে সুফল ফলেছে তা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে অশুভ (আর কীই-বা একে বলা যায়) এল-এস-ডি-২৫ উল্লেখ্য।

বহু পুঁজিবাদী দেশেই এটি নিদ্রাকর্ষী ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত। এতে কৃত্রিম সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণাদি (কিছুকাল 'অস্তিত্বের যন্ত্রণা' বিস্মৃত হবার মতো অলীক অবস্থা সৃষ্টি) প্রকটিত হয়। কিন্তু এল-এস-ডি-২৫ খাবার পর আর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে নি, এমন ঘটনার নজির মোটেই দুষ্প্রাপ্য নয়।

বর্তমান পরিসংখ্যানুসারে হৃৎপিণ্ডের 'স্ট্রোক' এবং মস্তিষ্কের সন্ন্যাসই অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ। রাসায়নিকরা হৃৎপিণ্ড-বলকারক ও গুরুমস্তিষ্কের রক্তনালী প্রসারক বিবিধ ঔষধ আবিষ্কার করে এ সকল রোগ মোকাবিলায় সচেষ্ট।

রাসায়নিক ও চিকিৎসক সংশ্লেষিত টুবাজিড ও পারা-এমিনোসেলিসিলিক অ্যাসিডের (পি-এ-এস-এ) কল্যাণে এখন অধিকাংশ যক্ষ্মারোগীই আরোগ্যলাভ করছেন।

মানবজাতির মর্মান্তিক যন্ত্রণার হেতুরূপী ক্যানসারের নিদান আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে আজও বহুবিধ প্রকট অস্পষ্টতা বিধায় আরও গবেষণা অপরিহার্য।

চিকিৎসকরা অলৌকিক নিদানের জন্য রাসায়নিকদের দিকেই তাকিয়ে আছেন। আর এ প্রতীক্ষা অবশ্যই বৃথা নয়। রসায়ন যে আগের মতো এখানেও 'অঘটন ঘটাবে' এতে সন্দেহ নেই।

অলৌকিক ছত্রাক

কথাটি অনেককাল থেকেই চিকিৎসক আর অণুজীববিদরা জানতেন এবং বিশেষ গ্রন্থাবলীতে তা উল্লিখিতও আছে। কিন্তু জীববিদ্যা বা চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তির কাছে কিছুকাল আগেও তা একেবারেই অর্থহীন ছিল। আর খুব বেশিসংখ্যক রাসায়নিকও কথাটি জানতেন না। আজ এটি সকলেরই জানা। শব্দটি 'অ্যান্টিবায়োটিক্স'।

সাধারণ মানুষ 'অ্যান্টিবায়োটিক্স' শব্দটি জানার আগে 'জীবাণু' শব্দটি জেনেছে। অনেকগুলি রোগ যেমন, নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, আমাশয়, টাইফাস, যক্ষ্মা প্রভৃতি যে জীবাণুঘটিত তা সঠিকভাবেই নির্ধারিত হয়েছিল। এসব জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামে অ্যান্টিবায়োটিক্স ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

কোন কোন ছত্রাকের আরোগ্যমূলক গুণাগুণ মধ্যযুগেও জানা ছিল। সন্দেহ নেই মধ্যযুগীয় অ্যাসকুলাপি প্রত্যয়টি অত্যন্ত অদ্ভুত। সেকালের ধারণানুযায়ী ফাঁসী বা অন্যভাবে প্রাণদণ্ডে নিহত অপরাধীর করোটির ছত্রাকেই শুধু ভেষজের জাদু থাকত।

কিন্তু এর উল্লেখ্য কোন তাৎপর্য নেই। ব্রিটিশ রাসায়নিক আলেকজান্ডর ফ্লেমিং যে তাঁর পরীক্ষাধীন একটি ছত্রাক প্রজাতি থেকে বিকারক উপাদান পৃথকীকরণে সফল হয়েছিলেন, এটিই আসল কথা। এ থেকেই এল পেনিসিলিন, আমাদের প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।

স্ট্রেপটোকক্কাই, স্টেফাইলোকক্কাই ইত্যাকার রোগজীবাণুদের বিরুদ্ধে পেনিসিলিনের চমৎকার কার্যকারিতা প্রমাণিত হল। এমন কি স্পাইরোকিটা পেলিডা নামের সিফিলিস জীবাণুও এতে মারা পড়ল।

যদিও আলেকজান্দর ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন, তবু এর সঙ্কেত নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৭ সাল অবধি পরীক্ষাগারে

পুরোপুরিই এর সংশ্লেষ শুরু হয়। মনে হল, যেন মানুষ প্রকৃতিকে শেষাবধি মুঠোয় পুরেছে। কিন্তু আসলে তা নয়। পেনিসিলিনের পরীক্ষাগার-সংশ্লেষ অত্যন্ত দুরূহ। ছত্রাক থেকে এর উৎপাদনই বরং সহজতর।

কিন্তু রাসায়নিকরা অবদমিত হবার পাত্র নন। এখানেও তাঁদের নিজস্ব বক্তব্য ছিল এবং তার যাথার্থ্যও প্রমাণিত হল। যে-ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন তৈরি হত তার 'উৎপাদন' ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত, আর বিজ্ঞানীরা তার ক্ষমতা বাড়ানোর কাজে নামলেন।

তাঁরা এমন পদার্থ পেলেন যা ছত্রাকটির বংশাণু-সংস্থায় প্রবিষ্ট হলে তার চারিত্র্য পরিবর্তন ঘটত। তা ছাড়া এই নবোদ্ভিন্ন চারিত্র্যও বংশানুসৃত হত। ফলত, পাওয়া গেল পর্যাপ্ত পেনিসিলিন উৎপাদনক্ষম নতুন জাতের একটি ছত্রাক।

আজ অ্যাণ্টিবায়োটিকের তালিকা আকর্ষণীয়ভাবে ভারি: স্ট্রেপটোমাইসিন ও টেরামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন ও অরিওমাইসিন, বায়োমাইসিন ও ইরিথ্রমাইসিন। সবমিলিয়ে এখন অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের সংখ্যা হাজারে পেঁছেছে আর এদের একশ'টি নানা রোগ-চিকিৎসায় ব্যবহৃত। এদের প্রস্তুতিতে রসায়নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

অণুজীববিদরা তরল খাদ্যমাধ্যমে জীবাণুচাষ আয়ত্ত করার পরপরই রাসায়নিকরা কাজটির ভার নিয়েছেন।

অ্যাণ্ডিবায়োটিক — 'বিকারক উপাদান' পৃথকীকরণ তাঁদেরই কাজ। প্রাকৃতিক 'কাঁচামাল' থেকে এই জটিল জৈব যৌগ নিষ্কাশনের জন্য বিবিধ রাসায়নিক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। বিশেষ ধরনের বিশোষক অ্যাণ্টিবায়োটিক শোষণ করে। গবেষকরা সেজন্য 'রসায়নিক সাঁড়াশি' ব্যবহার করেন অর্থাৎ বিবিধ দ্রাবক দিয়ে অ্যাণ্টিবায়োটির নিষ্কাশন করেন। অতঃপর, আয়ন-পরিবর্তক রজনের সাহায্যে এগুলিকে শোধন ও দ্রব থেকে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। এভাবে সংগৃহীত কাঁচা অ্যাণ্টিবায়োটিক শোধনের এক দীর্ঘ চক্রে প্রযুক্ত হলে শেষাবধি তা শুদ্ধ, কেলাসিত পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

এদের কোন কোনটি, যেমন পেনিসিলিন আজও ছত্রাক থেকেই সংশ্লেষিত হয়। কিন্তু অন্যগুলির উৎপাদনে প্রকৃতির অবদান অর্ধেক।

কিন্তু এমনও অ্যাণ্টিবায়োটিক আছে যার পুরোটাই রাসায়নিকদের হাতে তৈরি। প্রকৃতির অবদান সেখানে শূন্যের কোঠায়। এগুলি শুরু থেকে শেষাবধি রাসায়নিক কারখানায়ই সংশ্লেষিত, যথা: সিনথমাইসিন।

শক্তিশালী রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে 'অ্যাণ্টিবায়োটিক' শব্দটি কখনই এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত হত না, ঘটত না চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যাণ্টিবায়োটিকসের এমন আশ্চর্য একটি বিপ্লব।

পরাণু-মৌল: উদ্ভিদের ভিটামিন

'মৌল' শব্দটি বিবিধার্থক। এতে বস্তুর একই নিউক্লীয় আধানযুক্ত পরমাণু বুঝাতে পারে। কিন্তু পরাণু-মৌল কী? এটি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের অত্যল্প মাত্রার রাসায়নিক মৌল। মানবশরীরে ৬৫ শতাংশ অক্সিজেন, প্রায় ১৮ শতাংশ কার্বন ও ১০ শতাংশ হাইড্রোজেন আছে। এগুলি বৃহৎ-মৌল, কারণ এরা বহুল পরিমাণে অবস্থিত। কিন্তু টিটানিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এখানে পরাণু-মৌল, পরিমাণে এরা সামান্য, প্রত্যেকে শতাংশের হাজার ভাগের একভাগ মাত্র।

জৈবরসায়নের জন্মকালে এ সব তুচ্ছ ব্যাপার কারও চোখে পড়ে নি। শতাংশের হাজার ভাগের একভাগ নিয়ে মাথা ঘামানোর কীই-বা থাকতে পারে কিংবা আরও সঠিকভাবে বললে, এত সামান্য মাত্রা সেকালে পরিমাপসাধ্যই ছিল না।

ইঞ্জিনিয়রিং এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতির ক্রমোন্নতি বিজ্ঞানীদের জীবদেহে নতুন নতুন মৌলের সন্ধান দিয়েছে। তাসত্ত্বেও পরাণু-মৌলের ভূমিকা দীর্ঘকাল অজ্ঞাতই ছিল। এমন কি রাসায়নিক বিশ্লেষণেও কোন বস্তুর অন্তর্গত অপবস্তুর দশ লক্ষ কিংবা দশ কোটি ভাগের একভাগ পরিমাণ জানা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন-কর্মকাণ্ডে বহু পরাণু-মৌলের ভূমিকা আজও অনির্ণীত।

কিন্তু এ সম্পর্কে আজ কিছু কিছু তথ্যাদি প্রমাণিত হয়েছে, যথা আমরা জানি যে. বহু জীবের শরীরেই কোবাল্ট, বোরন, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, ভেনেডিয়াম. আয়োডিন. ফ্লোরিন, মোলিব্‌ডেনাম, দস্তা এমন কি... রেডিয়াম অবধি বর্তমান। তাই, রেডিয়ামও রয়েছে, তবে পরাণু-মৌল হিসেবেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানবদেহে ৭০টি মৌল অদ্যাবধি চিহ্নিত হয়েছে। এবং সেখানে পুরো পর্যায়বৃত্ত সারণীর সম্ভাব্য অস্তিত্বও নানা কারণে বিশ্বাস্য। এখানে প্রতিটি মৌলের স্বকীয় ভূমিকা সুনির্দিষ্ট। বহু বৈকল্যই যে জীবদেহে পরাণু-মৌলের বিঘ্নিত ভারসাম্যের জন্য, তেমন একটি ধারণাও প্রচলিত আছে।

উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে লৌহ আর ম্যাঙ্গানিজের ভূমিকা বিশিষ্ট। বিন্দুমাত্র লৌহ নেই এমন মাটিতে কোন চারা জন্মালে এর কাণ্ড ও পাতা কাগজের মতো সাদা দেখাবে। কিন্তু চারাটির উপর যদি লৌহ-লবণ ছড়ানো হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্বাভাবিক সবুজ রঙ ফিরে পাবে। তাম্রও সালোকসংশ্লেষে অপরিহার্য। এটি উদ্ভিদের নাইট্রোজেন যৌগ আত্মীকরণের সহায়ক। তাম্র ঘাটতির জন্য উদ্ভিদের প্রোটিন সংশ্লেষে বিঘ্ন ঘটে, কারণ নাইট্রোজেন প্রোটিনের অন্যতম. মৌল অনুষঙ্গ।

মোলিব্‌ডেনামের বহু জটিল জৈব যৌগ বিবিধ উৎসেচকের উপাদান। এগুলি

নাইট্রোজেন আত্মীকরণেরও উন্নেতা। মোলিব্ডেনাম ঘাটতির জন্য পাতায় পোড়া দাগ দেখা দেয়। সেখানে অধিক নাইট্রেট সঞ্চয়ই এর কারণ, যা মোলিব্ডেনামের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদে আত্মীভূত হয় না। মোলিব্ডেনাম উদ্ভিদের ফসফরাস পরিমাণকেও প্রভাবিত করে। এর অনুপস্থিতিতে অজৈব ফসফেট জৈব ফসফেটে রূপান্তরিত হয় না। মোলিব্ডেনামের ঘাটতি উদ্ভিদের বর্ণকণিকা (রঞ্জক পদার্থ) সঞ্চয়কেও প্রভাবিত করে; পাতাগুলি তিলকিত, বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

বোরন না থাকলে ফসফরাস গ্রহণে উদ্ভিদের অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়। উদ্ভিদের দেহতন্ত্রে বিবিধ শর্করা সঞ্চালনেও বোরন বিশেষ সহায়ক।

প্রাণীজীবনেও পরাণু-মৌলের ভূমিকা উল্লেখ্য। দেখা গেছে খাদ্যে ভেনেডিয়ামের অভাবে প্রাণীর ক্ষুধামান্দ্য ঘটে, এমন কি তা জীবান্তকও হতে পারে। পক্ষান্তরে, শূকরের খাদ্যে ভেনেডিয়াম বাড়ালে তাদের বৃদ্ধি ত্বরিত হয় এবং চর্বির ঘনত্ব বাড়ে।

দস্তাও বিপাকক্রিয়ার অন্যতম অনুষঙ্গ এবং প্রাণীর রক্তকণিকার উপাদান।

প্রাণী (মানুষও) উত্তেজিত হলে তার লিভার থেকে ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, টিটানিয়াম ও তাম্র রক্তপ্রবাহে নিঃসারিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বাধা দিলে কেবল ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র ও টিটানিয়ামই নির্গত এবং সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম প্রত্যাহৃত হয়। লিভার ছাড়াও রক্তের পরাণু-মৌলের পরিমাণ গুরুমস্তিষ্ক, কিডনি, ফুসফুস ও পেশীনিয়ন্ত্রিত।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধি ও বিকাশে পরাণু-মৌলের ভূমিকাব্যাখ্যা রসায়ন ও জীববিদ্যার অন্যতম গুরুপূর্ণ তথা রোমাঞ্চকর কর্মসূচি। এসব সমস্যার সমাধান অদূর ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে মূল্যবান ফল ফলাবে এবং দ্বিতীয় প্রকৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিজ্ঞানের সামনে নতুনতর পথ উন্মোচিত করবে।

উদ্ভিদের খাদ্য এবং রসায়নের কর্তব্য

এমন কি প্রাচীনকালেও রন্ধনবিশারদ বাবুর্চির অভাব ছিল না। রাজপ্রাসাদের টেবিল হরেক রকম সুস্বাদু খাদ্যে বোঝাই থাকত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের খাদ্যরুচিও ততদিনে বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত হয়েছে।

কিন্তু মনে হয় রুচির প্রশ্নে উদ্ভিদ এমন খুঁতখুঁতে স্বভাবের নয়। ঔষধি ও গুল্ম উষ্ণ মরু এবং মেরু-তুন্দ্রায়ও বেঁচেবর্তেই আছে। দেখতে তারা হয়ত বেঁটেখাটো, বিষ্টব্ধ, আর জৌলুসহীন, কিন্তু তবু তো তারা টিকে আছে।
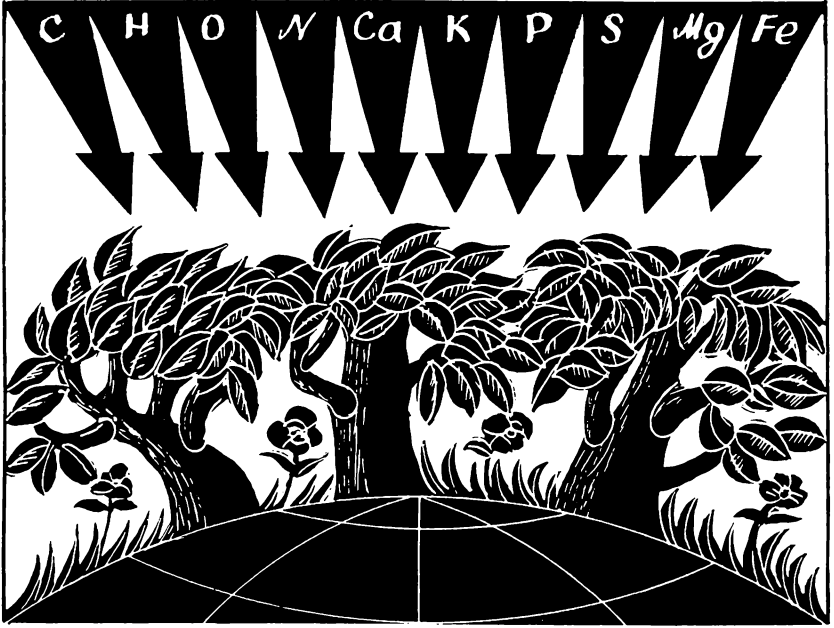
তাদের বিকাশের জন্য কিছু একটা যেন প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু কী? এই 'কী' সন্ধানেই বিজ্ঞানীদের অনেক বছর কেটে গেছে। তাঁরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তর্ক-বিতর্ক করলেন, কিন্তু বৃথাই।

উত্তরটি শেষে জানা গেল বিগত শতকের মাঝামাঝি, বিখ্যাত জার্মান রাসায়নিক জাস্টাস ফন লিবিগের কাছ থেকে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ তাঁর হাতিয়ার ছিল। তিনি অনেকগুলি গাছ-গাছড়াকে তাদের মৌল উপাদানে 'ভেঙ্গে' ফেললেন। শুরুতে তাদের সংখ্যা তেমন কিছু বেশি ছিল না। সর্বমিলিয়ে মাত্র দশ: কার্বন ও হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম, ফসফরাস ও গন্ধক, ম্যাগ্নেসিয়াম ও লৌহ। কিন্তু এই দশটি মৌল থেকেই কি পৃথিবীর বিশাল পল্লবরাজ্যের উদ্ভব?

এ থেকেই জানা গেল উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য কোন না কোনভাবে এই দশটি মৌলের 'আহার' অপরিহার্য।

কিন্তু কীভাবে? গাছপালার খাদ্যভাঁড়ার কোথায়?

নিশ্চয়ই মাটি, জল আর বাতাসে।

কিন্তু কিছু অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা তখনও বাকি ছিল। কোন কোন মাটিতে গাছ দ্রুত বাড়ে, ফুল ধরে, ফল ফলায়। কিন্তু অন্যত্র তা নুয়ে পড়ে, শুকিয়ে যায়, উদ্ভট রুগ্ণ আকার ধারণ করে। সন্দেহ নেই শেষোক্ত মাটিতে মৌলবিশেষের ঘাটতিই এর কারণ।

লিবিগের অনেক আগেই জানা ছিল যে, কোন জমিতে একই ফসল বার বার চাষ করলে উর্বরতম মাটিতেও ক্রমান্বয়ে খারাপ ফসল ফলে।

মাটির উর্বরতাশক্তি ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে আসে। গাছপালা মাটি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মৌলের সবটুকুই 'চেটেপুটে' শেষ করে ফেলে।

তাই, মাটিকে 'খাবার' দেওয়া জরুরী হয়ে ওঠে। যাকিছু পদার্থ সে হারিয়েছে পুনর্স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। অথবা প্রচলিত ভাষায় বলা যায়, একে উর্বরা করতে হয়। একেবারে আদিকালেই সার-ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে পাওয়া অভিজ্ঞতায় মানুষ সঠিক কিছু না বুঝেই জমিতে সার ব্যবহার করত।

লিবিগ জমির সার-ব্যবহারকে বিজ্ঞান-পর্যায়ে উন্নীত করেন। এর নাম কৃষি-রসায়ন। রসায়ন এবার চাষাবাদের সেবায় নিযুক্ত হল। জানা সারের সঠিক ব্যবহার শেখান ও নতুন সার উদ্ভাবনের দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত হল।

আজ নানা ধরনের বহুসংখ্যক সারের কথা আমরা জানি। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য: পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও ফসফেট জাতীয় সার, কারণ এই মৌলত্রয় ব্যতিরেকে কোন পাছপালাই জন্মায় না।

একটি সামান্য তুলনা:
কীভাবে রাসায়নিকরা
গাছপালাকে পটাসিয়াম খাওয়া শেখালেন

...আজকের বিখ্যাত ইউরেনিয়াম একদা রসায়নের এক কানাগলির অন্ধকারে বসবাস করত। কাচের রঙ আর ফটোগ্রাফির বাইরে তার কোন কদর ছিল না। শেষে ইউরেনিয়ামের ঘরে রেডিয়ামের খোঁজ মিলল। হাজার হাজার টন ইউরেনিয়াম আকরিক ঘেঁটে অতি সামান্য একটু রুপালী ধাতু পাওয়া যেত, আর ইউরেনিয়াম-ভরা বর্জ্য পড়ে থাকত আবর্জনার ভাগাড়ে। অবশেষে, ইউরেনিয়ামের দিন ফিরল, যখন দেখা গেল আণবিক শক্তির চাবিটি এতেই বাঁধা পড়ে আছে। বর্জ্য সম্পদ হল।

...জার্মানির স্টাসফোর্ট লবণখনি খুবই প্রাচীন। এর হরেক রকম লবণের মধ্যে পটাসিয়াম ও সোডিয়ামের লবণ বিশেষ উল্লেখ্য। সোডিয়াম লবণ ভোজ্য, তাই এর ব্যবহারে কালবিলম্ব ঘটল না। কিন্তু নির্দ্বিধায় বর্জিত হল পটাসিয়ামের লবণ, আর তারই সঞ্চয়ে খনির আশেপাশে পাহাড় জমে উঠল। এর ভবিতব্য কেউ জানত না। কৃষিতে পটাসিয়ামের জরুরী প্রয়োজন সত্ত্বেও ম্যাগ্নেসিয়ামপৃক্ত থাকায় স্টাসফোর্ট বর্জ্য সেখানেও ব্যবহার্য ছিল না। অল্প পরিমাণ ম্যাগ্নেসিয়াম গাছ-গাছড়ার পক্ষে উপকারী হলেও এর মাত্রাধিক্যে মারাত্মক ক্ষতি ঘটত।

রসায়ন আবারও নিদানের কাণ্ডারী হল। পটাসিয়াম লবণ থেকে ম্যাগ্নেসিয়াম অপসারণের এক সহজ পদ্ধতির সন্ধান মিলল, আর বাসন্তী তুষারের মতো স্টাসফোর্ট খনির আশপাশের পাহাড়গুলিও ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পটাসিয়াম লবণ শোধনের প্রথম কারখানাটি নির্মিত হয় জার্মানিতে, ১৮১১ সালে। বছর ঘুরতেই এই সংখ্যা চারে পৌঁছেছিল। ১৮৭২ সালে জার্মানিতে ৩৩টি কারখানায় বছরে ৫ লক্ষ টনের বেশি এই মিশ্রলবণ শোধিত হচ্ছিল।

অচিরেই বহু দেশে পটাসিয়াম সার-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল। আজ বহুদেশে পটাসিয়াম লবণের উৎপাদন ভোজ্য লবণের চেয়েও বহুগুণ বেশি।

‘নাইট্রোজেন সংকট’

নাইট্রোজেন আবিষ্কারের প্রায় শতবর্ষ পর জনৈক বিখ্যাত অণুজীববিদ লিখেছিলেন: ‘সাধারণ জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নাইট্রোজেন দুর্লভতম বরধাতুর চেয়েও মূল্যবান।’ তাঁর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ছিল। বস্তুতপক্ষে, প্রাণী ও উদ্ভিদ-নির্বিশেষে নাইট্রোজেন সকল প্রোটিন-অণুরই উপাদান। নাইট্রোজেন ছাড়া প্রোটিন নেই, প্রোটিন ছাড়া প্রাণ নেই। এঙ্গেলসের ভাষায় ‘প্রাণ প্রোটিনবিশেষেরই অনুষঙ্গ’।

প্রোটিন অণু তৈরির জন্য উদ্ভিদের পক্ষে নাইট্রোজেন অপরিহার্য। কিন্তু এটি মিলবে কোথায়? নাইট্রোজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাত্রা খুবই কম এবং সাধারণ অবস্থায় তা বিক্রিয়ালিপ্ত হয় না। এজন্য বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের নাগালের বাইরে। সত্যি, এখানে ‘সাধ ও সাধ্যির’ মধ্যে দুস্তর ফারাক। তাই গাছের নাইট্রোজেন পুঁজির সবটুকুই মাটিতে। আর আফসোস তাও অতি সামান্য। সেখানে নাইট্রোজেন-যৌগের সংখ্যা খুবই কম। সেজন্য মাটির নাইট্রোজেন কেবলই দ্রুত উবে যায়, তাতে নাইট্রোজেন সার দিতে হয়।

'চিলি-সোরা' নামটি এখন ইতিহাসাশ্রিত। অথচ প্রায় ৭০ বছর আগেও তা বহুলালোচিত বিষয় ছিল।

চিলি প্রজাতন্ত্রের আতাকামা মরুর বিমুখ প্রান্তরটি কয়েক শ' কিলোমিটার বিস্তৃত। প্রথম দৃষ্টিতে একে সাধারণ মরু বলেই মনে হয়। কিন্তু কিছু বৈশিষ্ট্যে এটি পৃথিবীর মরুরাজ্যে অনন্য: হালকা বালুর নিচে এখানে সোরা অর্থাৎ সোডিয়াম নাইট্রেটের গভীর ঘন আস্তর ছড়ান। খনিজটির সন্ধান বহুকাল আগেই সকলে জানত। কিন্তু সম্ভবত ইউরোপে বারুদের ঘাটতি পড়ার পরই এ সম্পর্কে প্রথম ঔৎসুক্য দেখা দিয়েছিল। স্মরণীয়, ইতিপূর্বে পোড়াকয়লা, গন্ধক আর সোরা দিয়েই বারুদ তৈরি হত।

সাগরপারের সেই বস্তুটি সংগ্রহের জন্য অচিরেই এক অভিযাত্রীদল সেখানে পেঁছিল। কিন্তু পুরো জাহাজ-বোঝাই মালটুকু শেষে সাগরেই ঢেলে দিতে হল। দেখা গেল, কেবল পটাসিয়াম সোরাই বারুদে ব্যবহার্য। সোডিয়াম সোরা বাতাস থেকে অঢেল জলীয়বাষ্প শুষে বারুদকে ভিজিয়ে তোলে, তা অব্যবহার্য হয়ে ওঠে।

ইউরোপীয়েরা এই প্রথমবারই জাহাজ-বোঝাই মাল সাগরে ঢালে নি।

কিন্তু চিলি সোরার এমন পরিণতি ঘটল না। দেখা গেল এটি প্রকৃতির দয়ার্দ্র এক আশ্চর্য সারবিশেষ। সেকালে দ্বিতীয় আর কোন নাইট্রোজেন-সার মানুষের জানা ছিল না। চিলির খনিতে ব্যাপক কাজ শুরু হল। ইকুয়েকুয়ে বন্দরে জাহাজের ভিড় জমল। সারা দুনিয়ায় এই মূল্যবান সার চালান হতে লাগল।

১৮৯৮ সালে স্যর উইলিয়ম ক্রুক্সের এক প্রাজ্ঞ ভবিষ্যদ্বাণীতে সারা পৃথিবীর মানুষ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর একটি বক্তৃতায় তিনি নাইট্রোজেন অভাবে মানবজাতির নিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনার আভাস দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, খেতগুলি ফসলের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরই নাইট্রোজেন হারাচ্ছে আর চিলি সোরার খনিও উজাড়প্রায়। আতাকামা মরুর সম্পদ তো সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ।

আর তখনই বিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের কথা ভাবলেন। যে-মানুষটি এই অফুরন্ত ভাণ্ডারের দিকে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি সম্ভবত বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী ক. তিমিরিয়াজেভ। মানুষ ও মানুষের প্রতিভায় তাঁর অফুরান আস্থা ছিল। ক্রুক্সের আশঙ্কার তিনি অংশভাগী হন নি। মানুষ যে নাইট্রোজেন সংকট অতিক্রম করবে, এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাবে, এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। তাঁর আশাবাদ অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯০৩ সালের মধ্যেই দুজন নরওয়েবাসী — বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান বির্কল্যান্ড ও ইঞ্জিনিয়র স্যামুয়েল এইদে বৈদ্যুতিক চাপে বাতাস-নাইট্রোজেন সংবন্ধনের শিল্পভিত্তিক কৌশল আবিষ্কার করেন।

প্রায় একই সময়ে জার্মান রাসায়নিক ফ্রিট্স হাবার নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন। এতেই উদ্ভিদ পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য সংবন্দী নাইট্রোজেন সমস্যার সমাধান হল। আবহমণ্ডলে মুক্ত নাইট্রোজেনের কোন অভাব নেই। বিজ্ঞানীদের হিসাবে আবহাওয়ার পুরো নাইট্রোজেনটুকু সারে রূপান্তরিত হলে পৃথিবীর সমস্ত গাছপালাকে দশ লক্ষ বছরের বেশি সময় ধরে যথেষ্ট পুষ্ট রাখা যাবে।

ফসফরাস কেন?

জাস্টাস লিবিগ মনে করতেন, গাছ বাতাস থেকেই নাইট্রোজেন শোষণ করতে পারবে এবং মাটিতে শুধু পটাসিয়াম ও ফসফরাস দিলেই চলবে। কিন্তু এই মৌলদু'টিতে তাঁর ভাগ্য খুলল না। একটি ব্রিটিশ সংস্থা তাঁর 'পেটেণ্ট সার' তৈরির দায়িত্ব নিয়েছিল। কিন্তু তাতে ফসলের কোন উন্নতি হল না। শেষে লিবিগ নিজের

ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, তবে তা অনেক বছর পরে। তিনি অদ্রাব্য ফসফেট লবণ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল দ্রাব্য লবণ বৃষ্টিতে ধুয়েমুছে যাবে। কিন্তু দেখা গেল অদ্রাব্য ফসফেট থেকে ফসফরাস গ্রহণে উদ্ভিদ অক্ষম। তাই উদ্ভিদের জন্য 'অর্ধভুক্ত' মাল সরবরাহ না করে আর গত্যন্তর ছিল না।

প্রতি বছর দুনিয়াজোড়া ফসল মাটি থেকে যে ফসফরিক অ্যাসিড শোষণ করে তার পরিমাণ প্রায় এক কোটি টন। উদ্ভিদে ফসফরাসের প্রয়োজন কী? এ তো শর্করা বা চবির্র কোন উপকরণ নয়। এমন কি সকল প্রোটিন অণু, বিশেষত সরল অণুগুলিতেও এটি অনুপস্থিত। অথচ ফসফরাস না হলে এদের কোনটিই তৈরি হয় না।

সালোকসংশ্লেষ — উদ্ভিদের 'অঙ্গুলি হেলনে' নিষ্পাদিত কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে শর্করা উৎপাদনের সরল প্রক্রিয়াবিশেষ নয়। প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল। সালেকসংশ্লেষ ক্লোরোপ্লাস্টে সংঘটিত হয় এবং উদ্ভিদের কোষের এই বিশেষ 'প্রত্যঙ্গগুলি' এজন্যই নির্দিষ্ট। ক্লোরোপ্লাস্ট পর্যাপ্ত ফসফরাস যৌগে সমৃদ্ধ। স্থূলভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট প্রাণীর খাদ্য হজম ও আত্মীকারক উদরের সঙ্গে তুলনীয়, কারণ উদ্ভিদদেহের 'আদি কাঠাম' কার্বন ডাইঅক্সাইড আর জল নিয়েই এদের প্রত্যক্ষ কারবার।

উদ্ভিদ বাতাস থেকে ফসফরাস যৌগের সাহায্যেই কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। অজৈব ফসফেট কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কার্বনেট ঋণায়নে রূপান্তরিত করে এবং তা থেকেই তৈরি হয় পরবর্তী জটিল জৈবাণুসমূহ।

অবশ্য এতেই উদ্ভিদের জীবন-কর্মকাণ্ডে ফসফরাসের ভূমিকা অবসিত নয়। আর উদ্ভিদজীবনে এর গুরুত্বের সবটুকুই আমরা যথাযথভাবে জেনেছি, তা বলাও অসম্ভব। তবু যতটুকু আমরা জানি তাতেই বুঝা যায় যে উদ্ভিদজীবনে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রাসায়নিক যুদ্ধসজ্জা

এটি সত্যিই যুদ্ধ, যদিও কামান, ট্যাংক, রকেট অথবা কোন বোমা নিয়ে নয়। যুদ্ধটি 'নিঃশব্দেই' চলছে, বিশেষ কারও চোখে পড়ার মতো নয়, তবু শেষাবধি এতে প্রাণবলি অবধারিত। এই যুদ্ধজয়ে সকলের জন্যই সুখ আসবে।

গো-মাছি কি তেমন কিছু ক্ষতিকর? হিসাবমতো এক সোভিয়েত ইউনিয়নেই এর কৃতকর্মের খেসারত বছরে দশ লক্ষ রুবল। আর আগাছা? সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক খরচের পরিমাণ চারশ' কোটি ডলার। আর পঙ্গপাল? সে সত্যিকারের সর্বনাশা বিপর্যয়। এদের ছোঁয়ায় পুষ্পিত মাঠে নিষ্প্রাণ মরুর ঊষরতা

নামে। আগাছা আর পতঙ্গের হাভাতেপনায় সারা দুনিয়ার ফসলের যে-ক্ষতি হয় তার হিসাব করাও অসম্ভব। এদিয়ে অক্লেশে সারা বছর ২০ কোটি লোককে নিখরচায় ভরপেট খাবার খাওয়ান যায়!

শব্দান্তে যোজ্য 'নাশী' কথাটির অর্থ বিনষ্ট করা। রাসায়নিকরা বহুকাল থেকেই হরেক রকম 'নাশী' তৈরি করছেন। তারা কীটনাশী, প্রাণীনাশী, আগাছানাশী ইত্যাকার রাসায়নিক পদার্থে যথাক্রমে কীট, ইঁদুর এবং আগাছা উজাড় করছেন। সব 'নাশীরাই' এখন কৃষিক্ষেত্রে বহুলপ্রযুক্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এজন্য কেবলমাত্র অজৈব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থই ব্যবহৃত হত। ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, কীট ও আগাছা মারার তৎকালীন উপাদান ছিল আর্সেনিক, গন্ধক, তাম্র, বেরিয়াম, ফ্লোরিন এবং আরও হরেক রকমের বিষাক্ত যৌগ। তা সত্ত্বেও চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকেই বিষাক্ত জৈব যৌগের ব্যবহার ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছিল। জৈাব যৌগে সরে আসার এই প্রয়াস অবশ্যই ইচ্ছাকৃত। এগুলি মানুষ ও গবাদি পশুর পক্ষে কম ক্ষতিকরই শুধু নয়, এগুলি সহজলভ্য এবং অজৈব পদার্থের তুলনায় অল্পে অধিক ফলদায়ী। বর্গসেণ্টিমিটারপ্রতি এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের একভাগে ডি-ডি-টি চূর্ণ ছড়ালেই বিশেষ বিশেষ পতঙ্গ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এই জৈব বিষাক্ত পদার্থগুলি কিছু অদ্ভুত তথ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হেক্সাক্লোরোসাইক্লোহেক্সেন এই শ্রেণীর বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যের অন্যতম। কিন্তু এটি যে ১৮২৫ সালে ফ্যারাডে প্রথম আবিষ্কার করেন তা খুব কম লোকেই জানে। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা এটি পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু এর অদ্ভুত গুণগুলি একেবারেই আঁচ করতে পারেন নি। কেবল ১৯৩৫ সালের পর জীববিদরা এ সম্পর্কে গবেষণা শুরু করার ফলেই শেষে এই কীটনাশী পদার্থটির শিল্পভিত্তিক উৎপাদন আরম্ভ হয়। আজকের শ্রেষ্ঠতম কীটনাশী পদার্থগুলি অঙ্গারক-ফসফরাস যৌগ এবং ফসফামাইড অথবা এম-৮১ এদের অন্যতম।

কিছুকাল আগেও উদ্ভিদ ও প্রাণী রক্ষণে বাহ্যত কার্যকরী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হত। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি কিংবা দমকা হাওয়ায় এসব রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ধুয়ে কিংবা উড়ে যেত এবং তা আবার ছড়াতে হত। তাই বিজ্ঞানীরা জীবদেহে বিষাক্ত দ্রব্য ঢুকিয়ে তাকে রক্ষা করার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এর ফল হবে মানুষের দেহে টিকা দেওয়ার মতো: যার টিকা আছে সে সেই বিশেষ রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত। সেই দেহে প্রবেশমাত্র টিকাজাত অদৃশ্য 'স্বাস্থ্য রক্ষকরা' জীবাণুদের ধ্বংস করে ফেলে।

অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে কার্যকরী বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি বাস্তব সম্ভাব্যতা শেষে প্রমাণিত হল। বিজ্ঞানীরা কীটপতঙ্গ এবং উদ্ভিদের দৈহিক পার্থক্যের সুযোগ গ্রহণ করলেন। এমন বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হল যা উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু কীটপতঙ্গের জন্য মারাত্মক।

কেবলমাত্র পতঙ্গদের কাছ থেকেই নয়, রসায়ন গাছপালাকে আগাছার আক্রমণ থেকেও রক্ষা করে। আগাছানাশী রাসায়নিক দ্রব্যাদি আগাছার বৃদ্ধি প্রহত করলেও ফসলী উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করে না। যা হোক কীটনাশী পদার্থের মতো আগাছানাশী দ্রব্যাদিতেও এখন ব্যাপকভাবে জৈব যৌগ ব্যবহৃত।

কৃষক-বান্ধব

ছেলেটি সবেমাত্র ষোল পার হয়েছে। আর এই প্রথম সে একটি প্রসাধনী দ্রব্যের দোকানে এসেছে। অবশ্য সখে নয়, কাজের তাগিদে। তার গোঁফ গজাতে শুরু করেছে। সে দাড়িকাটার যন্ত্রপাতি কিনবে।

শুরুর পর্যায়ে কাজটি খুবই রোমাঞ্চকর। কিন্তু দশ-পনেরো বছর পরে অনেকেই দাড়ি রাখার কথা ভাবতে শুরু করে।

রেলপথের উপর ঘাস অবাঞ্ছিত। তাই বছর বছর কাস্তে দিয়ে এদের 'কামিয়ে' ফেলা হয়। কিন্তু মস্কো-খাবারভস্ক রেলপথের কথা ধরুন। এর দৈর্ঘ্য ন' হাজার কিলোমিটার। এর ঘাস কাটতে (গ্রীষ্মে যা বারকয়েক প্রয়োজন) কমপক্ষে এক হাজার সার্বক্ষণিক কর্মীর প্রয়োজন।

এখানে 'কামানোর' কোন রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কার কি অসম্ভব? হয়ত সম্ভব।

এক হেক্টর জমির ঘাস কাটা ২০ জন লোকের পুরো দিনের কাজ। কিন্তু আগাছানাশী পদার্থে কাজটি শেষ হতে লাগে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, আর এতে ঘাসের শেষ কণাটি অবধি উজাড় হয়ে যায়।

'পত্রনাশী' কী তা জানেন? এটি একটি রাসায়নিক পদার্থ। এতে গাছের পাতা ঝরে যায়। পত্রনাশী পদার্থের জন্য তুলা-সংগ্রহের যন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষকে মাঠে গিয়ে নিজ হাতে তুলা কুড়াতে হয়েছে। এ কাজে অনভিজ্ঞের পক্ষে তুলা কুড়ানোর কষ্ট আর তখনকার ৪০ বা ৫০ ডিগ্রি তাপমাত্রা কোনক্রমেই কল্পনীয় নয়।

এখন সবকিছুই অনেক সহজ। তুলার গুটি খোলার কয়েক দিন আগে খামারে পত্রনাশী ঔষধ ছড়ানো হয়। এদের মধ্যে সরলতমটি $Mg[ClO_3]_2$। ঝোপ তখন নিষ্পত্র হয়, আর তুলা-কম্বাইন মাঠে নামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, $CaCN_2$ পদার্থটিও পত্রনাশী হিসেবে ব্যবহার্য। ঝোপে ছড়ানোর সময় এর যে অংশ মাটিতে পড়ে তা নাইট্রোজেন সারের কাজ করে।

কৃষিকে সহায়তা দানের চেষ্টায় প্রকৃতি 'সংশোধনের' ক্ষেত্রে রসায়ন আরও এগিয়ে গেছে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরিত করে এমন পদার্থও উদ্ভাবিত হয়েছে। এদের নাম অক্সিন: উদ্ভিদ-হোর্মোন। শুরুতে এজন্য শুধু প্রাকৃতিক পদার্থই ব্যবহৃত হত। এখন রাসায়নিকরা এদের সরলতমগুলি সংশ্লেষ করতে পারেন। হেটেরোঅক্সিন আজ পরীক্ষাগারেই তৈরি হচ্ছে। এতে কেবল গাছপালার বৃদ্ধি, ফুল ফোটা আর ফলনই ত্বরিত হয় না, তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও জীবনীশক্তিও বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া ঘনতর অক্সিন ব্যবহারে এর বিপরীত ফল ফলে। এতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রহত হয়।

এখানে ব্যাপারটি পুরোপুরি ঔষধের সঙ্গে তুলনীয়। বহু ঔষধেই আর্সেনিক, বিস্‌মাথ ও পারদ থাকে। কিন্তু উচ্চমাত্রায় এরা সকলেই বিষাক্ত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, অক্সিন বাহারী উদ্ভিদের প্রস্ফুটন, বিশেষত ফুলকে দীর্ঘায়ু করতে পারে। আকস্মিক বাসন্তী তুষারপাতের সময় এদের সাহায্যে গাছপালার কুঁড়ি ও কলির উদ্গম বিলম্বিত করা যায়। পক্ষান্তরে, শীতের দেশে যেখানে গ্রীষ্ম নাতিদীর্ঘ সেখানে এভাবে কম সময়ে বহু ফলফলাদি ও শাকসব্জীর চাষ সম্ভব। যদিও এসব অক্সিনের ব্যাপকভিত্তিক ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নি তবু এই কৃষক-বান্ধবরা যে অদূর ভবিষ্যতে বহুল ব্যবহৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই।

দাত্য হল ভৃত্য

সংবাদপত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করার মতো একটি ঘটনা: জনৈক প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে তাঁর কৃতজ্ঞ সহকর্মীরা অ্যালুমিনিয়ামের একটি ফুলদানী উপহার দিয়েছেন। যেকোন উপহারেই সবাই খুশি হন। তাই বলে অ্যালুমিনিয়ামের ফুলদানী? তামাশার চমৎকার ব্যবস্থা বৈকি!

এ সবই এখনকার ব্যাপার। কিন্তু একশ' বছর আগে এমন একটি উপহার অবশ্যই বদান্যতার পরিচায়ক ছিল। সত্যিই এমনি একটি উপহার ব্রিটিশ রাসায়নিকরা দিয়েছিলেন আর তা যাকে-তাকে নয়। এর প্রাপক ছিলেন স্বয়ং মেন্দেলেয়েভ। এ ছিল বিজ্ঞানে তাঁর বিপুল অবদানের স্বীকৃতি।
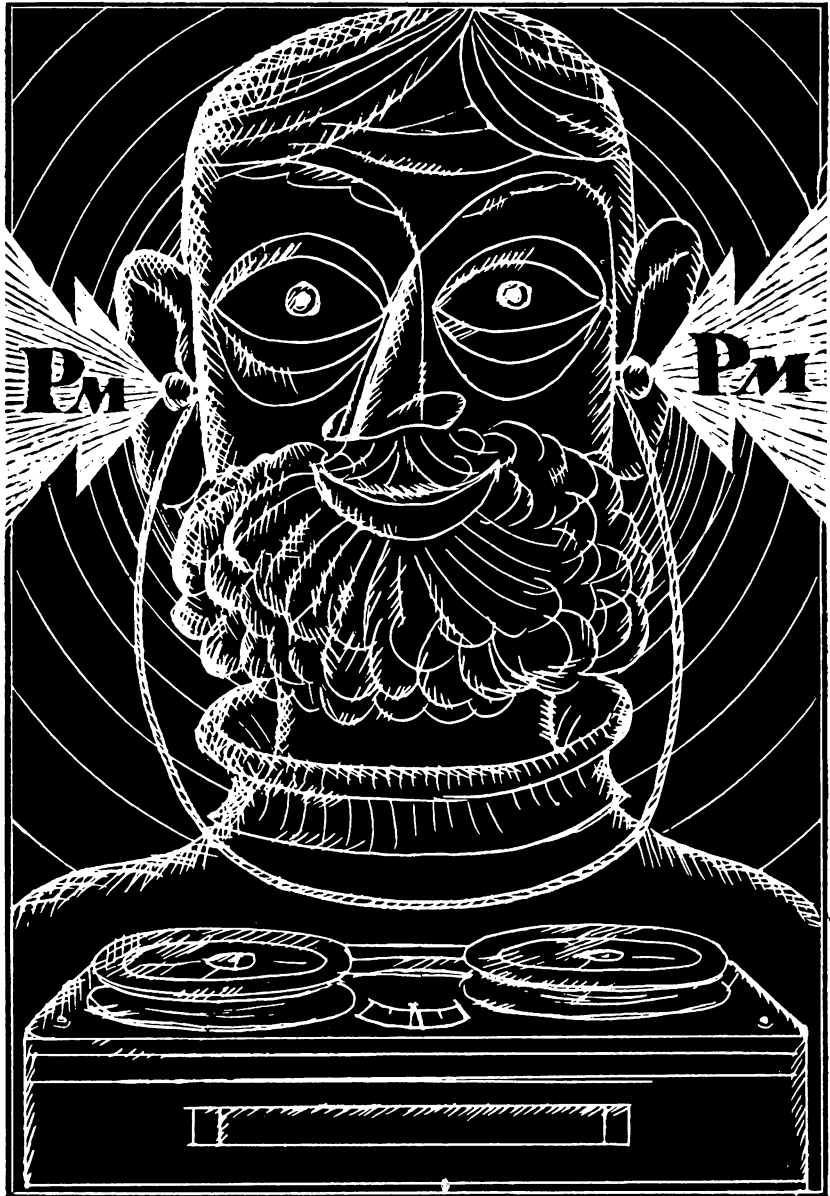
দেখুন, পৃথিবীতে সবকিছুই কত আপেক্ষিক! আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের কোন সস্তা পদ্ধতি গত শতাব্দীতে জানা ছিল না। ধাতুটি তাই মহার্ঘ ছিল। যখনই পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হল, এর দামও নেমে এল রাতারাতিই।

কিন্তু এমন পদার্থও আছে যা পৃথিবীতে মেলে না, কিংবা যে-পরিমাণে মেলে তা না-থাকারই সামিল। অ্যাস্টেটাইন ও ফ্রান্সিয়াম, নেপ্‌চুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম, প্রোমেথিয়াম ও টেক্‌নেসিয়াম এদেরই অন্তর্গত।

যা হোক এই মৌলাবলীর কৃত্রিম সংশ্লেষ সম্ভব। আর রাসায়নিকের হাতে কোন নতুন মৌল পড়লে একে নিয়ে কীভাবে কাজ শুরু করা যায় সে ভাবনায়ই তিনি মশগুল থাকেন।

অদ্যাবধি জ্ঞাত সবক'টি কৃত্রিম মৌলের মধ্যে প্লুটোনিয়ামই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এর দুনিয়াজোড়া উৎপাদন-মাত্রা এখন পর্যায়বৃত্ত সারণীর বহু 'সাধারণ' মৌলকেই অতিক্রম করেছে। বলা প্রয়োজন যে, রাসায়নিকদের কাছে প্লুটোনিয়াম অন্যতম সুজ্ঞাত মৌল যদিও এর 'বয়স' মাত্র পঁচিশ বছরের একটু বেশি। ব্যাপারটি মোটেই আপতিক কিছু নয়। প্লুটোনিয়াম পারমাণবিক রিয়াক্টরের চমৎকার জ্বালানি' আর তা কোন অংশেই ইউরেনিয়াম থেকে নিম্নমানের নয়।

আর প্রোমেথিয়াম? পৃথিবীর কোন আকরিকেই তো এর খোঁজ মেলে নি। এটি মিনি-ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হচ্ছে যেগুলি আয়তনে সাধারণ পেরেকের মাথার চেয়ে সামান্য বড়। শ্রেষ্ঠতম রাসায়নিক ব্যাটারিও ছ'মাসের বেশি টেকে না। প্রোমেথিয়ামের পারমাণবিক ব্যাটারির আয়ুকাল একনাগাড়ে পাঁচ বছরেরও বেশি; আর এটি কানে শোনার যন্ত্র থেকে নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র অবধি সর্বত্র ব্যবহার্য।

অ্যাস্টেটাইন থাইরয়েড গ্রন্থিরোগে চিকিৎসকদের সহায়ক। তেজস্ক্রিয় বিকিরণে থাইরয়েড গ্রন্থির বৈকল্য নিরাময়ের চেষ্টা ইদানিং শুরু হয়েছে। আমরা জানি আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে সঞ্চিত হয় এবং অ্যাস্টেটাইন আয়োডিনেরই সদৃশ রাসায়নিক প্রতিরূপ। জীবদেহে প্রবিষ্ট অ্যাস্টেটাইন থাইরয়েড গ্রন্থিতে সঞ্চিত হয় এবং তার তেজস্ক্রিয়তা অবশিষ্ট কার্যাদি সম্পাদন করে।

সুতরাং, কৃত্রিম মৌলাবলীর অন্তত কয়েকটি যে ফলিত গুণের অধিকারী তা নিশ্চিত। সন্দেহ নেই, তাদের কার্যাদি একপেশে। কেবলমাত্র এদের তেজস্ক্রিয়তাটুকুই আমাদের পক্ষে ব্যবহার্য। এর কারণ এই যে, রাসায়নিকরা আজও তাদের রাসায়নিক গুণাগুণের গভীরে পেঁছিতে পারেন নি। অবশ্য টেক্‌নেসিয়াম এর অনন্য ব্যতিক্রম। এর লবণ লৌহ ও ইস্পাত সামগ্রীকে ক্ষয়রোধী দার্ঢ্য দান করে। •

আমাদের কৈফিয়ত

কোন প্রচেষ্টায় যথাসময়ে থামাই সবচেয়ে কঠিন সমস্যা।

তবু এক সময় থামতেই হয়, এমন কি কলমের ডগায় রসায়নের আরও একটি চমৎকার গল্প থাকলেও।

কিন্তু এ এক ধরনের ভণিতা বৈকি। আসলে আমরা শেষাবধি যা বলতে চেয়েছি তাই নিম্নে বিবৃত হল।

একদা একটি উত্তেজিত বিতর্কে আমরা উপস্থিত ছিলাম। এটি ছিল অনেকটা এককালের 'পদার্থবিদ্যা বনাম কবিতা' সম্পর্কিত বিতর্কের মতো। অবশ্য এবার দুপক্ষই ছিলেন পুরোপুরিই যথার্থ বিজ্ঞানের প্রতিনিধি। একপক্ষ ঘোষণা করলেন যে, রসায়ন তেমন কিছু বিজ্ঞান নয়। ওটি পদার্থবিদ্যার একটি বিশেষ শাখা। তিনি পদার্থবিদ্যার পক্ষেই তর্কে নেমেছিলেন।

তিনি বলে চললেন: 'রসায়নে তেমন কিছু বিজ্ঞান নেই। যেকোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াই ধরুন না কেন, দেখবেন এর স্বকীয় কার্যাবলী কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যার নিয়মেই ব্যাখ্যেয়। দু'টি পরমাণুর মিথষ্ক্রিয়া মূলত একটি ইলেকট্রন-বিনিময় মাত্র। আর কীজন্য এই বিনিময় সম্ভবপর? রাসায়নিক বন্ধের ভিত্তি কী? ভৌত নিয়ম...'

এ সব কথা শুনে রাসায়নিকরা কী রকম সাড়া দিয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়।

ইলেকট্রন ইলেকট্রনই, কিন্তু রসায়ন সুপ্রাচীন এবং চিরনবীন এই বিজ্ঞানটি ঠিকই থাকবে। এর স্বকীয় নিয়মতন্ত্র আছে, আছে ইতিহাস আর অসীম সম্ভাবনা। হতে পারে তাকে কখনও বা পদার্থবিদ্যা, গণিত অথবা এমন কি সাইবারনেটিক্স থেকেও সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু তাতে কীই-বা আসে যায়।

আদিপর্বের তুলনায় বিংশ শতাব্দীর রসায়নের বিশেষ বৈশিষ্ট্য: এতে অজস্র স্বাধীন প্রবণতার উদ্ভব। প্রবণতা কথাটি হয়ত এখানে সঠিক নয়, এদের স্বাধীন বিজ্ঞান-শাখা বলাই বোধহয় সঙ্গত। তড়িত্তরসায়ন, আলোকরসায়ন, তেজরসায়ন, নিম্নতাপ ও উচ্চচাপ রসায়ন, উচ্চতাপ ও নিম্নচাপ রসায়ন ইত্যাদি।

আর এজন্য এক শাখার বিজ্ঞানীর পক্ষে অন্য শাখায় কার্যরত এক বিশেষজ্ঞকে সঠিক না-বোঝা খুবই সম্ভব। এতে অযোগ্যতার কোন লক্ষণ প্রকটিত হয় না।

রসায়নের 'উপভাষাগুলি' স্বাধীন রাসায়নিক 'ভাষার' পর্যায়ে এখন উত্তীর্ণ।

আর সঙ্কটের এ কেবল অংশমাত্র।

রসায়ন আজ অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বিজড়িত। এতে আছে জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা ও সৃষ্টিতত্ত্ব। আর এই 'মৈত্রীবন্ধনের' ফলশ্রুতি এক দঙ্গল সংকর বিজ্ঞানের উদ্ভব: প্রাণরসায়ন, ভূরসায়ন, মহাজাগতিক রসায়ন, ভৌতরাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা এবং আরও অনেকে।

প্রাণরসায়নের কথাই ধরা যাক। অবশেষে এই শাখাকেই প্রাণের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হবে। ঔষধপ্রস্তুতিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার সহযোগিতায় প্রাণরসায়নই শেষে রোগ নিরাময়ে সর্বকালের সেরা নিদান খুঁজবে।

অথবা মহাজাগতিক রসায়ন — দূরদূরান্তরের গ্রহ-নক্ষত্রের রসায়ন। যদিও নবজাত, তবু মহাজগতের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে এর মতামত মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

আর এখানে দেখুন কেমন অভাবিত ফল ফলেছে। এগুলি সেই সংকর বিজ্ঞান, যেখানে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ঘটছে। এমন সব তথ্যাবলী, পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারা উপস্থাপিত করছে যা কেউ কোনদিন সন্দেহই করে নি। এই 'সংকরাবলীতেই' এখন উজ্জ্বলতম সম্ভাবনার ঝলকানি।

এবার আমাদের সমস্যাবলীর দিকে বারেক তাকান যাক। একখণ্ড কাগজে আপনি রসায়ন সম্পর্কে কিছু লিখতে চান। দু' এক লাইন লিখলেই দেখবেন নতুন কিছু মুখ আপনার চোখে ভাসছে। মুখগুলি জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার। আর তখনই আপনার পূর্ববর্তী নিটোল ধারণাটিকে কেমন অর্থহীন, অস্পষ্ট মনে হবে। 'আজব দেশে এলিস'- এর সেই চায়ের আসরটি মনে করুন। পাগলী টুপিবিক্রেতা এলিসকে হেঁয়ালি জিজ্ঞেস করছে: 'দাঁড়কাকটি লেখার ডেস্কের মতো কেন?' এলিস উত্তরটি অনুমান করতে পারছে না, কারণ তার সামনে এসব কিছুই নেই। আপাতদৃষ্টিতে দাঁড়কাক আর লেখার ডেস্কের মধ্যে কোন পারম্পর্য নেই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষত রসায়ন এদের মধ্যে সুস্পষ্ট সংযোগ আবিষ্কার করতে পারে।

ভবিষ্যতে যদি জনপ্রিয় রসায়নের আরও একটি বই লিখার সুযোগ পাই, আমরা সম্ভবত টুপিবিক্রেতার হেঁয়ালিকে একটি শিলালিপি হিসেবে সেখানে ব্যবহার করব।

কিন্তু এ বইটিতে আমরা পুরোপুরি রসায়নেই আবিষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি।

পরিভাষা

অ

অঙ্গারক — organic; carbon
অজৈব — inorganic
অজৈব পদার্থজাত মৌল — inorgano-genic element
অতিপৃক্ত — supersaturated
অতিবেগনী — ultraviolet
অদ্রাব্য — insoluble
অধঃক্ষেপণ — precipitation
অধাতু — non metal
অনার্দ্র — anhydrous
অনুক্রমণী — index
অনুঘটক — catalyst
অনুঘটন — catalysis
অনুদ্বায়ী — nonvolatile
অন্তরক — insulator
অন্বয় — linkage
অন্বিত — linked
অপমিশ্র — admixture
অপারমাণবিক — non-nuclear
অবক্ষতি — corrosion
অবদ্রব — emulsion
অবলোহিত — infrared
অম্ল — acid
অযোজী — nonvalent
অর্ধায়ু — half life
অষ্টক — octave
অষ্ঠি — core
অসংপৃক্ত — unsaturated

আ

আকরিক — ore
আধান — charge
আধিমৌল — metaelement
আন্তর্ধাতুযৌগ — intermetallic compounds
আবর্ত — cycle
আয়ন পরিবর্তক — ion exchanger
আর্দ্রবিশ্লেষ — hydrolysis
অ্যালকোহল — spirit
আলোকতাড়িত — photoelectric

উ

উদ্বায়িতা — volatility
উদ্বায়ী — volatile
উন্নেতা — promoter
উপক্ষার — alkaloid
উপজাত — by-product

ঋ

ঋণায়ন — anion

এ

একযোজী — monovalent

ক

কক্ষতাপ — room temperature
কম্বোজ — mollusc
কলিচুন — quick lime
কিণ্ব — ferment
কিমিয়াবিদ — alchemist
কৃষ্ণসীস — graphite
কেলাস — crystal
কৈশিক নলিকা — capillary tube
ক্ষার — alkali, base
ক্ষারধাতু — alkali metal

খ

খনিজ, মণিক — mineral
খরজল — hard water
খোলক — shell

গ

গলনাংক — melting point
গুণীয় — qualitative
গুরুভার — super heavy
গোমেদমণি — olivine

ঘ

ঘনাংক — density
ঘনীকৃত — condensed

চ

চতুর্যোজী — quadrivalent
চতুষ্টয় — tetra
চতুস্তলক — tetrahedron
চুনি — ruby

জ

জলাকর্ষী — hydroscopic
জায়মান — nascent
জৈব — organic
জৈব-ধাতব — organometalic

ঢ

ঢালাই লোহা — cast iron

ত

তড়িদ্দ্বার — electrode
তড়িদ্বিশ্লেষ্য — electrolyle
তাড়িতরসায়ন — electrochemistry
তাড়িদ্বিশ্লেষ — electrolysis
তাপনিউক্লীয় — thermonuclear
তুষারঝুড়ি — icicle
তেজরসায়ন — radiation chemistry
তেজাঘাত — irradiation
তৌলিক — gravimetric
ত্বরণযন্ত্র — accelerater
ত্রিযোজী — traid, trivalent

দ

দস্তা — zinc
দুর্গল — refractory

দ্বিধাতুজ — bimetallic
দ্রব, দ্রবণ — solution
দ্রবণীয় — soluble
দ্রাবক — solvent
দ্রাব্যতা, দ্রবণীয়তা — solubility

ধ

ধনায়ন — cation
ধাতবাম্ল — mineral acid
ধাতুকল্প — metalloid
ধ্রুব — constant

ন

নভোবস্তুবিদ্যা — astrophysics
নিবেশন — recording
নিরুদন — dehydration
নিরুদিত — dehydrated
নিষ্কাশন — extraction
নিষ্ক্রিয় — inert

প

পরাণুতৌল — microbalance
পরাণু-পোষক — micronitrient
পরাণু-মৌল — microelement
পরাণুবিশ্লেষণ — ultramicro analysis
পরাবৃত্ত — hyperbola
পর্যায়-সূত্র — periodic law
পরিন্যাস — deposit
পরিপূক্তি — saturation
পরিমেল — association
পিতৃমৌল — parent element
কাঁচা লোহা — wrought iron
প্রতিপাদ — antipodal
প্রশমন — neutralization
প্রশমিত — neutral
প্রসার্য শক্তি — tensile strength
প্রাণদ — vital
প্রাণরসায়ন — biochemistry
প্রেষ-ধাতবীকরণ — pressure metallization

ব

বকযন্ত্র — retort
বন্ধ — bond
বন্ধায়ক — fixing
বরধাতু — noble metal
বর্ণালী-দীপ্তিমিতি — spectrophotometry
বর্ণালীগত — spectroscopic
বর্ণালীগত বিশ্লেষণ — spectroscopic analysis
বর্ণালীবীক্ষণ — spectroscope
বর্ণালীমিতি — spectrometry
বর্ণালীরেখা — spectral line
বর্ণালীলেখ — spectrograph
বর্তনী — circuit
বসতিলোক — inhabited world
বহুযোজী — multivalent
বাধক — inhibitor
বিকারক — reagent
বিক্রিয়া — reaction
বিগলন — smelting
বিজারণ — reduction
বিভব — potency
বিভাজন — fission
বিয়োজন — decomposition
বিয়োজিত — decomposed
বিরঞ্জন — bleaching
বিবর্ধক কাঁচ — magnifying glass

বিরলমৃত্তিক — rare earth
বিরলমৌল — trace element
বিশ্বধ্রুব — universal constant
বিসম-জৈব — hetero organic
বৃহৎ মৌল — macroelement
বৈশ্লেষিক রসায়ন — analytical chemistry

ভ

ভরণ — filler
ভান্তঃপ্রদেশ — interstelller space
ভারি ধাতু — heavy metal
ভাস্বর — incandescent
ভূরসায়ন — geochemistry
ভৌত চারিত্র্য — physical property
ভৌত নিয়ম — physical law

ম

মাত্রিক — quantitative
মৃদু জল — soft water
মৌল — element
মৌলিক কণা — elementary particle

য

যথার্থ বিজ্ঞান — exact science
যৌগ লবণ — compound salt
যোজ্যতা — valency

র

রজন — resin
রসায়ন — chemistry
তত্ত্বীয় রসায়ন — theoretical chemistry
ফলিত রসায়ন — applied chemistry
বৈশ্লেষিক রসায়ন — analylitical chemistry
ব্যবহারিক রসায়ন — applied chemistry
ভৌত রসায়ন — physical chemistry
রাসায়নিক আসক্তি — chemical affinity
" তত্ত্ব — chemical theory
" পদ্ধতি — chemical method
" যৌগ — chemical compounds
" সংস্থিতি — chemical composition
" সংকেত — chemical formula
" সক্রিয়তা — chemical activity
" সূত্র — chemical law
রাং-ঝালাই — galvanized
রূপভেদ — allotropic modification

ল

লঘূকরণ — dilution
লঘূভার — light
লৌহঘটিত — ferrous
লৌহবিহীন — non-ferrous
লৌহমল — rust

ষ

ষড়যোজী — hexavalent

স

সংকর ধাতু — alloy
সংনমন — compression
সংপৃক্ত — saturated
সংপৃক্তি — saturation
সংবন্ধন — fixation
সংযুতি — structure
সংশ্লেষণ — synthesis
সংশ্লেষিক — synthetic
সংস্থিতি — composition
সমন্বয় — co-ordination
সমসত্ত্ব — homogeneous
সমাবন্ধন — combination
সহযোজী — co-valent
সান্দ্রতা — viscosity
সারণী — table
সোরা — saltpetre
স্বজ্ঞা — intuition

	I	II	III	IV	V
১	(H)				
২	Li ৩ ৬·৯০১ লিথিয়াম	Be ৪ ৯·০১২২ বেরিলিয়াম	৫ ১০·৮১১ B বোরন	৬ ১২·০১১১৫ C কার্বন	৭ ১৪·০০৬৭ N নাইট্রোজেন
৩	Na ১১ ২২·৯৮৯৮ সোডিয়াম	Mg ১২ ২৪·৩০৫ ম্যাগ্নেসিয়াম	১৩ ২৬·৯৮১৫ Al অ্যালুমিনিয়াম	১৪ ২৮·০৮৬ Si সিলিকন	১৫ ৩০·৯৭৩৮ P ফসফরাস
৪	K ১৯ ৩৯·১০২ পটাসিয়াম	Ca ২০ ৪০·০৮ ক্যালসিয়াম	Sc ২১ ৪৪·৯৫৬ স্ক্যাণ্ডিয়াম	Ti ২২ ৪৭·৯০ টিটানিয়াম	V ২৩ ৫০·৯৪২ ভ্যানাডিয়াম
	২৯ ৬৩·৫৪৬ Cu তাম্র	৩০ ৬৫·৩৭ Zn দস্তা	৩১ ৬৯·৭২ Ga গ্যালিয়াম	৩২ ৭২·৫৯ Ge জার্মেনিয়াম	৩৩ ৭৪·৯২১৬ As আর্সেনিক
৫	Rb ৩৭ ৮৫·৪৭ রুবিডিয়াম	Sr ৩৮ ৮৭·৬২ স্ট্রন্সিয়াম	Y ৩৯ ৮৮·৯০৫ ইট্রিয়াম	Zr ৪০ ৯১·২২ জির্কোনিয়াম	Nb ৪১ ৯২·৯০৬ নায়োবিয়াম
	৪৭ ১০৭·৮৬৮ Ag রৌপ্য	৪৮ ১১২·৪০ Cd ক্যাডমিয়াম	৪৯ ১১৪·৮২ In ইণ্ডিয়াম	৫০ ১১৮·৬৯ Sn টিন	৫১ ১২১·৭৫ Sb অ্যাণ্টিমনি
৬	Cs ৫৫ ১৩২·৯০৫ সিজিয়াম	Ba ৫৬ ১৩৭·৩৪ ব্যারিয়াম	La * ৫৭ ১৩৮·৯১ ল্যান্থেনাম	Ht ৭২ ১৭৮·৪৯ হ্যাফ্‌নিয়াম	Ta ৭৩ ১৮০·৯৪৮ ট্যাণ্টেলাম
	৭৯ ১৯৬·৯৬৭ Au স্বর্ণ	৮০ ২০০·৫৯ Hg পারদ	৮১ ২০৪·৩৭ Tl থলিয়াম	৮২ ২০৭·১৯ Pb সীসক	৮৩ ২০৮·৯৮০ Bi বিসমাথ
৭	Fr ৮৭ [২২৩] ফ্রান্সিয়াম	Ra ৮৮ [২২৬] রেডিয়াম	Ac ** ৮৯ [২২৭] অ্যাক্টিনিয়াম	Ku ১০৪ [২৬০] কুর্চাতভিয়াম	১০৫

* ল্যান্থেনাইড

Ce ৫৮ ১৪০·১২ সিরিয়াম	Pr ৫৯ ১৪০·৯০৭ প্রাসিওডিমিয়াম	Nd ৬০ ১৪৪·২৪ নিয়োডিমিয়াম	Pm ৬১ [১৪৭] প্রোমেথিয়াম	Sm ৬২ ১৫০·৩৫ স্যামেরিয়াম	Eu ৬৩ ১৫১·৯৬ ইউরোপিয়াম	Gd ৬৪ ১৫৭·২৫ গ্যাডোলিনিয়াম

** অ্যাক্টিনাইড

Th ৯০ ২৩২·০৩৮ থোরিয়াম	Pa ৯১ [২৩১] প্রোট্যাক্টিনিয়াম	U ৯২ ২৩৮·০৩ ইউরেনিয়াম	Np ৯৩ [২৩৭] নেপচুনিয়াম	Pu ৯৪ [২৪৪] প্লুটোনিয়াম	Am ৯৫ [২৪৩] আমেরিসিয়াম	Cm ৯৬ [২৪৭] কুরিয়াম

VI	VII	VIII		
	H ১ ১.০০৭৯৭ হাইড্রোজেন	**He** ২ ৪.০০২৬ হিলিয়াম		
O ৮ ১৫.৯৯৯৪ অক্সিজেন	**F** ৯ ১৮.৯৯৮৪ ফ্লোরিন	**Ne** ১০ ২০.১৭৯ নিয়ন		
S ১৬ ৩২.০৬৪ গন্ধক	**Cl** ১৭ ৩৫.৪৫৩ ক্লোরিন	**Ar** ১৮ ৩৯.৯৪৮ আর্গন		
Cr ২৪ ৫১.৯৯৬ ক্রোমিয়াম	**Mn** ২৫ ৫৪.৯৩৮০ ম্যাঙ্গানিজ	**Fe** ২৬ ৫৫.৮৪৭ লোহ	**Co** ২৭ ৫৮.৯৩৩২ কোবাল্ট	**Ni** ২৮ ৫৮.৭১ নিকেল
Se ৩৪ ৭৮.৯৬ সেলেনিয়াম	**Br** ৩৫ ৭৯.৯০৪ ব্রোমিন	**Kr** ৩৬ ৮৩.৮০ ক্রিপ্টন		
Mo ৪২ ৯৫.৯৪ মোলিবডেনাম	**Tc** ৪৩ [৯৯] টেক্নেসিয়াম	**Ru** ৪৪ ১০১.০৭ রুথেনিয়াম	**Rh** ৪৫ ১০২.৯০৫ রোডিয়াম	**Pd** ৪৬ ১০৬.৪ প্যালাডিয়াম
Te ৫২ ১২৭.৬০ টেল্লুরিয়াম	**I** ৫৩ ১২৬.৯০৪৪ আয়োডিন	**Xe** ৫৪ ১৩১.৩০ জেনন		
W ৭৪ ১৮৩.৮৫ টাংস্টেন	**Re** ৭৫ ১৮৬.২ রেনিয়াম	**Os** ৭৬ ১৯০.২ অসমিয়াম	**Ir** ৭৭ ১৯২.২ ইরিডিয়াম	**Pt** ৭৮ ১৯৫.০৯ প্ল্যাটিনাম
Po ৮৪ [২১০] পোলোনিয়াম	**At** ৮৫ [২১০] অ্যাস্টেটাইন	**Rn** ৮৬ [২২২] র্যাডন		

মৌলের সংকেত — **Li** ৩ ৬.৯৩৯ লিথিয়াম — পারমাণবিক সংখ্যা; পারমাণবিক ভর

বন্ধনীতে সবচেয়ে স্থিতিশীল বা সুবিশ্লেষিত আইসোটোপের পারমাণবিক ভর দেয়া হল

মালা

Tb ৬৫ ১৫৮.৯২৪ টার্বিয়াম	**Dy** ৬৬ ১৬২.৫০ ডিস্প্রোসিয়াম	**Ho** ৬৭ ১৬৪.৯৩০ হোলমিয়াম	**Er** ৬৮ ১৬৭.২৬ আর্বিয়াম	**Tm** ৬৯ ১৬৮.৯৩৪ থুলিয়াম	**Yb** ৭০ ১৭৩.০৪ ইটার্বিয়াম	**Lu** ৭১ ১৭৪.৯৭ লুটিসিয়াম

মালা

Bk ৯৭ [২৪৭] বার্কেলিয়াম	**Ct** ৯৮ [২৫১] ক্যালিফোর্নিয়াম	**Es** ৯৯ [২৫৪] আইন্‌স্টাইনিয়াম	**Fm** ১০০ [২৫৭] ফার্মিয়াম	**Md** ১০১ [২৫৮] মেন্দেলেভিয়াম	**No** ১০২ [২৫৫] নোবেলিয়াম	**Lr** ১০৩ [২৫৬] লরেন্সিয়াম